প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৬৭

প্রকাশক ঃ শ্রীপ্রশান্ত তালুকদার
মৌসুমী সাহিত্য-মন্দির
১৫বি/টেমার লেন
কলিকাতা—৭০০০০৯

মুদ্রক ঃ শ্রী প্রশান্ত তালুকদার
গদাধর প্রিন্টার্স
৪১/ডি/১০৩, মুরারিপুকুর রোড
কলিকাতা—৭০০০৬৭

উৎসর্গ

নীলভাইকে

মম-এর লেখা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তিনি ভাববিলাসী শিল্পী নন। আসলে তিনি বাস্তববাদী শিল্পী। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রতিটি উপন্যাসই মনস্তত্ত্বমূলক। এখানে আর একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, নিজের সাহিত্য মূল্যায়ণের জন্যে তাঁকে সমালোচনার ওপরে নির্ভর করতে হয়নি। নিজের লেখার ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি নিজেই বুঝতে পারতেন এবং সেগুলোকে নিজেই সংশোধন করতেন। এই বোধ ছিল বলেই পরবর্তী কালে সমালোচনার কষ্টিপাথরে তাঁর প্রতিটি রচনাই যে রসোত্তীর্ণ হয়েছিল, সে-কথা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করে গেছেন।

সমারসেট মম ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের প্যারী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন প্যারীর ব্রিটিশ দূতাবাসের আইন উপদেষ্টা। মমের বয়স যখন মাত্র আট বছর তখন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয় এবং তার দু'বছরের মধ্যেই পিতাও গত হন।

এরপর তাঁর কাকা তাঁকে ইংলণ্ডে নিয়ে এসে ক্যান্টারবেরীর কিংস স্কুলে ভর্তি করে দেন। স্কুলের পড়া শেষ হবার আগেই মম জারমানিতে গিয়ে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ না হতেই আবার তিনি ইংলণ্ডে ফিরে

আসেন এবং অডিটরের বৃত্তি গ্রহণ করবার জন্য উক্ত বিষয়ের একটি স্কুলে ভর্তি হন কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি ঐ স্কুল ছেড়ে দিয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্যে লণ্ডনের সেণ্ট টমাস হাসপাতালে ভর্তি হন এবং কয়েক বছর পড়াশুনা করে চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন। আসলে মম ছিলেন নিতান্ত অস্থিরমতি এবং এ-জন্যেই তিনি কোথাও চাকরি করতে পারেননি। প্রথম জীবনে তাঁর আর্থিক অবস্থাও খুব শোচনীয় ছিল। এরপর একরকম আকস্মিকভাবেই তাঁর জীবনের গতি অন্য দিকে প্রবাহিত হয়। তাঁর প্রথম নাটক "A Man of Honour" তাঁকে নাট্যকার হিসেবে সুপরিচিত করে এবং এই নাটক বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থকষ্টও দূর হয়ে যায়। এরপর থেকেই শুরু হয় সাহিত্যের পথে জয়যাত্রা এবং সে জয়যাত্রা শুধু ইয়োরোপেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি: মম-এর নাম ছড়িয়ে পড়লো সারা বিশ্বে।

আমরা তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "Cakes and Ale" উপন্যাসটির বাংলা অনুবাদক পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে গর্ববোধ করছি।

অনুবাদক

প্রেমসিন্ধু

প্রেমসিন্ধু

প্রেমসিন্ধু

প্রেমসিন্ধু

একটা জিনিস আমি বেশ লক্ষ্য করেছি, যখনই কেউ আপনাকে টেলিফোনে না পেয়ে বাড়ি ফিরে রিং করবার জন্য আপনাকে বিশেষ অনুরোধ করবে এবং বলবে খুবই জরুরী, তখনই জানবেন গরজ অপর পক্ষের, আপনার নয়। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে আপনার কোনো উপহার বা অনুগ্রহ পাবার সম্ভাবনা, সেসব ক্ষেত্রে অনেকেরই কিন্তু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবার সময়ের অভাব হবে না। তাই সেদিন বাড়ি ফিরে ডিনারের জন্য তৈরি হবার আগে একটু ড্রিঙ্ক, একটুখানি ধূমপান এবং খবরের কাগজটায় চোখ বুলিয়ে নেবার মতো প্রচুর সময় ছিল এবং আমার বাড়িওয়ালী মিস ফেলোজ যখন বললে যে, মিঃ অলরয় কিয়ার এক্ষুনি আমাকে টেলিফোন করতে অনুরোধ করেছেন, তখনি আমি বুঝতে পারলাম, নির্বিবাদে এই অনুরোধ আমি উপেক্ষা করতে পারি।

—ইনি সেই লেখক বোধহয়? মিস ফেলোজ জিজ্ঞাসা করল।

—হ্যাঁ।

বেশ একটু সন্দেহ দৃষ্টিতে সে একবার তাকাল টেলিফোনটার দিকে!

—ওঁকে ডাকব?

—না থাক, ধন্যবাদ।

—আবার যদি রিং করেন কী বলব?

—কী দরকার [redacted]

—বেশ তাই হবে।

ঠোঁট দুটো চেটে একটু ভিজিয়ে নিল। টেবিল থেকে খালি গেলাসটা তুলে নিয়ে ঘরটা গুছানো আছে কিনা চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মিস ফেলোজ-এর উপন্যাস পড়বার ভীষণ

বাতিক। রয়-এর সবগুলো বই সে নিশ্চয় পড়ে ফেলেছে এর মধ্যে। আমার আগ্রহহীনতায় তার অসমর্থন দেখেই বুঝতে পারলাম সে শুধু পড়েইনি, সপ্রশংস মন নিয়ে পড়েছে। আবার বাড়ি ফিরে দেখলাম সাইড-বোর্ডের উপর রাখা ওরই গোটা গোটা স্পষ্ট হাতে লেখা একটা চিরকুট।

…মিঃ কিয়ার দু দুবার টেলিফোন
করেছিলেন। কালকে ওঁর সঙ্গে
লাঞ্চ খাওয়া আপনার সম্ভব হবে
কি ? নইলে, আপনার কবে সুবিধে
হবে ?……

আমার কপালটা একটু কুঁচকে গেল। প্রায় তিন মাস রয়-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। সেবারও মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য একটা পার্টিতে দেখা। বেশ হৃদ্যতা দেখিয়েছিল সেদিন ; এমনি হৃদ্যতা বরাবরই তার কাছে পেয়েছি। তারপর চলে আসবার সময় সে খুবই দুঃখ করেছিল, আমাদের এত কদাচিত দেখা সাক্ষাৎ হয় বলে।

—আজব শহর এই লণ্ডন। সে বলেছিল—কারো সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে থাকলেও সময় আর হয়ে ওঠে না। আসুন না আসছে হপ্তায় কোনো একদিন এক সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া যাক, কী বলেন ?

—কোনো আপত্তি নেই। আমি উত্তর দিয়েছিলাম।

—বাড়ি ফিরে নোট বইটা দেখে আপনাকে রিং করব।

—বেশ।

গত কুড়ি বৎসরের পরিচয়ে এটা আমার দৃষ্টি এড়ায়নি যে রয় সবসময় তার ওয়েস্ট-কোটের বামদিককার ভেতরকার ছোট্ট পকেটে একটা ছোটো নোটবই রাখত, যাতে তার এনগেজমেণ্টের হদিশ লেখা থাকত ; কাজেই তার কাছ থেকে যখন আর কোনো সাড়া পাইনি তখন আমি মোটেই আশ্চর্য হইনি : তাই আজকে তার আতিথেয়তা রক্ষার এমনি অত্যুগ্র বাসনা অনুদ্দেশ্যমূলক এটা নিজের মনকে বুঝান অসম্ভব মনে হলো আমার পক্ষে। শুতে যাবার আগে পাইপটা ধরিয়ে হঠাৎ তার সঙ্গে লাঞ্চ খাবার জন্য রয়-এর কেন এতটা আগ্রহ তারই সম্ভাব্য কারণগুলো নিয়ে মনের ভেতর নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। হয়তো বা তার কোনো ভক্ত মহিলা আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য তাকে চেপে ধরেছে। অথবা কোনো মার্কিন সম্পাদক হয়তো দু-চার দিনের জন্য লণ্ডনে এসেছে, রয়কে ধরেছে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে। কিন্তু আমার এই বন্ধুটির উপর এইটুকু অবিচার আমি করতে পারলাম না যে, এই সমস্ত পরিস্থিতিকে সামলে নেওয়ার মতো প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবনে সত্যি সে

অপারগ। তাছাড়া আমার সুবিধে মতো দিন ঠিক করবার অনুরোধই সে করেছিল। কাজেই অন্য কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করানটা নিশ্চয় তার ইচ্ছে নয়।

সবার মুখে মুখে নাম ছড়িয়ে পড়েছে এমনি কোনো সমসাময়িক ঔপন্যাসিকের প্রতি এতটা হৃদ্যতা দেখানো রয় ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয় হয়তো। কিন্তু আলস্য, ব্যর্থতা অথবা অপরের আকস্মিক সাফল্য হেতু যদি সেই লেখকের প্রসিদ্ধির উপর একটুও ছায়াপাত হয় তবে সেই মুহূর্তে তার প্রতি বিমুখ হতেও তার মতো জুটি হয়তো আর কেউ নেই। প্রত্যেক লেখকেরই তেজি মন্দি আছে, এবং সেসময় সাধারণের চোখে যে আমি একটু নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিলাম সে সম্বন্ধে আমি সত্যি খুব সচেতন ছিলাম। তাই বিনা সঙ্কোচে রয়-এর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবার অজুহাত বার করাই স্বাভাবিক ছিল তখন, যদিও জানতাম সে নিতান্ত জেদী লোক এবং নিজের প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করা যদি সে সিদ্ধান্ত করে থাকে তবে জাহান্নামে যাও বলে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কিছুতেই বিরত হবে না। কিন্তু কেমন একটা কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসেছিল। তাছাড়া আমি রয়কে খুবই স্নেহ করতাম। সাহিত্যের জগতে তার উত্থান বেশ সপ্রশংস মন নিয়েই আমি লক্ষ্য করছিলাম। সাহিত্য সাধনায় পা বাড়িয়েছে এমনি যেকোনো তরুণের পক্ষেই রয়-এর সাহিত্যিক জীবন পরিক্রমা একটা আদর্শরূপে কাজ করতে পারত। আমার সমসাময়িকদের ভেতর এমন কারো কথাই আমি ভাবতে পারছি না যে, স্বল্প প্রতিভা নিয়েও তার মতো এতটা সাফল্য অর্জন করেছিল। অপ্রত্যাশিত আতিশয্যই হয়তো ছিল এটা। সে নিজেও এটা ভালোভাবেই জানত, এবং তার নিজের কাছেও হয়তো কখনও এটা নিতান্ত ভোজবাজি বলেই মনে হতো যে, এইটুকু প্রতিভা নিয়েও এই অল্প সময়ের মধ্যে ত্রিশখানা বই লিখতে সে সক্ষম হয়েছিল। একথাও আমি না ভেবে পারছি না যে, হয়তো যেদিন সে চার্লস ডিকেন্সের ভোজ সভার বক্তৃতার সেই কথাটা, যে প্রতিভা পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ নয়, প্রথম পড়েছিল সেই দিনই হয়তো তার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল এবং আশার শুভ্র আলো সে দেখতে পেয়েছিল। এই কথাটা নিয়ে নিশ্চয়ই সে ভেবেছিল খুব। তাই যদি সত্যি হয়, সে হয়তো নিজের মনকে বুঝিয়েছিল, তবে আর সবার মতো সেও প্রতিভার অধিকারী হবে একদিন, এবং যখন কোনো মহিলা পত্রিকার উত্তেজিত পুস্তক-সমালোচক তার কোনো একটা বই সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে ঐ শব্দটা ব্যবহার করেছিল, আজকাল সমালোচক মহলে এ কথাটার প্রয়োগ খুব হামেশাই চলছে, তখন ক্রশ-ওয়ার্ড ধাঁধার উত্তরের সমাধান করে ঘন্টার পর ঘন্টা পরিশ্রমের পর, যে নিঃশ্বাস পড়ে তেমনি

আত্মতৃপ্তির নিঃশ্বাসই হয়তো সেও সেদিন ফেলেছিল! বৎসরের পর বৎসর তার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অধ্যবসায় যে দেখেছে সে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারবে না যে সত্যি প্রতিভার অধিকারী হবার যোগ্যতা ছিল তার। কতকটা অনুকূল অবস্থার ভেতরেই রয় তার সাহিত্যিক জীবন শুরু করেছিল। একজন সরকারী কর্মচারীর একমাত্র পুত্র ছিল সে। তিনি হংকং-এ ঔপনিবেশিক সেক্রেটারীর পদে বহু বৎসর কাজ করে জ্যামাইকার গভর্নর হিসেবে কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছিলেন। যে কোনো কে এবং কারার পাতা ওলটালেই দেখা যাবে অলরয় কিয়ার স্যার রেমণ্ড কিয়ার কে-সি-এম-জি, কে-সি-ভি-ও এবং এমেলিয় পুত্র এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বতন মেজর জেনারেল পার্সি ক্যামপারডাউন-এর দৌহিত্র। উইনচেস্টার এবং অক্সফোর্ডের নিউ কলেজে সে অধ্যয়ন করেছিল। সে ইউনিয়নের সভাপতি হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত হাম-জ্বরে আক্রান্ত না হলে রোইং ব্লু হয়তো সে পেতো। তার ছাত্রজীবন সসম্মানে কেটেছিল, কেবল দেখা-শোভন ছিল না। এক কপর্দক ঋণ না রেখেই সে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করে এসেছিল। সে সময়েও রয় খুব মিতব্যয়ী ছিল। অপ্রয়োজনীয় ব্যয়ের দিকে তার মোটেই কোনো ঝোঁক ছিল না, এবং সে সত্যি বাপের সুপুত্র ছিল। রয় জানত যে পিতামাতার ত্যাগের জন্যই তাকে এমনি ব্যয়সাধ্য শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। তার পিতা কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়ার পর গ্লস্টারসায়ার অঞ্চলে কোথাও অতি মামুলী না হলেও একটা অনাড়ম্বর বাড়িতে বাস করছিলেন। কিন্তু সময় সময় যে সমস্ত উপনিবেশে তিনি কাজ করেছিলেন তাদের সম্পর্কিত কোনো কোনো সরকারী ডিনার পার্টিতে যোগ দেবার জন্য তিনি লণ্ডন যেতেন। এই সব উপলক্ষে এথেনিয়াস ক্লাবেও কখনো যেতেন. তিনি ঐ ক্লাবের সভ্য ছিলেন। ঐ ক্লাবের এক ধুরন্ধর সভ্যের সহায়তায় অক্সফোর্ড থেকে বেরিয়ে আসবার পর রয়কে একজন রাজনীতিকের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজে নিযুক্ত করিয়েছিলেন। ঐ ভদ্রলোককে, পর পর দুটো রক্ষনশীল মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদে বহাল হয়েও, নিজের দুর্বুদ্ধিতার জন্য শুধু একটা পিয়ারেজ নিয়ে রাজনীতি থেকে অবসর নিতে হয়েছিল। এই থেকেই রয় খুব অল্প বয়সেই বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে সে ভোলেনি। তাই সমাজের উচ্চস্তরের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যাদের শুধু চিত্র-পত্রিকার মারফত পরিচয়, তাদের সৃষ্টকর্মের অসংগতি তার সাহিত্য সৃষ্টিকে পঙ্কিল করেনি কোনোদিন। সে জানত ডিউকরা নিজেদের মধ্যে কিভাবে কথা বলে। এও সে জানত, কোনো পার্লামেন্টের সদস্য, এটর্নি, রেসের মাঠের বুকি অথবা বাড়ির পরিচারক কিভাবে তাঁদের সম্বোধন করে,

তার প্রথম জীবনের উপন্যাসগুলোতে ভাইসরয়, রাষ্ট্রদূত, প্রধানমন্ত্রী, রাজন্যবর্গ অথবা উচ্চ সমাজের মহিলাদের চরিত্র চিত্রণে এমন একটা নৈপুণ্যের ছাপ আছে যে সেগুলো সত্যি খুব আকর্ষণীয়। সে হৃদ্যতা দেখিয়েছে, কিন্তু পিঠ চাপড়ান মনোবৃত্তি প্রকাশ করেনি। অতি পরিচয়ের প্রকাশ দেখিয়েছে অথচ শালীনতার গণ্ডি অতিক্রম করেনি। তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ভুলবার সুযোগ সে দেয়নি, অথচ তাঁরাও যে আমাদেরই মতো একই রক্তমাংসের মানুষ এই স্বাচ্ছন্দ্য অনুভূতির প্রকাশ ছিল ছত্রে ছত্রে। তাই এটা আমার কাছে সবসময় বড়ো দুঃখের বিষয় মনে হতো যে, অভিজাত সমাজ উপন্যাসের বিষয়বস্তু হতে পারে না এই প্রচলিত মতবাদের প্রতি আকর্ষণ এবং যুগধর্মের প্রতি অতিশয় প্রবণতার জন্য রয় তার পরবর্তী জীবনের সৃষ্টকর্মগুলিতে সলিসিটর চার্টার্ড একাউনটেন্ট এবং বেনোকারদের মানসিক দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণের বিষয়বস্তুতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল ; অথচ তার মনের পূর্ববর্তী আস্থা নিয়ে কোনো-দিন সে মেশেনি সমাজের এই বিশেষ স্তরের মানুষদের সঙ্গে।

আমার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়েছিল সেইদিন, যেদিন সাহিত্যে পূর্ণ মনোনিবেশ করবার অভিপ্রায় নিয়ে সে সেক্রেটারীর পদে ইস্তফা দিয়েছিল। তখন সে উঠতি নবীন যুবক, জুতো-মোজা নিয়ে দীর্ঘ ছ ফুট মাথায় উঁচু, এথলেটের মতোই সুঠাম দেহের গঠণ, প্রশস্ত কাঁধ এবং তার চলার গতিতে ছিল দৃপ্ত ভঙ্গি। সে দেখতে খুব সুশ্রী ছিল না বটে, কিন্তু তাকালেই সুপুরুষ বলে লাগত... তার আয়ত নীল চোখে ঝলমল করত স্পষ্ট দৃষ্টি--ফিকে বাদামী রঙের কোকড়ান মাথার চুল। কিন্তু তার নাকটা খুবই ছোটো। আবার তেমনি চওড়া আর মুখের আদল অনেকটা চৌকো মতন। স্বচ্ছ স্বাস্থ্যবান এবং নিষ্ঠাবান বলেই তাকে মনে হতো। কতকটা এথেলেটের মতো লাগত।

তার প্রথম জীবনের উপন্যাসগুলির শিকার কাহিনীর সঠিক বিবরণের সঙ্গে যার পরিচয় আছে সে কিছুতেই না ভেবে পারবে না যে এ সবই তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল, এবং এই তো কিছুকাল আগেও লেখার টেবিল ছেড়ে সে প্রায়ই ছুটত শিকারের জঙ্গলে। তার প্রথম উপন্যাস যেসময় প্রকাশিত হয়েছিল সে যুগে নিজেদের বীর্যবত্তার পরিচয় দেবার জন্য বিয়ার পান এবং ক্রিকেট খেলা লেখকদের একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং কিছুকাল এমন খুব কম সাহিত্যিক একাদশ নির্বাচিত হত যাতে তার নাম থাকত না। ঐ লেখকগোষ্ঠী জানিনা কেন, ইদানিং তাদের শৌর্য-বীর্য হারিয়ে ফেলেছে। তাদের বইগুলোর ও আর কোনো আদর নেই। আর যদিও ক্রিকেট খেলা এখনো বজায় আছে তাদের লেখা স্থান পায় না কোথাও। রয় বহুকাল আগেই

ক্রিকেট খেলা ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু ক্ল্যারেট-প্রীতি বাড়িয়ে দিয়েছিল। রয় তার প্রথম উপন্যাস সম্বন্ধে একটু অতি বিনয়ী। বইটা খুবই ছোটো এবং বেশ পরিপাটি করে লেখা। এবং এযাবত সে যাই লিখেছিল সেগুলোর মতোই সুরুচির ছাপ ছিল এতেও। বেশ পরিপাটি করে লেখা চিঠিসহ তদানীন্তন প্রত্যেকটি খ্যাতনামা লেখকের কাছে সে একখানা করে বই পাঠিয়েছিল। প্রত্যেককেই লিখেছিল—তাঁদের লেখার সে একজন বড়ো ভক্ত এবং তাঁদের লেখা পড়ে অনেক কিছু শিখতে পেরেছে. তাঁদের প্রদর্শিত পথের নিশানা ধরে সেও অগ্রসর হবে এই তার আকাঙ্ক্ষা। একজন তদানীন্তন বিখ্যাত কথাশিল্পীকে সে তার বইখানা উৎসর্গ করেছিল—সাহিত্যিক জীবনে প্রথম পদার্পণকারী নবীনের গুরু বলে স্বীকৃতির এই ছিল শ্রদ্ধার্ঘ্য। তার মতো আনাড়ী হাতের এই ক্ষুদ্র সৃষ্টি দেখতে গিয়ে মহাজনের মহামূল্যবান সময় নষ্ট করবার জন্য অনুরোধ করা যে তার পক্ষে একটা স্পর্দ্ধামাত্র সে-সম্বন্ধে সচেতন থাকা সত্ত্বেও তাঁর সমালোচনা এবং নির্দেশ সে ভিক্ষা করেছিল। খুব মামুলী জবাব সে পায়নি কারো কাছ থেকে—তার প্রশংসা ও স্ফূর্তিতে তুষ্ট হয়ে সবাই তার চিঠির বিস্তারিত জবাব দিয়েছিল।

তার বইটিকে সবাই প্রশংসা করেছিল, অনেকে লাঞ্চের টেবিলে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তার এমনি স্পষ্টবাদিতায় মুগ্ধ এবং উৎসাহে অভিভূত হয়নি এমন লোক ছিল খুব কম। তার উপদেশ প্রার্থনায় নম্রতা অভিভূত করেছিল সবাইকে এবং তার সেই প্রার্থনাকে কার্যকরী করবার প্রতিশ্রুতিতে হৃদয়গ্রাহী নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিল। মনের স্পর্শ বিলোবার এই একটি উপযুক্ত পাত্র বলেই সবাই তাকে মেনে নিয়েছিল।

তার এই উপন্যাস বেশ নাম করেছিল। সাহিত্যিক মহলে সে সুপরিচিত হয়ে গেল এবং অল্পদিনের ভেতরই ব্লুমসবারি, ক্যাম্পডেন-হিল অথবা ওয়েস্ট-মিনিস্টারের যেকোনো চায়ের পার্টিতে গিয়ে রুটি মাখন পরিবেশনে তার অতি ব্যস্ততা অথবা কোনো বয়স্কা মহিলার শূন্য চায়ের পেয়ালা পূর্ণ করবার অতি উৎসাহ না দেখতে পেলেই হয়তো অবাক হতেন আপনি। সে এত ছেলে মানুষ, এত ধড়িবাজ এবং স্ফূর্তিবাজ, অপরের ঠাট্টা বিদ্রূপে এত প্রাণ খুলে সে হাসতে পারত যে সবাই তাকে ভালো না বেসে পারত না। ভিকটোরিয়া স্ট্রীট অথবা হলবোর্নের যেকোনো হোটেলের চত্বরে সাহিত্যিক, তরুণ ব্যারিস্টার এবং লিবার্টি সিল্ক আর প্রতির মালা শোভিতা আধুনিকাদের জমায়েত হতো এবং সাড়ে তিন শিলিং ডিনার খেতে খেতে সাহিত্য আর শিল্পের আলোচনা চলত যেখানে, সেখানেও সে যোগদান করত। অল্পদিনের মধ্যেই আবিষ্কৃত হলো যে ডিনারোত্তর আলোচনায় সে একজন অতি পারদর্শী।

তার স্বভাব এত মধুর যে সাহিত্যিক সহযোগী, সাহিত্যিক প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সমসাময়িক অনেকেই ভদ্রতার গণ্ডি অতিক্রম করলেও তাকে ক্ষমা করত। তাদের মূল্যহীন হালকা রচনার প্রশংসাতেও সে পঞ্চমুখ হতো এবং সমালোচনার জন্য পাণ্ডুলিপি পাঠালেও বিরুদ্ধ মন্তব্য করত না কখনও। তাকে শুধু ভালোই লাগত না, বুদ্ধিমান বিচারক বলেও সে প্রতিপন্ন হয়েছিল সবার কাছে।

তারপর তার দ্বিতীয় উপন্যাস বেরুল। বেশ খেটেছিল বইটা নিয়ে। প্রবীণ শিল্পীদের কাছ থেকে পাওয়া উপদেশ সে কাজে লাগিয়েছিল। এতে সত্যি অবাক হবার কিছু নেই যে, তারই অনুরোধে বইটা সম্বন্ধে একাধিক লেখা বেরিয়েছিল কোনো একটাকাগজে, যার সম্পাদকের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ব্যবস্থাও সে করেছিল। কাজেই ঐ সমস্ত সমালোচনা যে প্রশংসায় মুখর হবে এতো খুব স্বাভাবিক। তার দ্বিতীয় বইখানাও তাই উৎরে গেল। কিন্তু এতটা নয় যাতে তার প্রতিযোগীদের স্পর্শকাতরতায় আঘাত দেওয়া সম্ভব ছিল। বরং এতে তাদের মনের সন্দেহটা আরও দৃঢ়তর হলো যে টেমস নদীর বুকে উত্তাল তরঙ্গ তুলতে রয় পারবে না কোনোদিন। সে অতি ভালো মানুষ। এ দল সে দল কিছুতেই সে নেই; তাদের প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করবার মতো এমন কোনো সাফল্যের শীর্ষতায় উঠবার সম্ভাবনা নেই বলেই রয়কে এতটুকু প্রশ্রয় দিতে তাদের কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমি এমন অনেককেই জানি যারা এখন তিক্ততার হাসি হাসে, যখন ভাবে কী ভুল তারা সেদিন করেছিল।

কিন্তু যখন তারা বলে যে রয় দেমাকে ভারি হয়ে উঠেছে. তারা ভুল করে। যৌবনে যেটা তারা অতি বিশেষগুণ বলেই আদর দিয়েছিল, সেই বিনয় নম্রতাকে সে কোনোদিন হারায়নি।

—আমি জানি আমি বড়ো ঔপন্যাসিক নই. সে আপনাকে বলবে—যখন সাহিত্য জগতের মহারথীদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করি তখন খুঁজে পাই না আমাকে। আমি কল্পনা করতাম হয়তো একদিন একটা সত্যিকার সার্থক এবং বিরাট উপন্যাস রচনা করব. কিন্তু তার বিন্দুমাত্র আশাও আমি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছি অনেকদিন। মানুষের কাছে আমার এইটুকু মাত্র দাবি যে তারা মনে করুক আমি যা করি সেটুকু আমার ক্ষমতানুযায়ী করি। হালকা কোনো কিছুকে আমি প্রশ্রয় দিই না। আমার বিশ্বাস, একটা ভালো গল্প আমি বলতে পারি এবং বাস্তবানুগ চরিত্রও আমি সৃষ্টি করতে পারি। তাছাড়া, মিষ্টান্নের স্বাদ খেয়ে। আমার 'সূর্যের চোখে' বইখানা পঁয়ত্রিশ হাজার কপি বিক্রি হয়েছে ইংলণ্ডে এবং আশি হাজার আমেরিকায় এবং আমার

পরবর্তী উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশনার জন্য সবচেয়ে বেশী অফার আমি পেয়েছি।

আর তাছাড়া এই যে তার বইকে প্রশংসা করবার জন্য আজও পুস্তক সমালোচকদের চিঠি লিখে ধন্যবাদ দেওয়া এবং এমনকি লাঞ্চ খেতে আমন্ত্রণ করা, একে বিনয় ছাড়া আর কি বলব বলুন? শুধু তাই কেন, আরও কিছু, যখন কেউ তাকে তিক্ত সমালোচনা করেছে এবং তার সুপ্রতিষ্ঠিত সুনাম ও প্রতিপত্তি সত্ত্বেও যখন ঐসব কটূক্তি তাকে হজম করতে হয়েছে, সেইসব ক্ষেত্রে রয় কোনোদিন আমাদের আর সবার মতো মনের ঝাল মিটিয়ে সমালোচনাকারী দুর্বৃত্তের মস্তকে বিদ্রূপ কটাক্ষের ধারা বর্ষণ করে আবার পরমুহূর্তেই সব ভুলে যায়নি। রয় তার সমালোচককে সুদীর্ঘ চিঠি লিখেছে, জানিয়েছে তার বইটি ভালো হয়নি বলে সত্যি সে খুবই দুঃখিত। কিন্তু সমালোচনাটি এমনি মনোজ্ঞ হয়েছে, যে তাকে বলবার অধিকার দিলে সে বলতে বাধ্য, সমালোচকের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষনী ক্ষমতার এবং শব্দ প্রয়োগে এমনি মেধা এবং অনুভূতির পরিচয় পেয়ে সে এত খুশী হয়েছে যে এই সুদীর্ঘ চিঠি না লিখে সে পারেনি! তার চেয়ে নিজেকে সংশোধন করবার এমনি আগ্রহ আর কারও আছে কিনা সে জানে না, তবে আরও লিখবার আশা এখনও সে রাখে। সে নিজেকে বিরক্তিকর করে তুলতে চায় না, তবে বুধবার বা শুক্রবার যদি সমালোচকের বিশেষ কোনো কাজ না থাকে তবে কি দয়া করে তিনি স্যাভয় হোটেলে লেখকের সাথে লাঞ্চ খেতে আসবেন এবং বইটি কেন ভালো লাগেনি বুঝিয়ে বলবেন? ভালো লাঞ্চের ব্যবস্থার ব্যাপারে রয়এর মতো দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। এবং সাধারণতঃ আধ ডজন অয়েস্টার এবং ভেড়ার ঠ্যাং দু এক কামড় খেতে না খেতেই সমালোচক মশাই নিজের কথাগুলো হজম করে ফেলেছেন। এবং এটাকে পয়েটিক জাসটিস-ই বলব যে পরের বইখানা যখন বেরুল তখন সেই সমালোচকের কলম মুখর হয়ে উঠল তার প্রশংসায়।

যার সঙ্গে একদিন ঘনিষ্ঠতা ছিল অথচ সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে সেই আগ্রহ যখন স্তিমিত হতে হতে মুছে গেল, সেই পরিস্থিতিকে মুখোমুখি করাই হয়তো জীবনের চলার পথে সবচেয়ে কঠিন। যদি উভয়েই তখনও সমপর্যায়ে থাকে এই বিচ্ছেদ হয়তো স্বাভাবিকভাবে আসে এবং মনোবেদনা বা বিরূপ মনোভাব হয়তো আর থাকে না, কিন্তু একজন যদি বিশেষের পর্যায় গিয়ে পড়ে তখনি যেন কেমন বিশ্রী হয়ে ওঠে পরিস্থিতিটা। বহু নতুন বন্ধু আসে, কিন্তু পুরানো যারা তাদেরও ফেলা কঠিন হয়ে ওঠে, তার সময়ের উপর দাবি অনেকের, তবু পুরনো বন্ধুরা মনে করে তাদের দাবি অগ্রগন্য। তাদের ডাকে যদি সাড়া না আসে তার কাছ থেকে তারা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, কাঁধ ঝাকুনি

দিয়ে বলে :

—ও, বেশ, তুমিও দেখছি তাহলে আর সবার মতন। আজ বড়ো হয়েছ, তাই আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে তোমার কাছে।

যদি বুকে সাহস থাকে তাই হয়তো সে চাইবে। কিন্তু তা হয়না সব ক্ষেত্রে। অতি ভীরু মন নিয়ে রবিবারের সান্ধ্য নিমন্ত্রণ সে গ্রহণ করবে। মাংসের রোস্ট হয়তো ঠাণ্ডা হয়ে উঠবে, মুখে বিস্বাদ লাগবে। কে জানে হয়তো সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানী করা হয়েছে মাংসটা, রান্নাও হয়তো অনেক বেলাতে হয়েছিল, আর বারগাণ্ডি সুরা, একে বারগাণ্ডি কেন যে ওরা বলে? এরা কোনোদিন কি রোয়'-এতে যায়নি, হোতেল দ্য লা পোর্তেতে থাকেনি একদিনও সুদূর অতীতে অন্ধ গলির বদ্ধ কুঠরীতে বসে শুকনো রুটি চিবোবার কাহিনী আলোচনা করতে হয়তো ভালো লাগবে, কিন্তু যে ঘরে এখন বসেছিল সেও যে ঐ বদ্ধ কুঠরীর প্রায় সমগোত্রীয় এটা ভাবতেও যে মন দ্বিধা সংকুচিত হয়ে উঠবে আপনার। আপনি অস্বস্তিবোধ করবেন যখন আপনার পুরনো বন্ধু বলবে যে তার বইগুলো আর বিক্রি হয় না, তার লেখা গল্প আর চলে না, থিয়েটার কোম্পানীর ম্যানেজার তার নাটক পড়ে দেখে না, কিন্তু যখন কোনো চালু নাটকের সঙ্গে সে তুলনা করবে (সেই সময় সে অভিযোগের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে আপনার দিকে) তখন সে কঠোর হয়ে উঠবে। আপনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়বেন, মুখ ফিরিয়ে নেবেন অন্যদিকে। আপনার ব্যর্থতাকে আপনি বাড়িয়ে বলবেন তার কাছে, যাতে সে মনে করে যে জীবন শুধু অকৃপণ নয় আপনার কাছে। যতটা কটূক্তি সম্ভব আপনি করবেন আপনার নিজের লেখা সম্বন্ধে, এবং বিস্ময়ে একরকম আঁতকে উঠবেন যখন শুনবেন আপনার বন্ধুরও ঠিক সেই মত। পাঠক মহলের চঞ্চল মতির কথাও আপনি উল্লেখ করবেন যাতে মনে মনে সে আশ্বস্ত হয় যে আপনার এই লোকপ্রিয়তা আর প্রতিপত্তিও চিরস্থায়ী নয়। সে প্রীতিবদ্ধ বন্ধু কিন্তু কঠোর সমালোচক।

—আমি তোমার শেষ বইটা পড়িনি, বন্ধু বলবে। কিন্তু তার আগেরটা পড়েছিলাম। বইটার নাম ভুলে গিয়েছি।

আপনি নামটা তাকে বলবেন।

—আমি কিন্তু খুব হতাশ হয়েছিলাম। তোমার অন্য বইগুলোর কোনো কোনোটির মতো তত ভালো হয়েছিল বলে আমার মনে হয়নি। অবশ্যি তুমি তো জানই আমার কোন বইটা বিশেষ ভালো লাগে।

আপনি তখন, এই বন্ধুটিকে বাদ দিয়ে অপরের হাতে নাজেহাল হয়ে থাকলেও, নির্বিবাদে আপনার প্রথম জীবনের যে কোনো একটা বইয়ের নাম করে

বসবেন। যখন লিখেছিলেন তখন হয়তো আপনার বয়স ছিল মাত্র কুড়ি, আপনার অনভিজ্ঞতার স্বাক্ষর হয়তো ছিল বইটার প্রতি পাতায় পাতায়।
—এটার মতো এত সুন্দর জিনিস তুমি আর লিখতে পারবে না কোনোদিন। খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই আপনার বন্ধু বলে উঠবে এবং আপনার নিজেরও মনে হবে আপনার সারাটা জীবনের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেছে একমাত্র ঐ বইটির কাছেই। আমার সব সময় মনে হয়, যে সম্ভাবনা তুমি দেখিয়েছিলে তাকে পূরণ করতে পারনি।
গ্যাসের আগুনে আপনার পা হয়তো গরম হয়ে উঠবে। কিন্তু আপনার হাত দুটো লাগবে হিম শীতল। হাত ঘড়ির দিকে বার বার আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন এবং মনে মনে ভাববেন দশটার মতো এত সকাল সকাল বিদায় নিলে আপনার বন্ধু কিছু মনে করবে কি না। আপনার গাড়ি-খানা গলির মোড়ে রেখে এসেছেন, বাড়ির সামনে আনেন নি। পাছে গাড়িটার প্রাচুর্যের বিলাসিতা বন্ধুর দারিদ্রকে প্রকট করে তোলে, কিন্তু বাড়ির দোরগড়ায় এসে বন্ধু বলবে আপনাকে ঃ
—গলিটার ঐ শেষ মাথায় বাস পাবে। চল ওটুকু পথ তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসছি।
আপনি আঁতকে উঠবেন, তখন বলে ফেলবেন যে আপনার গাড়ি আছে। সে অবাক হয়ে যাবে গলির মোড়ে সফার অপেক্ষা করছে কেন। আপনি বলবেন ঐ ওর একটা বাতিক। গাড়ির কাছে পৌঁছে বন্ধুটি একটু অল্প-বিস্তর বাহাদুরী দৃষ্টিতেই তাকাবে ওটার দিকে। আপনি একটু সমিহভাব নিয়ে একদিন ডিনার খেতে আসতে নিমন্ত্রণ করবেন তাকে। তাকে চিঠি লেখবার প্রতিশ্রুতি দেবেন, তারপর ভাবতে ভাবতে গাড়ি ছেড়ে দেবেন। কি জানি সে এলে পর ক্লেরিজের কথা বললে হয়তো মনে করবে বড়োলোকী চাল দিচ্ছেন, আর সোহোর কথা উল্লেখ করলে কিজানি হয়তো মনে করবে তুচ্ছ করছেন তাকে।
এ জাতীয় ঝঞ্ঝাট কোনোদিন পোয়াতে হয়নি রয় কিয়ারকে। কথাটা শুনতে হয়তো খুব কঠোর শোনাবে যে, যখনই কারো সঙ্গে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে তখনই তাকে সে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু বিষয়টিকে আরও সুক্ষ্মভাবে গুছিয়ে বলতে গেলে এতসব ইঙ্গিত, আভাস, আলোচনা, তুলনা ইত্যাদি দিয়ে স্থান এবং সময়ের অপনোদন প্রয়োজন যে, যখন গোড়াতে আসল কথাটা তাই, তখন ঐটুকু বলে শেষ করে দেওয়াই বাঞ্ছনীয় আমার মতে। যখনি কারও সঙ্গে আমরা অপ্রিয় ব্যবহার করি তখন অনেকেই আমরা সবসময় তার বিরুদ্ধে একটা বিরূপ মনোভাব পুষে রাখি মনে মনে। কিন্তু রয়-এর অন্তঃকরণ

সব সময় স্থির। কোনোদিন ওসব ক্ষুদ্রতাকে প্রশ্রয় দিত না। কারো সঙ্গে অপ্রিয় বা অভদ্র ব্যবহার করেও তার বিরুদ্ধে কখনো কোনো বিরূপ মনোভাব পোষণ করত না।

—বেচারা স্মিথ, সে হয়তো বলত —বড়ো ভালো লোক। খুব ভালো লাগে আমার। কিন্তু খুব দুঃখের বিষয় কেমন যেন তেতো হয়ে উঠেছে আজকাল। কেউ যদি ওর জন্য কিছু করতে পারত খুব খুশী হতাম। না, বহুদিন আমার দেখা হয়নি ওর সঙ্গে। পুরনো বন্ধুত্ব জিইয়ে রেখে কোনো লাভ নেই। উভয়ের পক্ষে কষ্টকর। আসল কথাটা হচ্ছে মানুষকে মানুষই ছাড়িয়ে যায়, কাজেই বাস্তবকে সত্য বলে মেনে নেওয়া উচিত।

কিন্তু ঘটনাচক্রে রয়াল আকাদেমির অথবা এমনি কোনো জমায়েত উপলক্ষে স্মিথের সঙ্গে আকস্মিক ভাবে দেখা হলে রয়-এর মতো আন্তরিকতা দেখাতে পারে এমন খুব কম লোকই সেখানে দেখতে পাবেন। বন্ধুর হাত সে জড়িয়ে ধরবে এবং বলবে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় সে কত খুশী হয়েছে। তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সূর্যের কিরণ যেমন ছড়িয়ে পড়ে তেমনি প্রীতির ঝলকে উছলে উঠবে তার চোখ মুখ। প্রীতির এমনি অদ্ভুত সজীবতা দেখে স্মিথ উল্লসিত হয়ে উঠবে। সে ভাববে সত্যি কী অদ্ভুত ভালো মানুষ এই রয়—সে যখন বলেছে সে স্মিথের শেষ বইটার মতো একখানা লিখতে পারলে সে বর্তে যেত। অপর পক্ষে রয় যদি মনে করে স্মিথ তাকে দেখতে পায়নি, সে হয়তো তখন মুখ ফিরিয়ে নেবে অন্য দিকে। কিন্তু স্মিথ হয়তো সত্যি তাকে দেখেছিল, বন্ধুর এমনি এড়িয়ে যাওয়ায় স্মিথ রুষ্ট হবে। সে ঝাঁঝিয়ে উঠবে। সে বলবে একদিন ছিল, যখন কোনো মামুলী রেস্তোরাঁয় তার সঙ্গে বসে অতি সাধারণ খাবার খেতেও রয় খুশী হত এবং সেন্ট আইরিশ-এ গিয়ে কোনো জেলের কুঁড়ে ঘরে মাস ভর ছুটি কাটিয়ে আসতেও আপত্তি করত না। স্মিথ আরও বলবে রয় একজন পাক্কা টাইম-সার্ভার। সে এক নম্বরের স্নব। পুরোদস্তুর হমবগ।

কিন্তু এইখানেই স্মিথের ভুল। নিষ্ঠা জিনিসটাই অলরয় কিয়ার চরিত্রের একটা উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। মাত্র পঁচিশটি বৎসরে কারো পক্ষে হমবগ হওয়া সম্ভব নয়। শঠতার মতো দুর্গুণকে আয়ত্ত করা খুবই কঠিন; অবিরাম তৎপরতা এবং অকুণ্ঠ নির্বিকারতার প্রয়োজন। ব্যভিচার অথবা অতি ভোজন প্রীতির মতো অবসর অনুশীলন সাপেক্ষ নয়, এতে লেগে থাকা দরকার। কিছুটা সিনিক সুলভ রসজ্ঞানও থাকা চাই। যদিও রয় খুব হাসতে পারত। তবুও তার একটুও রসজ্ঞান আছে বলে কোনোদিন আমার মনে হয় নি। এবং এও আমি খুব নিশ্চিত যে সিনিক হওয়া একেবারে

অসম্ভব তার পক্ষে। যদিও আমি তার খুব বেশী সংখ্যক বই পড়ে শেষ করি নি, তবু অনেকগুলি আমি পড়তে শুরু করেছিলাম ; আমার মতে সেই সব বইগুলোর অসংখ্য পাতায় পাতায় ঐ নিষ্ঠার স্বাক্ষর আছে। তার স্থায়ী জনপ্রিয়তার স্পষ্টত এইটাই মুখ্য কারণ। অন্যান্য সবাই যুগোচিত, যাতে বিশ্বাস করত তারও আন্তরিক বিশ্বাস ছিল ঐসব কিছুতে। অভিজাত সমাজ সম্বন্ধে সে যখন লিখত তখন সেই সমাজের নীতিজ্ঞানহীনতা এবং অধঃপতন সম্বন্ধে যেমনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করত তেমনি সেই সমাজের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শাসন করবার মতো বিশেষ আভিজাত্য এবং সহজাত ক্ষমতার ওপর তার আস্থা ছিল। আবার পরবর্তী যুগে যখন মধ্যবিত্ত সমাজ তার সাহিত্যের বিষয়বস্তু হলো তখনও সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত যে এই সমাজই জাতির মেরুদণ্ড। তার উপন্যাসে যারা দুর্জন তারা পুরোপুরি দুর্জন, যারা নায়ক তারা স্বাস্থ্য এবং শৌর্যে সত্যিকার নায়ক, তার কুমারী চরিত্র পবিত্রতায় ভাস্বর।

স্তুতিবাক্য-প্রধান পুস্তক সমালোচক লেখকদের রয় লাঞ্চ খেতে ডাকত, কারণ তাদের অনুকূল অভিমতের জন্য সত্যি সে কৃতজ্ঞতা অনুভব করত। অপর পক্ষে নিজেকে সংশোধন করবার আগ্রহ থেকে বিরুদ্ধ সমালোচকদের সে অনুরোধ করত। যখন টেক্সাস অথবা পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া থেকে তার অপরিচিত ভক্তরা লণ্ডনে আসত তখন শুধু আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে নিয়েই তাদের ন্যাশানাল গ্যালারিতে নিয়ে যেত না, ঐ সব ভক্তদের শিল্পের প্রতি কতটুকু অনুরাগ সেটুকু জানবার জন্যও তার আন্তরিক আগ্রহ থাকত। তার আন্তরিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে হলে তার বক্তৃতাগুলিও আপনাকে শুনতে হবে।

যখন সে বক্তৃতামঞ্চে এসে দাঁড়াত, হয়তো পরণে থাকত খুবই পরিপাটি করে সান্ধ্য পোশাক। অথবা খুব ঢিলে-ঢালা অনেকবার পরা হয়েছে অথচ খুবই সময়োপযোগী এমনি লাউঞ্জ সুট। খুব গম্ভীর স্পষ্ট অথচ শ্রদ্ধায় উদ্ভাসিত ভাব নিয়ে যখন দর্শকবৃন্দের দিকে তাকাত, তখন এটুকু উপলব্ধি আপনি না করে পারতেন না যে পূর্ণ একাগ্রতা নিয়েই সে স্ব কর্তব্যে আত্ম-নিয়োগ করেছে। মাঝে মাঝে কথার খেই হারিয়ে যাবার ভান হয়তো সে করবে, কিন্তু সেও কেবল তার বক্তব্যকে জোরদার করবার উদ্দেশ্যে। ভরা পুরুষালী গলায় সে কথা বলবে। সে সুন্দর গল্প বলবে। কখনও বিরক্তিকর হয়ে উঠবে না। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার তরুণ সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে সে পছন্দ করত। দর্শকদের সামনে এদের রচনার গুণাবলী এমনি উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে আলোচনা করত যে তাতেই তার মনের উদারতা প্রকাশ পেত। হয়তো সে বেশি বলে ফেলত, কেননা তার বক্তৃতা শুনবার পর এদের বইগুলি পড়বার প্রয়োজন আর আপনার মনে হতো না।

আমার মনে হয়, বোধহয় এই কারণেই যখন র্যর কোনো শহরে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে আসত, তারপর এইসব লেখকের একখানা বইও বিক্রি হতো না। অথচ তার নিজের বইগুলো হুড় হুড় করে কেটে যেত। তার পরিশ্রম করবার ক্ষমতা ছিল অসীম। শুধু যুক্তরাষ্ট্রে সে ভ্রমণ করেনি, ইংলণ্ডের আনাচে কানাচে সে বক্তৃতা দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। এমন কোনো ছোটো ক্লাব ছিল না, এমন কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সমিতি ছিল না, যেখানে মাত্র একটি ঘণ্টা কাটাবার অনুরোধ সে উপেক্ষা করত। মাঝে মাঝে এইসব বক্তৃতাগুলি সে পরিমার্জিত পরিবর্দ্ধিত করত। তারপর অতি পরিপাটি ছোট্ট বই আকারে সেগুলো প্রকাশ করত। যাদের এসব বিষয়ে আগ্রহ আছে তাদের অনেকেই হয়তো তার 'আধুনিক ঔপন্যাসিক' 'রুশ উপন্যাস' এবং 'কয়েকটি লেখকের কথা' নামে বইগুলো পড়ে থাকবেন। যারা পড়েছেন তাঁদের কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে লেখকের সাহিত্যের প্রতি একনিষ্ঠ অনুরাগ এবং তার ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়েছে তার এইসব রচনাগুলিতে।

কিন্তু এতেই তার কর্মসূচী শেষ হয়নি। লেখকদের স্বার্থ সংরক্ষণ অথবা বার্ধক্য রোগজনিত দুরবস্থায় পতিত লেখকদের দুর্দশা দূর করবার জন্য যেসমস্ত সংস্থা গড়ে উঠেছিল, সে সেইসবগুলির সক্রিয় সভ্য ছিল। যখনই কপিরাইট আইন প্রণয়ণ বিষয়বস্তু হতো সে তার সক্রিয় সহযোগিতা দিতে সচেষ্ট থাকত এবং বিভিন্ন দেশ ও জাতির লেখক সম্প্রদায়ের ভেতর পরস্পর সৌহার্দ্র্য স্থাপনের জন্য যেকোনো বিদেশ গমনেচ্ছু প্রতিনিধি দলের ভেতর নিজের আসন ব্যবস্থা করতেও কোনোদিন সে কার্পণ্য করত না। যে কোনো সাধারণ ভোজসভায় লেখকদের পক্ষ থেকে বলবার জন্য তার নাম ধরে রাখা যেত, এবং বিদেশাগত কোনো সাহিত্যিক মহারথীকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য গঠিত অভ্যর্থনা সমিতিতে অবশ্যি সে থাকত, অন্ততঃ একখানা বইয়ে তার অটোগ্রাফ ছাড়া কোনো বই থাকত এমন কোনো বইয়ের বাজার ছিল না। কাউকে ইণ্টারভিউ দিতে কখনও অস্বীকার করত না। সে ঠিকই বলত যে লেখকের ব্যবসা যে কতটুকু কষ্টকর তার চেয়ে কেউ বেশি জানত না, কাজেই তার সঙ্গে কয়েক মিনিটের ঘরোয়া আলাপের বিনিময়ে কয়েক মুদ্রা গিনি উপার্জন করতে সে যদি কোনো দুর্দশাগ্রস্ত সাংবাদিককে সাহায্য করতে পারত তাহলে সেই সুযোগটুকু দিতে অস্বীকার করবার মতো অমানুষ সে হতো না কখনও। সাধারণতঃ সে তার দর্শনপ্রার্থীদের লাঞ্চ খেতে বলত এবং তার উপর বেশ একটা ছাপ রাখতে ভুল হতো খুব কমই। শুধু একটিমাত্র শর্ত থাকত লেখাটা প্রকাশ করবার আগে তাকে দেখতে দিতে হবে। যারা সংবাদপত্র, পাঠকদের অবগতির জন্য বিশিষ্ট লেখকদের অসময়ে টেলিফোনে

ডেকে জিজ্ঞাসা করত তাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কিনা অথবা প্রাতরাশের সময় তাঁরা কী কী খান, সেসব লোকের ওপরও সে কখনও বিরক্ত হতো না। যেকোনো রকম সিমপোজিয়মে সে যোগ দিত, এবং মাদক বর্জন, নিরামিষ ভোজন, জাজ সংগীত, রশুন খাওয়া, ব্যয়াম করা, বিবাহ, রাজনীতি এবং গৃহে নারীর স্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে তার কী অভিমত জনসাধারণ জানত।
বিবাহ সম্বন্ধে তার মত একটু বিশেষ রকম নৈর্ব্যক্তিক ছিল। কারণ শিল্প সাধনার কঠিনতম দুঃসহ পরিবেশকে যে বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করা অনেক শিল্পীর পক্ষে কঠিন হয়েছে সেই বিশেষ অবস্থাকে রয় খুব সহজে এবং সার্থকভাবে এড়িয়ে গেছে। অনেকেই জানত একজন বিশিষ্টা বিবাহিতা মহিলার জন্য সে বহুদিন একটা অচরিতার্থ তৃষ্ণা পোষণ করত। যদিও সেই মহিলা সম্বন্ধে নায়কোচিত সপ্রশংস মন ছাড়া কোনোদিন সে কথা বলত না। এটা স্পষ্ট ছিল যে ঐ মহিলার কাছে সে কঠোর আচরণ পেয়েছিল। তার সাহিত্যিক জীবনের মধ্যযুগীয় উপন্যাসগুলির নির্মম তিক্ততার ভেতর দিয়েই তার সেই তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছিল। তার আত্মার এমনি বেদনাময় নিপীড়নের জন্যই সে সময়কার উচ্ছৃঙ্খল সমাজে গিলটি করা আভরণ স্বরূপ যেসব মেয়েরা চলা ফেরা করত এবং একজন সার্থক ঔপন্যাসিকের সঙ্গে বিবাহের নিরাপত্তার বিনিময়ে বর্তমানের যেকোনো অনিশ্চয়তাকে সানন্দে যারা মেনে নিতে রাজি হত এমনি যে কোনো সাধারণ মেয়েদের প্রেম নিবেদনকে আঘাত না দিয়েও উপেক্ষা করতে সে সক্ষম হয়েছিল। এইসব মেয়েদের উজ্জ্বল চোখে যখন রেজেস্ট্রী অফিসের ছায়া দেখত সে তাদের বলত যে স্থায়ী বন্ধনে সে জড়িয়ে পড়তে পারবে না। তার প্রথম প্রেমের স্মৃতি তাকে বাধা দেবে। তার এমনি বিদঘুটে যুক্তিতে হয়তো তারা রাগ করত, কিন্তু পিছিয়ে যেত না। যখন সে ভাবত যে সংসার ধর্মের আনন্দ এবং পিতৃত্বের পরিতৃপ্তি থেকে চিরকালের জন্য নিজেকে বঞ্চিত করতে হবে, তখন শুধু একটা ছোট্ট দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলত। কিন্তু এইটুকু স্বার্থ ত্যাগ করতেও সে প্রস্তুত ছিল। শুধু তার আদর্শের জন্য নয়, তার আনন্দের অনাগত সাথীর জন্যও। সে লক্ষ্য করেছিল লেখক-পত্নী অথবা শিল্পী-পত্নীদের নিয়ে জনসাধারণ সত্যি মাথা ঘামাতে চায় না। যেসব শিল্পীরা যেখানেই যেত নিজেদের স্ত্রীদের সঙ্গে নিতে চাইত তারা শুধু নিজেদের বিব্রত করত এবং ফলে অনেক ক্ষেত্রেই যেখানে তারা যেতে চাইত সেখানে যাবার সুযোগ মিলত না, কিন্তু আবার স্ত্রীকে বাড়ি রেখে গেলেও ছিল অন্য বিপদ, ফিরে আসার পর যে বিক্ষুব্ধ পরিবেশের সম্মুখীন হতে হতো তাতে তার সৃষ্টিকর্মের জন্য অতি প্রয়োজনীয় শান্তিটুকু ব্যাহত হতো। অলরয় কিয়ার আজও

অকৃতদার। পঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে গিয়েছে, হয়তো তাই থাকবে। একজন সাহিত্যিকের পক্ষে পরিশ্রম, সাধারণ বুদ্ধি, সততা এবং কার্যকারণের ভেতর সামঞ্জস্য সাধন করে যতটুকু করা সম্ভব এবং প্রতিষ্ঠার যতটুকু উচ্চ আসনে উঠা সম্ভব, তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ অলরয় কিয়ার। সে সত্যি অতি ভালো মানুষ এবং তার সাফল্যকে ঈর্ষা করা একমাত্র নিরেট অর্বাচীনের পক্ষেই হয়তো সম্ভব। আমার মনে হলো তার এই ছবিটি চোখের সামনে রেখে ঘুমুতে গেলেই হয়তো আমার সুনিদ্রা হবে। মিস ফেলোজকে একটা চিরকুট লিখে রেখে পাইপের ছাইটা ঝেড়ে ফেললাম। তারপর বসবার ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম।

দুই

পরদিন সকালবেলা যখন খবরের কাগজটা এবং সেদিনকার ডাকের চিঠিপত্রগুলো চেপে পাঠালাম তখন মিস ফেলোজকে লেখা চিরকুটের উত্তরে আমার কাছে জবাব এল যে আজকে বেলা একটা পনের মিনিটের সময় মিঃ অলরয় কিয়ার তাঁর সেণ্ট জেমস স্ট্রীটের ক্লাবে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। তাই একটা বাজবার একটু আগেই আমার নিজের ক্লাবের দিকে হাঁটতে হাঁটতে চললাম। একটু ককটেল খেয়ে নেওয়া যাবে, কারণ জানতাম ওটার ব্যবস্থা অলরয় কিয়ার করবে না। তারপর রাস্তার দুধারের দোকানগুলোর শো-কেস দেখতে দেখতে সেণ্ট জেমস স্ট্রীট ধরে ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম। তখনও হাতে বেশ কিছুটা সময় ছিল, ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় গিয়ে হাজির হওয়া আমার আদৌ ইচ্ছে ছিল না। তাই দেখবার মতো কিছু আছে কিনা খোঁজ নিতে খ্রীষ্টিদের ওখানে গিয়েই ঢুকে পড়লাম। নিলামের ডাক তখন শুরু হয়ে গিয়েছিল। গুটি কয়েক লোক রানী ভিক্টোরিয়া আমলের কতকগুলো রুপোর জিনিস নাড়াচাড়া করছিল আর নিলামদার ওদেরই ভাব ভঙ্গি বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করতে করতে গুন গুন করে ডেকে চলছিল। প্রথম ডাক দশ শিলিং, এগার, সাড়ে এগার…। অদ্ভুত সুন্দর ছিল সেই দিনটা—জুন মাসের গোড়ার দিক, কিং স্ট্রীটের—আবহাওয়াটা তখন বেশ স্বচ্ছ। খ্রীষ্টিদের দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলি ভারি অস্পষ্ট লাগছিল। আমি দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লা রাস্তায় লোকগুলি যেন কেমন একটা নিস্পৃহ ভাব নিয়ে পথ চলছিল, ঐ দিনের স্বাচ্ছন্দ্য ভাবটুকু বুঝি তাদের অন্তরকেও স্পর্শ করেছিল। তাই কাজের অতি ব্যস্ততার মাঝেও সহসা তাল কেটে দেওয়ার একটা বিস্ময়কর ইচ্ছা জেগেছিল তাদের, জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে তারা পথে নেমে এসেছিল। রয়-এর ক্লাবের পরিবেশটা খুবই শান্তিপূর্ণ। পাশের ছোটো ঘরটিতে শুধু

একটি বৃদ্ধ ভৃত্য আর একজন মাত্র পরিচারককে দেখতে পেলাম। নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতার পরিবেশে সহসা কেমন একটা বিষাদের অনুভূতি আমার মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, মনে হলো এই ক্লাবের সভ্যেরা বুঝি তাদের প্রধান বেয়ারার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করছে। যখন আমি রয়-এর নাম করলাম তখন ঐ পরিচারকটি টুপি এবং ছড়িটা রাখবার জন্য আমাকে একটা ফাঁকা প্যাসেজের ভেতর নিয়ে গেল। তারপর একটা ফাঁকা হল ঘরে নিয়ে গেল, দেখলাম হলঘরের দেয়ালে ভিক্টোরিও যুগের প্রখ্যাতনামা রাজনীতিকদের প্রতিকৃতি ঝুলছে। একটা চামড়ার সোফা ছেড়ে রয় উঠে এল এবং আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাল।

—চলুন, সোজা ওপরে চলে যাই। সে বলল।

আমি ঠিকই ভেবেছিলাম যে, সে আমাকে ককটেল অফার করবে না, নিজের সুবুদ্ধিকে তাই আমি ধন্যবাদ দিলাম। কার্পেটে মোড়া সিঁড়ি দিয়ে সে আমাকে ওপরে নিয়ে চলল, উঠতে উঠতে কারও সঙ্গে দেখা হলো না আমাদের। বাইরের অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ ডাইনিং-রুমে গিয়ে আমরা হাজির হলাম। তখন সে ঘরে আমরা মাত্র দুটি প্রাণী। বেশ বড়ো রকম ঘরখানা, তকতকে ঝকঝকে, মাত্র একখানা বড়ো খোলা জানালা। সেই জানালার ধারে গিয়ে আমরা বসলাম। একটি অতি গম্ভীর বেয়ারা খাবারের তালিকা এনে আমাদের সামনে রাখল—গো-মাংস, ছাগ-মাংস, ভেড়ার-মাংস, বরফ দেওয়া স্যালমন মাছ, আপেলের চাটনি, গুজবেরি চাটনি ইত্যাদি। ঐ তালিকার উপর চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললাম যখন পথের ধারের ঐসব রেস্তোরাঁগুলির কথা আমার মনে পড়ল। যেখানে ফরাসী পাচকের হাতে তৈরি সুস্বাদু খাবার-জীবনের চঞ্চলতা আর রঙ-মাখা অর্দ্ধবসনা রূপসী বিলাসিনীদের ছড়াছড়ি।

—ভিল এবং হ্যাম-পাই নেওয়া যেতে পারে, কী বলেন ? রয় বলল।

—বেশ।

—স্যালাড কিন্তু আমি নিজের হাতে মেলাব। আলতো ভাবে অথচ বেশ একটু আদেশের সুরে সে বেয়ারাকে বলল। তারপর খাবার তালিকাটির ওপর আবার একটিবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল—তারপর কিছুটা সবজি হলে, কেমন হয় বলুন তো ?

—খুব ভালো।

তার হাবভাব ততক্ষণ বেশ ভারিক্কি হয়ে উঠেছে।

—সবজি দুজনের মতো। হ্যাঁ শোন, চেফ্‌কে বলো সে নিজেই যেন বেছে

দেয়। তারপর, ড্রিংক কোনটা চান বলুন! এক বোতল 'হক' হলে কেমন হয়? আমাদের এখানকার এ বস্তুটার কিন্তু বেশ একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আমি যখন তার প্রস্তাবে রাজি হলাম, স্টুয়ার্ডকে ডেকে দিতে সে বেয়ারাকে ডাকল। ঐ আদেশ দেবার ভঙ্গিটুকুর ভেতর ওর কেমন একটা কর্তৃত্বের সুর মেশানো ছিল। অথচ সৌজন্যের কোনো অভাব ছিল না, আমি প্রশংসা না করে পারলাম না। মনে হলো যেন কোনো রাজা তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষদের কাউকে ডেকে পাঠিয়েছেন। মদের তালিকা হাতে নিয়ে তক্ষুনি স্টুয়ার্ড ছুটে এল। তার পরণে কালো পোশাক এবং গলায় পদাধিকারের চিহ্ন স্বরূপ একটা রূপোর মালা। বেশ একটা অতি পরিচিতের ভাব নিয়ে রয় ইশারায় তাকে ডাকল:

—হ্যালো আর্মস্ট্রং, আমার প্রিয় ঐ ব্র্যাণ্ডটা আমাদের চাই।

—যে আজ্ঞে, হুজুর।

—কেমন আছে জিনিসটা? ভালো তো? জানো, এ জিনিস কিন্তু আমরা আর পাব না।

—আজ্ঞে, জানি হুজুর।

—কেমন, মাঝ-দরিয়ায় ভরাডুবি না হওয়াই সমিচীন? কী বল আর্মস্ট্রং?

স্টুয়ার্ডের দিকে হৃদ্যতার ভাব দেখিয়ে রয় একটু মুচকি হাসল। তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে স্টুয়ার্ড জানত যে সভ্যদের এমনি কোনো মন্তব্যের জবাব দেওয়া প্রয়োজন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর।

রয় হেসে ফেলল, তার চোখে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার স্পষ্ট প্রয়াস লক্ষ্য করলাম। অদ্ভুত লোক এই আর্মস্ট্রং।

—বেশ ঠাণ্ডা করে এনো, আর্মস্ট্রং, দেখো খুব বেশী ঠাণ্ডা নয়, ঠিক আন্দাজ মতন হওয়া চাই। আমাদের এই মাননীয় অতিথিকে জানিয়ে দিতে চাই যে আমরা জানি কিসে কি হয়, বুঝলে তো? বলেই সে আমার দিকে আবার ফিরে তাকাল—জানেন, এই আর্মস্ট্রং আমাদের এখানে আছে আজ আটচল্লিশ বছর। স্টুয়ার্ড বেরিয়ে যাবার পর আবার বলল:

—আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি বলে বোধ হয় কিছু মনে করছেন না। জায়গাটা খুব নিরিবিলি, আমরা স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলতে পারব। প্রায় এক যুগ হয়ে গেল আমরা একসঙ্গে বসে কথাবার্তা বলিনি। আপনাকে কিন্তু আজকে বেশ ভালো দেখাচ্ছে।

এই কথাতেই রয়-এর চেহারার দিকে আমার নজর পড়ল।

—না, ঠিক আপনার অর্দ্ধেকও নয়। আমি জবাব দিলাম।

—পরিমিত, শান্ত এবং সংযত জীবন যাপন করবার ফল। বলেই সে হেসে ফেলল। প্রচুর কাজ। প্রচুর পরিশ্রম। তারপর, আপনার গল্‌ফ কেমন চলছে? এর মধ্যে চলুন না একদিন গল্‌ফ খেলবেন।

রয় একজন ধুরন্ধর খেলোয়াড় আমি জানতাম এবং আমার মতো আনাড়ী খেলোয়াড়ের সঙ্গে একটি দিন নষ্ট করে যে সে খুশী হবে না এও ঠিক। তবু তার এমনি অনিশ্চিত ভাসা-ভাসা আমন্ত্রণ গ্রহণ করা আমি নিরাপদ মনে করলাম। অটুট স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্তি বলেই তাকে মনে হলো। তার কোঁকড়ান চুলে বেশ কিছু পাক ধরে গিয়েছিল, তবু তাকে সুন্দর মানিয়েছিল। এতেই যেন তার রোদে পোড়া তামাটে মুখটা আরও বেশী কচি কচি লাগছিল। যে চোখ-দুটি দিয়ে সারাটা দুনিয়াকে সে আন্তরিকতার দৃষ্টিতে দেখত, সেই চোখদুটি কেমন উজ্জ্বল এবং স্বচ্ছ। যুবা বয়সে যেমন ছিল ততটা রোগা মনে হলো না তাকে। তার দেহের এই কিছুটা মেদ বাহুল্য তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছিল। তার প্রতিটা মন্তব্যের ওজন বেড়ে গিয়েছিল এতে। আগের চেয়েও তার চাল চলনে বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিশ্চয়তা এসেছিল বলেই তার উপর আস্থা স্থাপন করাও সহজ হয়ে উঠেছিল। তার নিজের চেয়ারে এমন ভাবে সে চেপে বসত যে মনে হতো সে বুঝি কোনো এক মনুমেন্টের চূড়ায় উঠে বসেছে।

জানিনা, যদিও তাই আমার ইচ্ছা ছিল, বেয়ারার সঙ্গে তার সংলাপের যে বিবরণ আমি দিয়েছি তাতে তার কথাবার্তায় যে বুদ্ধির দীপ্তি এবং প্রাঞ্জলতার অভাব এই কথাটাই আমি ঠিক বুঝাতে পেরেছি কিনা; তবে তার সেই সংলাপ খুবই সরল বোধ হয়েছিল। কিন্তু কথা বলতে বলতে সে এত বেশী হাসছিল যে মাঝে মাঝে ভ্রম হচ্ছিল বুঝি বা তার প্রতি কথা রসিকতায় ভরপুর। কোনো মন্তব্য করতে তাকে হাতড়ে বেড়াতে হতো না, এবং সমসাময়িক যেকোনো বিষয় সম্বন্ধে এত সহজ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে আলোচনা করতে পারত যে একটি মুহূর্তের জন্যও কোনো শ্রোতার পক্ষে কষ্টকর মনে হতো না।

শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে বিশেষ প্রবণতার জন্য কথাবার্তার ভেতরও সেইসব শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করবার মতো বদ অভ্যাস অনেক লেখকদের ভেতর আমি লক্ষ্য করেছি। নিজেদের চেতনা বহির্ভূত সতর্কতা নিয়ে তারা প্রতিটা কথা উচ্চারণ করে এবং যতটুকু বলতে চায় ঠিক ততটুকু বলে। একটু বেশিও নয়, কমও নয়। কথার পুঁজি যাদের স্বভাবতই অতি সীমাবদ্ধ, সমাজের উঁচু স্তরের এইসব মানুষের পক্ষে এদের সঙ্গে কোনোরূপ সংযোগ রক্ষা করা খুবই কঠিন, কাজেই এদের

সংস্পর্শে আসতেও ইতস্তত করতে হয়। কিন্তু রয়-এর বেলাতে এসব কিছুই ছিল না।

সে যে সাধারণ লেখকদের মতো নয় এই কথাটা অতি উৎসাহ এবং আগ্রহের সঙ্গে সবাই বলত। এর চেয়ে আর কোনো প্রসংশায় সে বেশী খুশী হতো না। যাঁরা বুদ্ধিমান লোক, তারা সবসময় এমন কতকগুলো তৈরি-কথা (যে সময় আমি লিখছি সে সময় ভূতের বেগার, কথাটা খুব প্রচলিত ছিল) প্রচলিত বিশেষণ (যেমন স্বর্গীয়, লজ্জাপ্রবণ এমনি সব) এবং বিশেষ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতেন যার অর্থবোধ ওসব কর্মের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকলেই শুধু সম্ভব হতো। এতেই ছোটোখাটো আলোচনায় অনেকটা সহজ এবং ঘরোয়াভাব আনত। বেশী ভাববার প্রয়োজন হতো না। আমেরিকানরা, যারা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে কর্মঠ জাত, এই বিশেষ প্রক্রিয়াটিতে এতটা উৎকর্ষলাভ করেছে এবং এমন কতকগুলো মামুলী কথা আবিষ্কার করেছে যে একটি ক্ষুদ্রতম মুহূর্তের জন্যও তারা কী বলছে সে সম্বন্ধে একটুখানি না ভেবেই যেকোনো রকম ভাবগম্ভীর অথচ রসালো আলোচনা চালিয়ে যেতে পারে। বিশেষ রকম বড়ো বড়ো ব্যাপার সম্বন্ধে অথবা রিরংশা-বৃত্তির দিকে চালিত করবার জন্য নিজেদের মনকে মুক্ত রাখতে পারে। রয়-এর সংগ্রহশালা ছিল বিরাট এবং সুক্ষ্মতম শব্দ যোজনার ক্ষমতা ছিল অভ্রান্ত; এইজন্যই তার কথাগুলো খুব সরস হতো এবং সবসময় তার এই বিশেষ ক্ষমতাকে খুব একটা বিশেষ আগ্রহ নিয়েই সে ব্যবহার করত। যেন তার উর্বর মস্তিষ্ক থেকেই শব্দগুলো তক্ষুনি তৈরি হয়ে বেরিয়ে এসেছে।

সে এ-ও-তা নিয়ে কথা বলতে লাগল। কখনো আমাদের পরস্পরের বন্ধুদের সম্বন্ধে, আবার পর মুহূর্তেই সবে বেরিয়েছে এমনি বই এবং অপেরা সম্বন্ধে। খুবই উচ্ছ্বসিত মনে হলো তাকে। সব সময় তার আন্তরিকতার পরিচয় আমি পেয়েছি, কিন্তু আজকের আন্তরিকতা এবং হৃদ্যতায় আমি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লাম। সে দুঃখ করতে লাগল যে আমাদের উভয়ের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ কত বিরল হয়ে উঠেছে এবং মন খুলে সে বলতে লাগল তার (এইটাই তার চরিত্রের একটা প্রীতিকর বৈশিষ্ট্য) কত ভালো লাগে আমাকে ও কত উঁচু ধারণা সে পোষণ করে আমার সম্বন্ধে। আমি অনুভব করতে পারলাম, তার এই বন্ধুত্বকে হাত বাড়িয়ে নিতেই হবে আমাকে। আমি এখন কী লিখছি সে জানতে চাইল, আমিও জানতে চাইলাম তার কথা। আমরা পরস্পরকে বললাম যে অভীপ্সিত সাফল্য কেউ-ই আমরা পেলাম না। ভিল এবং হ্যাম পাই আমরা দুজনেই খেলাম এবং স্যালাড কি করে মেলাতে হয় রয় আমাকে বলল। আমরা 'হক' পান করলাম এবং ঠোঁটে পরিতৃপ্তির

আওয়াজ তুললাম। তারপর আমি কেবল ভাবতে লাগলাম কখন সে তার আসল কথা বলবে।

আমি নিজেকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারছিলাম না যে, অলরয় কিয়ার লণ্ডনের এই ভরা সিজনের সময় এমন একজন লেখককে নিয়ে অকারণ একটি ঘণ্টা অপচয় করবে। যে পুস্তক সমালোচকও নয় অথবা ম্যাটিস, রাশিয়ান ব্যালে বা মার্সেল পারশেট সম্বন্ধে আলোচনা করবার মতো উপযোগী কোনো পরিবেশে যার বিশেষ কোনো আধিপত্যও ছিল না। তাছাড়া তার বাইরের এই জাকজমকের পেছনে কিসের একটা অস্পষ্ট আশঙ্কার আভাসও যেন আমি অনুভব করছিলাম। তার আর্থিক অতি-স্বচ্ছলতার কথা যদি না জানতাম তবে এই সন্দেহটাও হয়তো আমার মনে জাগত যে আমার কাছে শ'দুই পাউণ্ড ধার চাওয়াই বোধহয় তার উদ্দেশ্য। আমার মনে হতে লাগল তাকে কথাটা বলবার সুযোগ না দিয়েই হয়তো লাঞ্চের সময় শেষ হয়ে যাবে। আমি জানতাম সে ভীষণ সাবধানী। হয়তো সে ভেবেছিল দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর এই প্রথম সাক্ষাতের দিনটিকে বন্ধুত্বের সম্পর্ক পুনঃ প্রতিষ্ঠার কাজে লাগানই বোধহয় শ্রেয় এবং এই ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থাকেও তার প্রথম সোপানরূপে মেনে নিতে সে তৈরি হয়েছিল।

—পাশের ঘরে যাই চলুন, সেখানে বসে কফি খেলে হবে, কী বলেন? সে বলল।

—আপনার যা ইচ্ছে।

—আমার মনে হয়, ওখানেই বেশী আরাম পাবেন।

তার সঙ্গে সেই ঘরের দিকেই চললাম। ঘরটা আরো একটু বেশী চওড়া, গুটি কয়েক চামড়ার আর্ম চেয়ার এবং কয়েকটা বিরাট বড়ো বড়ো সোফা দেখলাম সেখানে। টেবিলের উপর খবরের কাগজ এবং কয়েকখানা ম্যাগাজিন ছড়িয়ে আছে। দু'জন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এক কোণে বসে নিচু গলায় আলাপ করছিলেন। আমাদের দেখেই একটু বিরক্তির দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু তাইতে ও তাঁদের আন্তরিক সম্ভাষণ জানাতে রয় একটুও দমল না।

—হ্যালো, জেনারেল। ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে নাড়তে সে চেঁচিয়ে বলে উঠল।

আমি জানালার ধারে গিয়ে একটু দাঁড়িয়ে রইলাম। বাইরে দিনের চাকচিক্যের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম এবং ভাবছিলাম সেন্ট জেমস স্ট্রীটের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের কাহিনী এবং পরিচয় যদি আরো একটু বেশী জানতাম। মনে মনে বেশ লজ্জা অনুভব করলাম যে রাস্তার অপর পারের ক্লাবটির নামও আমি জানি না। রয়কে প্রশ্ন করতেও ভরসা পেলাম না। হয়তো সে মনে মনে

ঘৃণা করবে। সাধারণ রুচি সম্পন্ন অতি সাধারণ লোকও যা জানে আমি তাও জানি না। সে জানালার কাছ থেকে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। কফির সঙ্গে ব্র্যাণ্ডিও চলবে কিনা জিজ্ঞাসা করল। আমি খাব না বললাম। তবু সে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, ঐ ক্লাবের ব্র্যাণ্ডি নাকি খুব বিখ্যাত। চুল্লিটার ধারে একটা সোফায় আমরা পাশাপাশি বসলাম এবং সিগার ধরালাম।

—শেষবার এডওয়ার্ড ড্রিফিলড যখন লণ্ডন এসেছিলেন, এখানে বসেই আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেয়েছিলেন। একরকম আপন মনেই রয় বলল—বুড়োকে আমাদের এই ব্র্যাণ্ডি টেস্ট করিয়েছিলাম। খুব খুশী হয়েছিলেন। গত সপ্তাহে তাঁর বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে আমি উইক-এণ্ড কাটিয়ে এসেছি।

—তাই নাকি?

—তিনি আপনাকে অনেক কিছু বলতে বললেন।

—এটা তাঁর খুবই অনুগ্রহ বলব, আমার কথা তাঁর এখনো মনে আছে আমি ভাবতেই পারি না।

—বলেন কি, নিশ্চয় মনে আছে। বছর কয়েক আগে ও'দের ওখানে আপনি লাঞ্চ খেয়েছিলেন, তাই না? তিনি বললেন—আপনাকে দেখে বুড়ো খুশী হয়েছিলেন।

—কিন্তু তিনি হননি বোধ হয়।

—না না, সে কি! এ আপনার ভুল। এটা ঠিক তাঁকে বিশেষ সতর্কতা নিতে হতো। কেননা, বহু লোক এসে সবসময় বুড়োকে বিরক্ত করত এবং ওর স্বাস্থ্যের দিকে তাঁকেই নজর রাখতে হতো। তিনি সবসময় ভয় করতেন, হয়ত বুড়ো একটু বেশী বাড়াবাড়ি করে ফেলবেন। ভাবলেও আপনি অবাক হয়ে যাবেন কী অদ্ভুত যে, চুরাশি বৎসর বয়সে সব ক্ষমতা অটুট রেখে তিনি তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। ও'র মৃত্যুর পর অনেকবার আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি ভীষণ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। যাই বলুন, পঁচিশটি বৎসর একান্ত একাগ্রতা নিয়ে তিনি ও'র সেবা করেছেন। এ যেন ওথেলোরই মতো। সত্যি মহিলার জন্য আমার ভারি দুঃখ হয়।

—এখনও তাঁর বয়েস অনেক কম। নিশ্চয়ই তিনি আবার বিয়ে করবেন।

—না, না, ওকি বলছেন। তিনি তা কিছুতেই পারবেন না। এ একেবারে অসম্ভব।

ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে আমাদের কথায় একটু ছেদ পড়ল।

—ড্রিফিল্ডকে যখন কেউ জানত না সেই আমলের মুষ্টিমেয় পরিচিতদের ভেতর যারা এখনও বেঁচে আছেন আপনি বোধ হয় তাঁদের অন্যতম। এক সময়

তাঁর সঙ্গে আপনার খুবই পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাই না ?

—কিছুটা। তখন আমি নিতান্ত বালক এবং তিনি মাঝ বয়েসী। আমরা ঠিক সঙ্গী ছিলাম বলতে পারি না।

—হয়তো না, কিন্তু অন্য সবাই যা জানে না, তাঁর সম্বন্ধে নিশ্চয় আপনি অনেক কিছু জানেন।

—তা সত্যি।

—আচ্ছা, তাঁর সম্বন্ধে কিছু লিখবার কথা আপনি কখনও ভেবেছেন কি ?

—কই, না তো।

—কিন্তু লেখা কি আপনি উচিত মনে করেন না ? তিনি আমাদের সমকালীন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের অন্যতম। ভিক্টোরীয় যুগের শেষ লেখক বলতে পারি। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল বিরাট। গত একশত বৎসরের ভেতর যেসব শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লেখা হয়েছে, আমার মনে হয় সে সবগুলোর যেকোনো একটার মতো চিরস্থায়ী হবার যোগ্যতা আছে তাঁর উপন্যাসগুলির।

—কী জানি ! আমি কিন্তু বরাবর তাঁর লেখা বড্ড ক্লান্তিদায়ক মনে করেছি।

হাসিতে মিটমিট করা দৃষ্টিতে রয় তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

—সত্যি, আপনার মতো কথা বটে। কিন্তু আপনি সংখ্যালঘিষ্ঠদের ভেতর একজন, এ আপনি মানেন নিশ্চয়। আপনাকে বলতে আমার একটুও সঙ্কোচ নেই যে, আমি তার উপন্যাসগুলি একবার নয় দুবার নয়, বার ছয়েক পড়েছি প্রতিবার পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছে এগুলো কী অদ্ভুত সুন্দর। তাঁর মৃত্যুর পর যেসব লেখা বেরিয়েছিল সেগুলো আপনি পড়েছেন নিশ্চয় ?

—কয়েকটা। কিন্তু সবাই একমত ছিল এটাই বিস্ময়কর···আমি সবগুলো পড়েছি।

—সবাই যদি এক কথাই বলে তবে এগুলোর আদৌ কোনো দরকার ছিল কি ? রয় বেশ খোশ মেজাজের সঙ্গে তার বিরাট কাঁধ একটু আন্দোলিত করল কিন্তু আমার প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না।

—টাইমস সাহিত্য সংখ্যাটা আমার অপূর্ব লেগেছিল। ওটা পড়লে বুড়োর প্রতি সুবিচার করা হতো। শুনছি কোয়াটারলি পত্রিকাগুলো নাকি তাদের আগামী সংখ্যায় প্রবন্ধ প্রকাশ করবে।

—তাঁর লেখাগুলো এখনও আমার ক্লান্তিকর লাগে।

রয় আবার একটু হাসল।

—আচ্ছা, যাদের মতামতের কিছুটা মূল্য আছে, তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আপনার মতের অমিল হচ্ছে বলে একটুও কি আপনার অস্বোয়াস্তি লাগছে না ?

—বিশেষ কিছু নয়। আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর যাবত আমি লিখছি। আপনি

ভাবতেও পারবেন না এমন কতো অগণিত প্রতিভার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, যাদের স্বীকৃতি ক্ষণস্থায়ী। সুনাম প্রতিপত্তি দু এক বৎসরের হাসি খেলা, তারপর বিস্মৃতির অন্ধকারে চির অবলুপ্তি। অবাক হয়ে ভাবি তারা গেল কোথায়? তারা কি মৃত, তারা কি উন্মাদাগারে আশ্রয় নিয়েছে, না কি কোনো অফিসের ফাইলের তলায় আত্মগোপন করেছে? অবাক হয়ে ভাবি তবে কি তারা কোনো এক অখ্যাত পল্লীগ্রামের আরও অখ্যাত কোনো এক ডাক্তার অথবা অবিবাহিতা তন্বীর হাতে তাদের বইগুলি বিলিয়ে দিয়েছে? কী জানি, কোনো ইতালীয় ভাতা ভোগ করে এখনও তারা তেমনি বড়োই আছে কি না?

—নিশ্চয় আছে, এখনো তারা উত্তপ্ত কটাহের উত্তাপ। আমি তাদের চিনেছি।

—তাদের সম্বন্ধে বক্তৃতাও দিয়েছেন?

—দিতে হয়। সম্ভব হলে ওদের একটুখানি তুলে ধরতে ইচ্ছে করে কেননা কোনো ক্ষতি তো নেই এতে। একটুখানি বদান্যতায় দোষই বা কি বলুন। কিন্তু তবু বলব, ড্রিফিলড এই দলের ছিলেন না। তাঁর লেখার সংকলন সবসুদ্ধ পঁয়ত্রিশ খানা খণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছে। সোথবি-রা যে শেষ খণ্ডটি ছাপিয়েছে সেটি আঠাত্তর পাউণ্ডে বিক্রি হয়েছে। এ থেকেই সব পরিষ্কার। বছর বছর তাঁর বই বিক্রি সমান তালে বেড়ে চলেছে। এবং গত বছরটাই গেছে তাঁর জীবনের সেরা বছর। আমার কথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন! ওঁদের ওখানে সেবার যখন গিয়েছিলাম মিসেস ড্রিফিলড নিজেই আমাকে হিসেব দেখিয়েছিলেন। ড্রিফিলড চিরকাল বেঁচে থাকবেন এ নিশ্চিত।

—কে বলতে পারে বলুন?

—কেন, আপনার ধারণা আপনি পারেন। একটুখানি ঠেস দিয়ে রয় কথাটা বলল।

কিন্তু আমি দমি নি। বুঝতে পারলাম আমার কথায় সে তেতে উঠেছিল, তবু বেশ মজা লাগছিল আমার।

—আমার মনে হয় ছেলেবেলায় সহজাতবৃত্তি থেকে যে অভিমত আমি নিজের মনে গড়ে তুলেছিলাম সে-ই ঠিক ছিল। সবাই আমাকে বলত কারলাইল একজন বিখ্যাত লেখক। অথচ, ফরাসী বিদ্রোহ এবং 'সারটার রিসারটাস' আমার কাছে অপাঠ্য মনে হত বলে সত্যি আমি ভীষণ লজ্জাবোধ করতাম। কিন্তু এ বই দুটি কেউ পড়তে পারে এখন? আমি ভাবতাম সবার মত আমার মতের চেয়ে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ এবং নিজেকে বুঝাতে চাইতাম জর্জ মেরিডিথ নিশ্চয়ই

অপূর্ব লাগে আমার কাছে। কিন্তু অন্তর থেকে তাঁকে বড়ো কৃত্রিম বাকবহুল অসরল মনে হতো। আজকাল অনেকেই তাই মনে করে। ওয়ালটার পেটারের ভক্ত হওয়ার অর্থ ছিল নিজেকে কৃষ্টিসম্পন্ন যুবক বলে পরিচয় দেওয়া। এই কথাটা সবাই বলত বলেই আমিও ওয়ালটার পেটারকে খুব প্রশংসা করতাম। অথচ আমার মন জানে মেরিয়াস, কী বিশ্রী লাগত আমার।

—কিন্তু আমার তো মনে হয় না পেটারের লেখা কেউ পড়ে আজকাল এবং মেরিডিথও সত্যি ডুবে গিয়েছে এতদিনে। আর কারলাইল ছিল একটি আস্ত ফোঁপরা বেলুন।

—অথচ আপনি জানেন না, ত্রিশ বছর আগে এদেরই অমরত্বের দাবি কত নিরাপদ এবং নিশ্চিত ছিল।

—কিন্তু আপনার ভুল হয়নি কখনও ?

—হয়েছে দু একটা। নিউম্যান সম্বন্ধে এখন আমার যা ধারণা তার অর্দ্ধেকও তখন আমি ভাবতাম না এবং ফিট্‌জারেল্‌ড-এর ছন্দ-মধুর রুবাই গুলোর কথা আমি তখন আরো বেশী করে চিন্তা করতাম। গ্যাটের 'উইলহেম মিস্টার' আমি পড়তে পারতাম না। অথচ এই বইটিকেই এখন আমি তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি বলে মনে করি।

—তখনও আপনার ভালো লাগত এবং এখনও লাগে এমনি রচনা কোনগুলি বলুন তো ?

—এই তো যেমন ধরুন, 'ত্রিস্ট্রাম স্যাণ্ডি' 'আমেলিয়া' 'ভ্যানিটি ফেয়ার, 'মাদাম বোভারি, 'লা সারক্রস দ্য পাসি' 'আনা কারেনিনা'। তারপর ধরতে পারেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীট্‌স এবং ভালের্ঁ।

—কিছু মনে করবেন না। এ কিন্তু আদৌ মৌলিক বলে মনে হলো না।

—কিছু আসে যায় না। মৌলিক আমিও বলি না। কিন্তু আমার নিজের বিচারের উপর আমি কেন বিশ্বাসী এই আপনি জানতে চেয়েছিলেন, আমিও সেই কথাটা আপনাকে বুঝাতে চাইছিলাম। মনের ভীরুতা এবং সমকালীন কৃষ্টিগত মতবাদের উপর শ্রদ্ধা-পরবশতা হেতু আমি যা কিছু বলে থাকি, সে যুগে যেসব লেখকরা সবার প্রশংসা পেতেন, আমি মন থেকে তাঁদের কোনোদিন প্রশংসা করতে পারতাম না। ঘটনাচক্র এতে প্রমান করে দিয়েছে যে আমার কথাই সত্যি। অন্তর থেকে বা মনের সহজাত প্রেরণা থেকে যা কিছু আমার ভালো লাগত কালের পরীক্ষায় সবকিছু উতরে গেছে। শুধু আমার কাছেই নয়, সাধারণ সূক্ষ্ম বিচারের কাছেও।

রয় চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। সে তার পেয়ালার তলদেশে তাকিয়ে রইল। আরো কফি আছে কিনা দেখবার জন্য, নাকি বলবার মতো কথা খুঁজে নেবার

জন্য, বুঝতে পারলাম না। চিমনির গায়ে ঘড়িটার দিকে আমি একবার দৃষ্টি-পাত করলাম। মিনিট খানেকের ভেতরই আজকের মতো বিদায় নেওয়া সম্ভব হবে মনে হলো। আমি বোধ হয় ভুল করেছিলাম এই ভেবে যে, রয় হয়তো শুধু শেকসপীয়র এবং সঙ্গীত নিয়ে হালকা মনে আলোচনা করে সময় কাটাবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করে এনেছে এখানে। তার প্রতি বিরূপ চিন্তা মনে স্থান দেবার জন্য মনে মনে নিজেকে তিরস্কার করলাম। একটু আগ্রহ নিয়েই আমি তার দিকে ফিরে তাকালাম। ঐ যদি তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নিশ্চয় তাহলে সে ক্লান্তি অথবা নৈরাশ্য বোধ করছে। শুধু নিস্পৃহতাই যদি তার মনে আশ্রয় নিয়েছিল তাহলে নিশ্চয় এই মুহূর্তটিতে এই পৃথিবীটাই একটা বিরাট বোঝা মনে হচ্ছিল তার কাছে। কিন্তু ঘড়িটার দিকে নিক্ষিপ্ত আমার চোখের দৃষ্টিতে সে তার চোখ মিলিয়ে বলতে লাগল।

—এ আমি বিশ্বাস করি না আপনি কখনো অস্বীকার করতে পারেন যে, যে লোকটা দীর্ঘ ষাট বছর অপ্রমত্ত বেগে বইয়ের পর বই লিখে যেতে পেরেছিল, যার পাঠক সংখ্যা অপ্রতিহত গতিতে বেড়েই চলছিল দিনের পর দিন, কিছু না কিছু নিশ্চয় ছিল লোকটার ভেতর। মোট কথা ফার্নে কোর্টে গেলেই দেখতে পাবেন তাকের পর তাক সাজানো আছে পৃথিবীর সবগুলো সুসভ্য জাতির ভাষাতে অনূদিত ড্রিফিলডের বইগুলো। অবশ্য এই কথাটা স্বীকার করতে আমার একটুও অনিচ্ছা নেই যে তিনি যা লিখেছিলেন তার অনেকগুলোই অত্যন্ত সেকেলে মনে হবে আজকাল। মেঘে-ঢাকা আকাশে তাঁর গৌরব রবি উঁকি দিয়েছিল, তাই সেই আলো ছিল অস্পষ্ট। তাঁর গল্পের অধিকাংশ প্লট অতি-নাটুকে; কিন্তু একটা গুণ ছিল যেটা মানতেই হবে আপনাকে; সেটা সৌন্দর্য।

—উঁ? আমি বললাম।

—যখন সব বলা হয়ে যায়, সব শেষ হয়ে যায় তখন বলবার থাকে শুধু এই টুকু এবং ড্রিফিলড এমন একটি ছত্রও লেখেন নি যাতে সৌন্দর্যের পরশ ছিল না।

—উঁ? আমি বললাম।

—তাঁর অশীতিতম জন্ম দিবসে তাঁকে তাঁর প্রতিকৃতি উপহার দিতে যখন আমরা গিয়েছিলাম তখন আপনিও যদি থাকতেন! সত্যি মনে রাখবার মতো দিন ছিল সেটা।

—আমি কাগজে পড়েছিলাম।

—জানেন, শুধু লেখকরাই নয়, সত্যিকার প্রতিনিধিমূলক হয়েছিল সেদিনকার অনুষ্ঠান: বিজ্ঞান, রাজনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প, সারা দুনিয়ার কিছুই

বাদ যায় নি। সেদিন ব্রেকস্টেবল ষ্টেশনে গাড়ি থেকে যেসব বিশিষ্ট গুণিরা নেমেছিলেন তাঁদের এমনি একত্র সমাবেশ সত্যি একটা অবিস্মরণীয় ঘটনা। আপনি আশাই করতে পারেন না। অর্ডার অব মেরিট দিয়ে প্রধান মন্ত্রী যখন বৃদ্ধকে বিভূষিত করেছিলেন তখন সত্যি দেখতে খুবই হৃদয়স্পর্শী হয়েছিল। তিনি একটা সুন্দর বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আপনাকে বলতে বাধা নেই, সেদিন অনেকের চোখই অশ্রু-সজল হয়ে উঠেছিল।

—ড্রিফিলডও কেঁদেছিলেন নাকি ?

—না। তিনি অদ্ভুত রকম শান্ত ছিলেন। যা তাঁর স্বভাব ঠিক তেমনি ছিলেন সেদিনও। আপনিও তো জানেন, বেশ লাজুক এবং প্রশান্ত, অতি ভদ্র আবার তেমনি কৃতজ্ঞ সন্দেহ নেই, কিন্তু একটুখানি প্রাণহীন শুষ্ক। মিসেস ড্রিফিলড স্বামীকে বেশি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তে দিতে চান নি। তাই সবাই যখন লাঞ্চ খেতে গেলাম, তিনি পড়ার ঘরে রইলেন। মিসেস ড্রিফিলড ট্রেতে করে তাঁর লাঞ্চ সেখানেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সবাই যখন কফি খাচ্ছেন আমি সেই অবসরে সটকে পড়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম ড্রিফিলড পাইপ টানছেন, এবং অপলক দৃষ্টিতে নিজের প্রতিকৃতিটার দিকে তাকিয়ে আছেন। ছবিটা সম্বন্ধে তাঁর কী মনে হচ্ছে আমি জানতে চাইলাম। কিছু বলতে চাইলেন না, শুধু একবার মৃদু হাসলেন। বাঁধানো দাঁতের পাটিটা খুলে রাখবেন কিনা তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, না, এক্ষুনি বিদায় নিতে সবাই তাঁর ঘরে আসবে। তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর কি মনে হয় না জীবনের এই এক, অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। 'কিছু না, অর্থহীন' তিনি বলে উঠলেন, শুধু অর্থহীন। আমার মনে হয় খুবই সত্যি, তাঁর জীবনটা বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী জীবনে তিনি খেতে বসে চারদিক ভীষণ নোংরা করে ফেলতেন, ধূমপান করতে গিয়েও ঠিক এমনি করতেন—পাইপে তামাক পুরতে গিয়ে বিশ্রীভাবে চারদিকে ছড়িয়ে রাখতেন। এমনি অবস্থায় বাইরের কেউ এসে দেখে ফেলে এটা মিসেস ড্রিফিলড পছন্দ করতেন না। তবে আমার সমন্ধে তাঁর কোন আপত্তি ছিল না। আমি নিজের হাতেই চারদিক একটু সাজিয়ে নিলাম। সবাই ভেতরে এলেন এবং ড্রিফিলডের সঙ্গে করমর্দন করলেন। তারপর আমরা সবাই একসঙ্গে শহরে ফিরে এলাম।

আমি এবার উঠে পড়লাম।

—আমাকে যেতে হবে। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে বেশ আনন্দে কাটল সময়টা।

—লিচেস্টার গ্যালারিতে একটা ব্যক্তিগত প্রদর্শনীতে আমিও যাচ্ছি এক্ষুনি। ওখানকার সবার সঙ্গেই আমার পরিচয় আছে। যদি যেতে চান আপনাকেও

সঙ্গে নিতে পারি।

—আমার প্রতি এ আপনার অশেষ অনুগ্রহ, আমাকেও একখানা নিমন্ত্রন পত্র পাঠিয়েছে। কিন্তু না, আমার যাওয়া সম্ভব হবে না।

সিঁড়ি দিয়ে দুজনেই নীচে নেমে এলাম। আমি আমার টুপিটা তুলে নিলাম। রাস্তায় নেমে আমি যখন পিকাডেলির দিকে মোড় ফিরলাম, রয় বললেন ঃ

—ঐ মোড় পর্যন্ত চলুন আমিও যাব আপনার সঙ্গে। আমার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল—আপনি ও'র প্রথম স্ত্রীকে জানতেন, তাই না?

—কার?

—ড্রিফিলডের।

—ওহ। আমি ড্রিফিলডের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ, জানতুম।

—খুব ভালো রকম জানতেন?

—হ্যাঁ, মোটামুটি।

—আমার মনে হয় মহিলা যা-তা ছিলেন।

—সে রকম কিছু আমার মনে পড়ে না।

—নিশ্চয় খুব সাধারণ মেয়ে মানুষ ছিলেন। শুনেছি বার-মেইড ছিলেন, তাই কি?

—হ্যাঁ।

—অবাক হয়ে যাই এমনি একটি মেয়েকে ড্রিফিলড কেন বিয়ে করেছিলেন। শুনেছি স্বামীর কাছে তিনি নাকি অবিশ্বাসিনী ছিলেন।

—খুবই।

—ও'কে আপনার মনে আছে?

—হ্যাঁ, বেশ স্পষ্ট মনে আছে। একটু মুখ টিপে হেসে আমি বললাম। ভারি মিষ্টি লাগত ও'কে।

রয়ও একটু হাসল।

—সবার ধারণা কিন্তু এরকম নয়।

কোনো উত্তর দিইনি। পিকাডেলি পর্যন্ত আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম, সেখানে একটু দাঁড়িয়ে রয়কে আমার হাতখানা বাড়িয়ে দিলাম। হাতখানা ধরে সে একটু ঝাকুনি দিল, কিন্তু লক্ষ্য করলাম তার স্বাভাবিক আন্তরিকতা ছিল না। আমার ধারণা হলো আমাদের এই সাক্ষাৎকারে সে নিরাশ হয়েছে। কিন্তু কেন তা আমি ঠিক আন্দাজ করতে পারলাম না। তার মনের বাসনাকে আমি হয়তো পূরণ করতে পারি নি! তার কারণ, তার মনের ইচ্ছা যে কী তার কিঞ্চিৎমাত্র ইঙ্গিতও সে দেয়নি আমাকে। এবং রিজ হোটেলের আর্কেড ধরে

পার্কের রেলিংএর পাশ দিয়ে হাফ মুন স্ট্রীটের বিপরীত দিক পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে এসে ভাবতে লাগলাম আমার ব্যবহার হয়তো বা সাধারণ শালীনতার গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছিল। এও স্পষ্ট হলো যে অনুগ্রহ চাইবার উপযুক্ত সময় বলে আমাদের এই সাক্ষাৎকে রয় মনে করতে পারেনি।

হাফ-মুন স্ট্রীট ধরে আমি হাঁটতে লাগলাম। পিকাডেলির আনন্দোচ্ছ্বাস পেরিয়ে এসে এদিককার নিস্তব্ধতা বেশ লাগল। অত্যন্ত নিরিবিলি এবং বিশেষ ভদ্র পরিবেশ। অধিকাংশ বাড়িগুলিতেই ফ্ল্যাট ভাড়া দেয়, কিন্তু সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে বিজ্ঞাপণ দেওয়ার মতো কুৎসিত অসভ্যতা সেখানে ছিল না। কোনো কোনো বাড়িতে ডাক্তারদের মতোই ঝকঝকে পিতলের ফলকে বক্তব্য বিষয় লেখা আছে, আবার কোনো বাড়ির জানালার গায় পরিস্কার হরফে শুধু এপার্টমেণ্টে কথাটা লেখা। দুই একটা বাড়িতে বাহুল্যত বাড়ির মালিকের নামটি আছে হয়তো, যাতে অজ্ঞানতাবশতঃ দরজির দোকান অথবা বেনের দোকান বলে ভুল না হয় আপনার। জার্মিন স্ট্রীটের মতো (ওখানেও বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়) গাড়ি ঘোড়ার ভিড় নেই একটুও। হয়তো বা এখানে ওখানে কোনো বাড়ির সামনে দুটো একটা ঝকঝকে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, নয়তো বা অন্য কোনো বাড়ির দরজায় দাঁড়ান ট্যাক্সি থেকে কোনো বৃদ্ধা নামছেন। আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন জার্মিন স্ট্রীটের মানুষগুলোর মতো কুখ্যাত নয় এখানকার বাসিন্দারা। রেসের মাঠে দিন কাটিয়ে মাথা ব্যথা নিয়ে এদের ঘুম ভাঙে না। যে কুকুর কামড়েছে, সেই কুকুরকে কামড়াতে তারা ছুটে যায় না। এখানকার বাসিন্দা হয়তো কোনো সম্মানিতা অভ্যাগতা মহিলা গ্রাম থেকে শহরে এসেছেন দুদিন কাটিয়ে যেতে, নয়তো কোনো বয়স্ক ভদ্রলোক যাঁরা কোনো বিশিষ্ট ক্লাবের সভ্য। আপনার মনে হবে বছরের পর বছর একই বাড়িতে এসে তাঁরা ওঠেন এবং বাড়ির মালিকের সঙ্গে হয়তো চাকরী জীবনের সময় থেকেই তাঁদের পরিচয়। আমার বাড়িওয়ালী মিস ফেলোজও একদিন কোনো বড়লোকের বাড়িতে রাধুনীর কাজ করত কিন্তু সেফার্ড মার্কেটে তাকে বাজার করতে যেতে দেখলে কিছুতেই আপনি ভাবতে পারতেন না। ওর চেহারাটাও তেমন কিছু ভারিক্কি ছিল না। যেমন রাধুনীরা সাধারণতঃ দেখতে হয়, কথা কম বলত, তবে খুব স্পষ্ট বক্তা, বেশ পরিচ্ছন্ন এবং ফ্যাসন দুরন্তভাবে পোশাক পরত, মধ্যবয়সী মহিলা, কিন্তু চাল-চলনে প্রস্ফুট দৃঢ়তার ছাপ। ঠোঁটে রঙ মাখত, চোখে চশমা পরত। কর্মকুশল ছিল, আবার তেমনি শান্ত, বেশ কিছুটা খরচে।

আমার থাকবার ঘর কয়টা এক তলায়। পারলার সেকেলে ধরণের মার্বেলে পেপারে মোড়া ছিল। দেয়ালের গায়ে কত রকম জল রঙে আঁকা রোমাণ্টিক

ছবি। সৈনিকরা তাদের প্রিয়ার কাছে বিদায় নিচ্ছে, পুরাকালীন নাইটরা ভোজসভায় বসেছে। এমনি কত কি, ফুলদানীতে নানারকম ফুল, আর্ম চেয়ারগুলো পুরোনো ফিকে হয়ে আসা চামড়ায় ঢাকা। সারাটা ঘর যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিবেশে ঘিরে আছে। জানালা দিয়ে যখন বাইরে তাকাই ক্রাইসলার গাড়ি না দেখে ভাড়াটে র‍্যামসম চোখে পড়াই হয়তো স্বাভাবিক। পর্দাগুলিও ভারি লাল কপেড়ের।

তিন

সেদিন বিকেলে অনেককিছু করবার ছিল আমার। কিন্তু রয়এর সঙ্গে সেদিনকার কথাবার্তার রেশ, বাড়ি ফিরে ঘরে ঢুকেই সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে তার বদলে গত পরশুদিন জানিনা কেন বিশেষ করে যে ভাবটা গভীরভাবে মনের ভেতর রেখাপাত করেছিল তারই প্রভাব, এবং যারা এখনো বৃদ্ধ হননি তাঁদের মনেও যে অতীত এখনো সজাগ রয়েছে সেই অতীতের অনুভূতিবোধ। সব মিলে যেন স্মৃতির পথ ধরে ফেলে আসা দিনগুলিতে আবার ফিরে যেতে প্রলুব্ধ করল আমাকে। মনে হলো এর আগে যারা বাস করে গিয়েছে এই বাড়িতে, পিঙ্গল দাঁড়িওয়ালা পুরুষ এবং লেস দেওয়া ঘাগরা পরা ব্যস্তবাগীশ মহিলার দল, তাদের সবাই যেন সেকেলে হাবভাব এবং বিচিত্র পোশাক নিয়ে চেপে ধরল আমাকে। লণ্ডন শহরের কর্মমুখরতার নির্ঘোষিত ধ্বনি, কল্পনা বা শ্রুতিতেও যার সঙ্গে আমার অপরিচয় (হাফ মুন স্ট্রীটের আর এক মাথায় আমি বাস করতাম) এবং জুন মাসের রৌদ্রাপ্লুত দিনের রূপ বৈচিত্র আমার দিবা স্বপ্নকে গভীরতর করে তুললেও তেমন বেদনা মদির মনে হলো না যেন। যে অতীতের দিকে ফিরে তাকালাম সে অতীত যেন বাস্তবরূপ হারিয়ে ফেলল, মনে হলো এ যেন একটা নাটকের দৃশ্য, আর আমি অন্ধকার গ্যালারির পেছন সারিতে উপবিষ্ট একজন দর্শকমাত্র। তবে যতদূর দৃষ্টি যায় মনে হলো সবই স্পষ্ট। ছায়াপাতের বিরামহীন স্রোত যে জীবনের রেখা ছন্দকে মুছে দিয়েছে তারই মতো কুয়াশায় ঢাকা ম্লান হলো না একে, মধ্য ভিকটোরীয় যুগের কষ্ট সহিষ্ণু কুশলী শিল্পীর তুলিতে আঁকা নৈসর্গ তৈল চিত্রের মতোই সুক্ষ্ম এবং স্পষ্ট।

আমার মনে হয় চল্লিশ বছর আগে যা ছিল তার চেয়েও সুখকর আজকের জীবন। মানুষ যেন আরও অমায়িক হয়েছে আগের চেয়ে। সে সময় মানুষ নাকি আরও উপযুক্ত ছিল, পুণ্যবান ছিল, সবাই বলে তারা নাকি প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী ছিল, তবে সে পরিচয় আমি জানি না। আমি জানি ঘ্যান ঘ্যান করাই তাদের স্বভাব ছিল। অত্যাধিক আহার করত, আবার কেউ কেউ

প্রচুর মদ খেত, কায়িক পরিশ্রম তারা আদৌ করত না। তাদের জীবনে বিশৃঙ্খলা ছিল। পরিপাক শক্তি প্রায়ই বিকল হয়ে পড়ত। মেজাজ অত্যন্ত খিট খিটে ছিল। আমি লণ্ডনের কথা বলছি না। লণ্ডন সম্বন্ধে তখন কিছুই আমি জানতাম না বড়ো না হওয়া পর্যন্ত, অভিজাত শ্রেণীর কথাও বলছি না যারা শুধু শিকার আর বিলাসিতা নিয়েই ব্যস্ত থাকত—আমি বলছি পল্লী গ্রামের কথা। সেখানকার সাধারণ স্বল্পবিত্ত ভদ্রলোক, পাদরী, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী, এমনি আরও সব লোকের কথা—যারা সে সময়কার গ্রামীণ সমাজ গড়ে তুলত। তাদের জীবনের একঘেয়েমি বিশ্বাসের সীমা ছাড়িয়ে যেত। গলফ খেলায় প্রচলন ছিল না, খুব কম বাড়িতেই নিতান্ত মামুলী ধরণের টেনিশ কোর্ট থাকত কিনা সন্দেহ। যদিও বা থাকত তাতে শুধু ছোটো ছোটো ছেলেরাই খেলত, কেবল গ্রামের এসেম্বলী হলে হয়তো বছরে একবার নাচের পার্টি বসত। যাদের ঘোড়ার গাড়ি থাকত তারাই বিকেলে গাড়ি নিয়ে বেরুত, আর বাকি সব পায় হেঁটে বেরুত স্বাস্থ্য রক্ষার মানস নিয়ে। যে কোনোরকম অতি সাধারণ আমোদ প্রমোদ থেকেও তারা নিজেদের বঞ্চিত করত না। মাঝে মাঝেই পরস্পরের জন্য ছোটো খাটো সাধারণ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করে নিজেদের ভেতর উত্তেজনা আর হৈ চৈ-এর রসদ জোটাত (বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আসতে বলে আপনি চা পানে আপ্যায়িত করতেন মন্স ভেলৌর হোয়াইট এবং তোশটির গান আপনি গাইতেন), দিনগুলো যেন কাটত না একঘেয়ে বিরক্তিকর হয়ে উঠত। পরস্পরের মধ্যে মাত্র এক মাইলের ব্যবধানে আজীবন থাকবার দুর্ভাগ্য যাদের হতো তারা শুধু ঝগড়াই করত একে অন্যের সঙ্গে এবং প্রতিদিন শহরে গিয়ে সাক্ষাৎ হলেও আজীবন পরস্পরের মুখ দেখবে না বলে তারা দিব্যি করত। তারা সবাই ছিল দেমাকি, তাদের মাথায় যেমনি শুয়োরের বুদ্ধি আবার স্বভাব ছিল তেমনি বিদকুটে। তখন জীবনের এমনি একটা পরিবেশ ছিল যাতে এমনি চরিত্রের উদ্ভবই বুঝি সম্ভব ছিল। অধুনাকালের মতো একজনের সঙ্গে কোনো মিল ছিল না অন্য জনের, নিজস্ব বাই-বাতিক নিয়ে তারা একটা বিশেষ গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিল নিজেদের মধ্যে, কিন্তু তাদের নিয়ে উঠাবসা করা সহজ ছিল না মোটেই! হয়তো যা আমরা একটু বেশী রকম অসতর্ক এবং একটু বেশী হালকা চটুল কিন্তু মনের ভেতর সন্দেহের কালিমা নিয়ে একে অন্যকে আমরা গ্রহণ করি না কখনও। আমাদের ব্যবহার আদব কায়দা হয়তো কিছুটা রুক্ষ এবং চিন্তা বিবর্জিত, কিন্তু অকরুণ নয়। আদান প্রদানে আমরা খুবই উন্মুখ, কাঁকড়ার মতো গর্তে ঢুকে পড়ি না। সমুদ্রের ধারে কেন্ট অঞ্চলের কোনো এক ছোটো শহরের উপকণ্ঠে কাকা কাকীমার

কাছে আমি থাকতাম। সেই শহরটির নাম ব্রেকস্টেবল এবং আমার কাকা ছিলেন সেখানকার ভিকার। আমার কাকীমা ছিলেন একজন জার্মান মহিলা। তিনি একটি অভিজাত অথচ খুবই দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। সম্পত্তি হিসেবে স্বামীর জন্য যা এনেছিলেন তা ছিল মাত্র একখানা লিখবার টেবিল। সপ্তদশ শতাব্দীর কোনো পূর্ব-পুরুষদের ব্যবহার জন্য ওটা তৈরি হয়েছিল এবং একপ্রস্ত টামলার গ্লাস। এই পরিবারে আমার আবির্ভাবের সময় খুব কম কয়টিই বর্তমান ছিল তখনো এবং ড্রয়িং রুমের শোভাবর্দ্ধন করবার জন্যই শুধু ঐগুলি কাজে লাগত। ওগুলোর গায়ে খোদাই করা কোট-অব আর্ম-এর চিত্র ভীষন ভালো লাগত আমার। কোর্ট-অব-আর্মের যে কতগুলি গুচ্ছ ছিল আমি বলতে পারব না, কিন্তু সেগুলো আমাকে বুঝিয়ে দিতে কাকীমা খুব চেষ্টা করতেন। আশ্রয় দণ্ড দুটিও দেখতে অদ্ভুত সুন্দর ছিল এবং প্রতীক চিহ্নটা এমন একটা মুকুটের গায় লাগান ছিল সেটাকে অদ্ভুতরকম রোমান্টিক লাগত আমার। তিনি খুব সরল মহিলা ছিলেন। অতি নম্র এবং খ্রীস্টান সুলভ গুণ ছিল তাঁর ভেতর। কিন্তু যদিও একজন পুরোহিতের সঙ্গে দীর্ঘ পয়ত্রিশ বছর বিবাহিত জীবন কাটিয়ে এসেছেন, তবু কোনোদিন তিনি ভুলতে পারতেন না যে, তিনি এক অভিজাত বংশের কন্যা।

লণ্ডনের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক মহলে বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে এমনি ডাক-সাইটে পরিবারের এক ব্যাঙ্কার একবার গরমের ছুটি কাটাবার জন্য আমাদের পাশের বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলেন। যদিও আমার কাকা সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরিচয় করেছিলেন (আমার মনে হয় বিশেষ করে অতিরিক্ত কিউরেট সোসাইটির চাঁদা আদায় করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য) কাকীমা যেতে রাজি হননি লোকটি ব্যবসায়ী বলে। তবে তাঁকে কেউ উন্নাসিক বলত না। তাঁর ঐ ব্যবহারকে স্বাভাবিক বলে সবাই মনে করত। আমার সমবয়সী একটি ছেলে ছিল ঐ ব্যাঙ্কার ভদ্রলোকের। এবং কেমন করে আজ ভুলে গেছি, ঐ ছেলেটির সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল। এখনও আমার বেশ মনে আছে ঐ ছেলেটিকে ভিকারেজের সীমানার ভেতরে নিয়ে আসবার প্রস্তাব করায় কী তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের পরিবারের ভেতর। খুব অনিচ্ছার সঙ্গে আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বিনিময়ে সে বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি আমি পাইনি। কাকীমা বলেছিলেন, তাহলে আমি হয়তো এর পরদিন কয়লা ওয়ালার বাড়িতে যাওয়ার বায়না ধরব, আমার কাকা বলতেন—অসৎ সংসর্গ মার্জিত রুচিকে কলঙ্কমলিন করে।

প্রতি রবিবার ঐ ব্যাঙ্কার চার্চে আসতেন এবং একটা করে আধা-সভারেন

থালায় রাখতেন, কিন্তু তাঁর এই বদান্যতায় সবার মনে ভালো ধারনা হতো মনে করলে ভুল হতো। ব্রেকস্টেবলে সবাই এটা জানত, কিন্তু তাঁর যে শুধু টাকার গরম এইটাই সবাই ভাবত।

ব্রেকস্টেবলে একখানা মাত্র লম্বা আঁকা বাঁকা রাস্তা সমুদ্রের দিকে চলে গিয়েছিল। সেই রাস্তার দুইধারে সারি সারি ছোটো ছোটো দোতলা বাড়ি, অনেক গুলিই বসত বাড়ি। আবার কতকগুলিতে দোকান ছিল। এই রাস্তা থেকেই আরো অনেকগুলি ছোটো ছোটো রাস্তা বেড়িয়ে গেছে এদিক ওদিক, সবগুলোই হালে তৈরি। ঐ রাস্তাটির এক মাথায় গ্রাম, অপর মাথায় জলাভূমি। পোতাশ্রয়কে ঘিরে অসংখ্য সরু সরু গলি ছড়িয়ে আছে। নিউ-ক্যাসেলের খনিগুলি থেকে কয়লা আসত ব্রেকস্টেবলে, পোতাশ্রয় সবসময় সরগরম থাকত। একলা বেরুবার মতো বয়স যখন আমার হয়েছিল তখন আমি প্রায়ই সেখানে চলে যেতাম। ঘন্টার পর ঘন্টা ঘুরে বেড়াতাম। জারসি পরা রুক্ষ মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতাম, কয়লা উঠানো নামানো দেখতাম।

এই ব্রেকস্টেবলেই এডওয়ার্ড ড্রিফিলডের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। আমার বয়স তখন পনর, গরমের ছুটিতে সবে বাড়ি এসেছি। বাড়ি আসবার পরদিন সকালে তোয়ালে এবং স্নানের পোশাক কাঁধে চাপিয়ে সমুদ্রের দিকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আকাশ তখন মেঘ শূন্য। হাওয়াও বেশ গরম এবং পরিষ্কার। কিন্তু তা সত্বেও উত্তর সাগরের আবহাওয়ায় এমন একটা মধুর ছোঁয়াচ ছিল যে নিঃশ্বাস নিতেও মন আনন্দে ভরে উঠত। শীতকালে ব্রেকস্টেবলের বাসিন্দারা জনহীন পথ দিয়ে একরকম ছুটে ছুটে পথ চলত। সর্বাঙ্গ এমন করে ঢেকে রাখত যে পূবালি হাওয়ার কনকনে স্পর্শ লাগবার মতো দেহের খুব কম অংশ উন্মুক্ত রাখত। কিন্তু এখন তাদের গতি অতি ধীর মন্থর। ডিউক অব কেণ্ট এবং বিয়ার এণ্ড কি'র মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাটায় এসে দলে দলে ভিড় করে থাকত সবাই। পূর্বদেশীয় আঞ্চলিক ভাষায় গুনগুন শব্দ কানে আসবে আপনার। তাদের কথায় আঞ্চলিক টান বিশ্রী লাগবে শুনতে। কিন্তু পূর্ব পরিচয়ের স্মৃতি-বিজড়িত বলেই এখনো শুনতে বেশ লাগে আমার। বেশ সজীব তাদের গায়ের রঙ। নীলচোখ আর উঁচু চোয়ালের হাড়, মাথার চুল বেশ পাতলা। তাকাবার ভঙ্গি ও বেশ পরিষ্কার। সরল আবার তেমনি অভিনব। তাদের খুব বুদ্ধিমান বলে আমি মনে করি না; কিন্তু তারা ধূর্তামি জানত না। বেশ স্বাস্থ্যবান মনে হতো। যদিও দুপুরে খাওয়ার সময় যখন বাড়ি ফিরলাম, মাথার চুল তখনো শুকয়োনি। বেশ জাপটে ছিল মাথার চামড়ার সঙ্গে। আমি বললাম কিউরেটের সঙ্গে আমার

মাথায় খুব উঁচু লাগত না, তবু অনেকাংশে শক্তিমান এবং কর্মঠ মনে হতো দেখতে। ব্লেকস্টেবলে চাকাওয়ালা যানবাহন খুব কম ছিল সেকালে, এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে যারা জটলা করত তাদের ডাক্তারের ডগ-কার্ট অথবা রুটি-ওয়ালার পালকি-গাড়ির কাছে ছাড়া পথ ছেড়ে দাঁড়াতে হতো না কখনো। ব্যাঙ্কের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ম্যানেজারের খোঁজখবর নেবার জন্য ভেতরে ঢুকে পড়েছিলাম। তিনি আমার কাকার চার্চের ওয়ার্ডেন। তারপর বাইরে বেরিয়ে আসতেই কাকার কিউরেটের সঙ্গে দেখা। তিনি দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন। একজন অচেনা লোক ছিল তাঁর সঙ্গে। কিন্তু তিনি ঐ অপরিচিত ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন না। ছোটো-খাটো দেখতে ছিল লোকটি, মুখ ভর্তি দাড়ি, একটু চকমকে পোশাক ছিল তাঁর পরনে; উজ্জ্বল বাদামি রঙের নিকার বোকার সুট, বিচেসটা একটু বেশি রকম আঁট-সাট, পায়ের মোজা নেভি ব্লু রঙের, কালো জুতো আর মাথায় উঁচু টুপি। নিকার-বোকারের প্রচলন ছিল না সে যুগে, অন্তত ব্লেকস্টেবলে নয়। নেহাত ছেলেমানুষ এবং আনকোরা স্কুল থেকে এসেছি, তাই দেখেই লোকটিকে আমার ভীষণ বিশ্রী লাগল। কিন্তু আমি যখন কিউরেটের সঙ্গে কথা বলছিলাম তখন আমার দিকে বেশ স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল লোকটি। তার ফ্যাকাশে নীল চোখ দুটিতে একটা মিষ্টি হাসি ফুটে উঠেছিল। আমি বুঝতে পারলাম একটু সুযোগ দিলেই কথা বলতে শুরু করবে। তাই বেশ একটু গরম মেজাজের ভাব দেখালাম। গেমকিপারদের মতো নিকার-বোকার পরা এই বাজে লোকটির সঙ্গে কথা বলবার এতটুকু ঝুঁকি নিতেও ইচ্ছে হলো না আমার। লোকটির ঐ গায়-পরা খোশ-মেজাজী ভাব দেখে ভীষণ বিরক্ত বোধ করলাম। আমি নিজে কিন্তু নিখুঁত পোশাক পরেছিলাম। সাদা ফ্লানেলের ট্রাউজার, নীল রঙের ব্লেজার, বুক-পকেটে স্কুলের প্রতীক চিহ্ন আঁকা ছিল, মাথায় সাদা-কালা রঙের-স্ট্র-হ্যাট। কিউরেট বললেন এবার তিনি যাবেন। খুব সৌভাগ্য। কারণ, পথে কারো সঙ্গে দেখা হলে কোথায় কথার শেষ করব তাই আমি ভেবে পেতাম না এবং সুযোগের অপেক্ষায় থেকে অকারণ মুখচোরা স্বভাবের জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কষ্ট পেতাম। এও বললেন, বিকেলে একবার ভিকারেজে আসবেন। আমি যেন কাকাকে খবরটা দিয়ে রাখি। অপরিচিত লোকটি মাথা নোয়ালো এবং বিদায় নেবার সময় একটু মুচকে হাসল. কিন্তু আমি প্রস্তর-কঠিন দৃষ্টিতে তার জবাব দিলাম। ধরে নিলাম লোকটি নিশ্চয় গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে এসেছে আমরা ব্লেকস্টেবলের বাসিন্দারা কখনো এইসব আগন্তুকদের সঙ্গে মিশতাম না। লণ্ডনের লোকদের আমরা অসভ্য মনে করতাম।

প্রতি বৎসর এইসময় আজে বাজে লোকদের ভিড় ভারি বিশ্রী লাগত আমাদের। কিন্তু ব্যবসায়ীদের অবশ্য খারাপ লাগত না। এমন কি সেপ্টেম্বর মাস শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলত এবং ব্র্যাকস্টেবল আবার তার স্বাভাবিক শান্তিতে ফিরে যেত।

দুপুরে খাওয়ার সময় যখন বাড়ি ফিরলাম, চুল তখনো শুকোয়নি, বেশ জাপটে ছিল মাথার চামড়ার সঙ্গে। আমি বললাম কিউরেটের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি বিকেলে আসবেন আমাদের বাড়িতে এই খবরটা দিলাম।

—বেচারা মিসেস সেফার্ড কাল রাত্রে মারা গেছেন। আসবার কারণ বলতে গিয়ে কাকা মন্তব্য করলেন।

কিউরেটের নাম গলওয়ে। বেশ লম্বাটে রোগা এবং অতি সাদাসিধে মানুষ। মাথায় নোংরা কালো কালো চুল ছিল ওঁর। কেমন বোলাটে ছোট্ট মুখ। বোধহয় খুব বেশী বয়স ছিল না, কিন্তু আমার ওঁকে মধ্য-বয়সী বলে মনে হতো। বড্ড তাড়াতাড়ি কথা বলতেন এবং অত্যন্ত হাত পা নাড়তেন। এই জন্যই সবাই তাঁকে অদ্ভুত মনে করত এবং কাকাও বোধহয় তাঁকে ঠিক আমল দিতেন না, কিন্তু তিনি খুব কর্মঠ ছিলেন বলেই (কাকা নিজে অত্যন্ত আলসে) কাকা খুশী ছিলেন ওঁর উপর। দায়িত্বের বোঝা অনেকটা তিনি ঘাড় পেতে নিতেন। ভিকারেজে আসবার আসল উদ্দেশ্য শেষ করে মিঃ গলওয়ে কাকীমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ভেতরে এলেন। কাকীমা তাঁকে চা খেতে বললেন।

—আজকে সকালে আপনার সঙ্গে যে লোকটি ছিলেন তিনি কে? তিনি বসবার পর আমি বললাম।

—ও, উনি? এঁর নাম এডওয়ার্ড ড্রিফিলড। তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই নি। ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না কিজানি তোমার কাকা পছন্দ করবেন কিনা!

—পরিচয় না হওয়াই বোধহয় ভালো। কাকা বললেন।

—ব্লেকস্টেবলের লোক নয় বোধহয়, তাই না? আমি বললাম।

—এই পারিসের এলাকার ভেতরেই এঁর জন্ম, কাকা বললেন। এঁর বাবা ফার্নে-কোর্টের মিস উলফের অধীনে বেলিফের কাজ করত। তবে চ্যাপেলের সঙ্গে এদের পরিবারের সংশ্রব ছিল।

—ব্লেকস্টেবলের একটি মেয়েকে সে বিয়ে করেছে। মিঃ গলওয়ে বললেন।

—বিয়েটা ধর্ম মতে হয়েছিল নিশ্চয়? কাকীমা প্রশ্ন করলেন। এটা কি সত্যি নাকি যে মেয়েটি রেলওয়ে আর্মস হোটেলে বার-মেডের কাজ করত?

—মনে হয় এরকম একটা কিছু ছিল বোধ হয়। একটু মুচকি হেসে মিঃ

গলওয়ে বললেন।
—এরা বেশী দিন এখানে থাকবে কি ?
—হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়। কনগ্রিগেশানেল চ্যাপেল যে রাস্তায় সেই রাস্তার উপর একটা বাড়ি ওরা ভাড়া নিয়েছে। কিউরেট বললেন।
স সময় ব্রেকস্টেবলের পথ ঘাটের যদিও বা নামকরণ করা হয়েছিল, কিন্তু কেউ তা জানত না এবং ব্যবহারও করত না।
—লোকটি চার্চে আসবে তো ? কাকা প্রশ্ন করলেন।
—এ বিষয়ে কোনো কথা হয়নি এখনো। মিঃ গলওয়ে বললেন। তবে সে একজন শিক্ষিত লোক এটা ঠিক।
—আমার বিশ্বাস হয় না। কাকা বললেন।
—শুনেছি সে হেভারসাম স্কুলে পড়ত, অনেক পুরস্কার এবং জলপানি পেয়েছিল। ওরাধাম-এ পড়বার জন্য একটা জলপানি পেয়েছিল, কিন্তু সেদিকে না গিয়ে জাহাজের চাকরি নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।
—আমি শুনেছি সে নাকি একটা অতি বাজে লোক।
—কিন্তু নাবিকের মতো তো দেখতে মনে হয় না তাঁকে ? আমি মন্তব্য করলাম।
—জাহাজের কাজ অনেক দিন আগে ছেড়ে দিয়েছে। এরপর অনেক কিছু সে করেছে।
—সব কাজের কাজী, কিন্তু আসলে কিছু না, তাই না ? কাকা বললেন।
—শুনেছি সে এখন একজন লেখক।
—হয়তো এও বেশীদিন থাকবে না। কাকা বললেন।
কোনো লেখকের সঙ্গে আমার তখনো পরিচয় হয় নি, তাই আমার একটু কৌতূহল হলো।
—তিনি কী লেখেন ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।—বই ?
—তাই বোধ হয়। কিউরেট বললেন। এবং প্রবন্ধও লেখে। গত বসন্তকালে ওর একটা উপন্যাস বেরিয়েছে। আমাকে পড়তে দেবে বলেছে।
—আমি হলে এমনি অকারণ সময় নষ্ট করতাম না। কাকা বললেন। টাইমস' এবং 'গার্ডিয়ান' ছাড়া কিছুই তিনি পড়েন না।
—বইটার নাম কী। আমি জিজ্ঞাসা করলাম।
—আমায় বলেছিল, কিন্তু ভুলে গেছি।
—যাকগে তোমাকে জেনে কাজ নেই। কাকা বললেন। ঐসব বাজে উপন্যাস পড়ে সময় নষ্ট করতে হবে না তোমাকে। এই ছুটিতে কেবল খোলা

হাওয়ায় ঘুরে বেড়ানো দরকার তোমার। তারপর ছুটির কাজ আছে নিশ্চয় ?

তা ছিল। আইভান হো। আমার যখন দশ বছর বয়স তখনই আমি পড়ে ফেলেছি। আবার নতুন করে পড়া এবং সে সমন্ধে প্রবন্ধ লিখবার কথা ভাবতেও আমার মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠত।

পরবর্তী জীবনে এডওয়ার্ড ড্রিফিলড যে সাফল্য এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তার কথা যখন ভাবি তখন কাকার বাড়িতে তাঁর সমন্ধে কী ধরনের আলোচনা হতো সে কথা মনে করতেও আজকে না হেসে পারি না। এই তো কিছুদিন আগে ত'ার মৃত্যুর পর ওয়েস্ট মিনিস্টার এবিতে ত'াকে সমাধিস্থ করবার বিষয় নিয়ে যখন ত'ার ভক্তদের ভেতর একটা আলোড়ন উঠেছিল তখন ব্লেকস্টেবলের অধুনাতম ভিকার, দু দুবার অপসৃত, আমার কাকার উত্তরসূরী, ডেইলি মেল কাগজে লিখেছিলেন যে ড্রিফিলডের জন্ম ত'ারই এলাকায় এবং জীবনের সুদীর্ঘ সময় বিশেষ করে শেষ পঁচিশটি বছর, শুধু এ অঞ্চলেই কাটিয়ে যান নি, ত'ার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির অনেকগুলিতে এখানকার স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওতপ্রোত ভাবে। কাজেই এটা খুব স্বাভাবিক যে এখানকার মাটিতেই ত'ার নশ্বর দেহ আশ্রয় নেবে, যেখানে কেন্ট অঞ্চলের এম্-বৃক্ষের ছায়ায় শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন ত'ার পিতা এবং মাতা। ব্লেকস্টেবল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল যখন এবিতে সমাধিস্থ করবার প্রস্তাব ওয়েস্ট মিনিস্টারের ডিন সরাসরি অগ্রাহ্য করবার পর, মিসেস ড্রিফিলড সংবাদ পত্রে একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছিলেন, যে সরল মানুষদের তিনি জানতেন এবং যাদের তিনি ভালোবাসতেন তাদের মাঝে ত'াকে সমাধিস্থ করবার ব্যবস্থা করে স্বামীর মনের অতি প্রিয় আকাঙ্ক্ষাকেই তিনি পূর্ণ করেছেন। আমার সেই শৈশবের দিনগুলির পর ব্লেকস্টেবলের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা খুব বদলে না গিয়ে থাকলে কিছুতেই আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে মিসেস ড্রিফিলডের 'সরল মানুষ' এই মন্তব্যটা ত'ারা সহজে হজম করে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরে আমি যতটুকু শুনেছিলাম, দ্বিতীয় মিসেস ড্রিফিলডকে কোনদিন তারা সহজভাবে নিতে পারেনি।

চার

আমি অবাক হলাম। অলরয় কিয়ারের সঙ্গে লাঞ্চ খাবার দু তিন দিন পরই এডওয়ার্ড ড্রিফিলডের বিধবা স্ত্রীর কাছ থেকে একখানা চিঠি এল। চিঠিখানা এইরূপ :

প্রিয় বন্ধু,

শুনলাম গত হপ্তায় এডওয়ার্ড ড্রিফিলড সম্বন্ধে রয়-এর সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে আপনার এবং শুনে সুখী হলাম যে তাঁর সম্বন্ধে অনেক প্রশংসাসূচক কথা বলেছেন আপনি। তিনি অনেক সময় আমাকে আপনার কথা বলতেন! আপনার প্রতিভার প্রতি তাঁর অশেষ শ্রদ্ধা ছিল এবং সেবার যখন আমাদের এখানে লাঞ্চ খেতে এসেছিলেন তিনি ভীষণ খুশী হয়েছিলেন আপনাকে দেখে। জানিনা, তিনি আপনাকে যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন তার কোনোটা এখনও আপনার কাছে আছে কিনা এবং যদি থেকে থাকে কি জানি সেগুলোর নকল আমাকে দেবেন কিনা। দু-এক দিনের জন্য আমার এখানে থেকে যেতে আপনাকে রাজী করাতে পারলে সত্যি আমি অত্যন্ত খুশী হতাম। আমি এখানে খুবই নিরিবিলিতে আছি আজকাল এবং কেউ নেই এখন এখানে। কাজেই দয়া করে আপনার সুবিধে মতো যে কোনো একটা দিন করবেন।

আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আমি ভারি আনন্দিত হব এবং পুরনো দিনের অনেক কথা শুনবার সুযোগ পাব। এই বিশেষ একটা অনুগ্রহ আমি চাইছি আপনার কাছে। আমি বিশ্বাস করি আমার অতি প্রিয় মৃত স্বামীর জন্যও এ থেকে আপনি আমাকে বঞ্চিত করবেন না!

আপনার চির অনুগতা,
এমি ড্রিফিলড

আমি একবার মাত্র মিসেস ড্রিফিলডকে চাক্ষুষ দেখেছি এবং খুব বেশী আগ্রহ তিনি আমার মনে জাগাতে পারেননি। প্রিয় বন্ধু বলে সম্ভাষণ করাটা আমি মোটেই পছন্দ করি না। তাঁর নিমন্ত্রণকে অগ্রাহ্য করবার জন্য এইটুকুই হয়তো যথেষ্ট হতো, এবং ঐ আমন্ত্রণের বৈশিষ্ট্যহীনতা আমাকে অত্যন্ত বিরক্ত করেছিল যার জন্য একটা বিচিত্ররকম অজুহাত বার করলেও আমার না যাওয়ার কারণ খুবই স্পষ্ট ছিল। অর্থাৎ আমি যেতে চাই নি। ড্রিফিলডের কোনো চিঠিপত্র আমার কাছে ছিল না। বহু বছর আগে তিনি হয়তো মাঝে মাঝে লিখতেন, ছোটো ছোটো চিঠি, কিন্তু তখন তিনি ছিলেন একজন অতি অখ্যাত নগণ্য লেখক মাত্র এবং চিঠিপত্র রেখে দেওয়ার অভ্যাস থাকলেও তাঁরগুলো রেখে দেবার কথা মনেও আসতো না কখনও। কি করেই বা আমি সেদিন জানতাম যে এই নগণ্য লোকটিই একদিন আমাদের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলে বন্দিত হবে? আমি ইতস্তত করছিলাম এই জন্য যে

মিসেস ডিট্রিফিলড তাঁর জন্যে কিছু করতে অনুরোধ করেছিলেন আমাকে। কিছু করতে যাওয়াটা খুব বিসদৃশ হতো নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার পক্ষে যদি কিছু করা সম্ভব হতো তবে না-করাটাও ছোটোলোকমি হতো হয়তো, তাছাড়া তাঁর স্বামী সত্যি একজন বিশিষ্ট লোক ছিলেন।

সেদিনকার প্রথম ডাকে চিঠিটা এসেছিল। প্রাতরাশ সেরেই আমি রয়কে টেলিফোন করলাম। আমার নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারী রয়-এর সঙ্গে আমার যোগাযোগ করে দিল। যদি আমি গোয়েন্দা কাহিনী লিখতে বসতাম তবে আমার এই টেলিফোনের প্রতীক্ষায় যে কেউ উদগ্রীব হয়ে বসেছিল তক্ষুনি এই সন্দেহ হয়তো আমি করতাম এবং রয়-এর সতেজ উদগ্রীব কণ্ঠে হ্যালো ধ্বনিটা আমার সন্দেহকে প্রতিষ্ঠিত করত। এত সকালবেলা স্বভাবতই এতটা সতেজ এবং প্রফুল্লতা আশা করা যায় না কাউকে।

—আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিইনি বোধহয়? আমি বললাম।

—বলেন কি, মোটেই না। তার কণ্ঠের সজীব হাসির ধ্বনি টেলিফোনের তারে তরঙ্গের পর তরঙ্গে ভেসে এল। সেই কোন সাতটায় আমার ঘুম ভেঙে গেছে। এতক্ষণ পার্কে গিয়ে ঘোড়ায় চড়ছিলাম। এইমাত্র ব্রেকফাস্ট করতে যাচ্ছিলাম। আসুন না, দুজন একসঙ্গে খাওয়া যাবে।

—আপনার প্রতি আমার যথেষ্ট স্নেহ আছে সত্যি। আমি জবাব দিলাম। কিন্তু ব্রেকফাস্টের সঙ্গী হিসেবে মোটেই নয়। তাছাড়াও আমি সেরে ফেলেছি অনেকক্ষণ। সেকথা নয়। শুনুন, মিসেস ডিট্রিফিলডের কাছ থেকে এইমাত্র একখানা চিঠি পেলাম। তিনি আমাকে তাঁদের ওখানে ক'দিন থেকে আসতে নিমন্ত্রণ করেছেন।

—হ্যাঁ, আপনাকে লিখবেন বলে সেদিন আমাকে বলেছিলেন। 'আমরা' দুজনেই একসঙ্গে যেতে পারি। ও'র বাড়িতে সুন্দর টেনিস লন আছে। নিজেও খুব ভালো খেলেন। আমার মনে হয় আপনার খুব ভালো লাগবে।

—আমার কাছে তিনি কী চান বলুন তো?

—বাঃ, আমার ধারণা সে কথা তিনি নিজেই বলবেন আপনাকে।

রয়-এর কণ্ঠ একটু কোমল হয়ে এসেছিল, যেমনি বলে আমি কল্পনা করলাম যেন সে কোনো হবুপিতাকে বলতে যাচ্ছে তার স্ত্রী তার মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করছে। কিন্তু আমার ওপর কোনো প্রভাব পড়ল না।

—শুনুন রয়। আমি বললাম। শুধু মিষ্টি কথায় ভোলবার বয়স আমার চলে গেছে অনেকদিন। আসল কথাটা বলে ফেলুন।

টেলিফোনের অপরদিকে একটু ছেদ পড়ল আমি অনুভব করতে পারলাম। বুঝতে পারলাম আমার কথাটা রয়-এর ভালো লাগেনি।

—আপনি কি খুব ব্যস্ত থাকবেন আজকে সকালে ? হঠাৎ সে বলে উঠল আমি এসে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—বেশ, আসুন। একটা পর্যন্ত আমি বাড়িতে থাকব।

—ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি আসব।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে আবার পাইপ ধরলাম।

মিসেস ড্রিফিলডের চিঠিখানায় দ্বিতীয় বার চোখ বুলিয়ে নিলাম।

যে লাঞ্চ খাওয়ার কথা তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তার কথা বেশ স্পষ্ট মনে আছে আমার। সেবার টেরবানবারির কাছাকাছি কোনো একটা জায়গায়, বুদ্ধির প্রখরতা নেই এবং ব্যবহারেও বিশেষ কেতাদুরস্ত নয় এমনি এক খেলোয়াড় বেরনের সুচতুরা এবং রূপসী মার্কিন স্ত্রী এক লেডি হডমার্স-এর সঙ্গে সুদীর্ঘ উইক-এণ্ড ছুটি কাটাতে গিয়েছিলাম। হয়তো দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনের একঘেঁয়েমী দূর করবার জন্যে মাঝে মাঝে চারুশিল্পের সঙ্গে সংস্পর্শ আছে এমনি লোকদের নিমন্ত্রণে আপ্যায়ন করা তাঁর একটা অভ্যাস ছিল। তাঁর ঐসব পার্টিগুলি পাঁচমিশেলী এবং খুব আনন্দময় হতো। অভিজাত এবং ভদ্র সমাজের বিশিষ্ট সভ্যারা বিস্ময় ও অস্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই চিত্রকর লেখক এবং অভিনেতাদের সঙ্গে মিশতেন। যেসব লেখক অথবা চিত্রকরদের লেডি হডমার্স তাঁর আতিথেয়তায় আপ্যায়িত করতেন তাদের কারো একখানা বইও তিনি কখনও পড়তেন না অথবা একখানা ছবিও কোনোদিন দেখতেন না; কিন্তু এদের সাহচর্য তাঁর ভালো লাগত এবং শিল্পীদের সঙ্গে সংস্পর্শ আছে এই অনুভূতিটাই তিনি উপভোগ করতেন। সেই উপলক্ষে সেদিন আলাপ আলোচনার ভেতর প্রসঙ্গতঃ এডওয়ার্ড ড্রিফিলডের নাম উত্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই (ড্রিফিলড তাঁর একজন বিশিষ্ট প্রতিবেশী ছিলেন এবং এক সময় আমি তাঁকে জানতাম এও আমি তাঁকে বলছিলাম) তিনি প্রস্তাব করলেন যে আগামী সোমবার দিন, যখন প্রায় সবাই লণ্ডন ফিরে যাবে, ড্রিফিলডের বাড়িতে লাঞ্চ খেতে গেলে মন্দ হয় না। আমি একটু ইতস্ততঃ করেছিলাম, কারণ গত পঁয়ত্রিশ বৎসর ড্রিফিলডের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ নেই এবং তিনি আমাকে আদৌ চিনতে পারবেন অথবা আমার কথা স্মরণ করতে পারবেন এ বিশ্বাসও আমার ছিল না। আর যদিও বা পারেন (অবশ্য এ কথাটা নিজের মনে মনেই রেখেছিলাম) তাতে যে তিনি খুব খুশী হবেন এ বিশ্বাসও আমার ছিল না। কিন্তু সেদিন আর একটি তরুণ পিয়ার ছিল আমাদের দলে, এক লর্ড স্কোলিয়ন, সাহিত্যের দিকে বোধহয় একটু ঝোঁক ছিল ; এবং প্রকৃতি ও মানুষ কৃত সাধারণ নিয়ম হিসেবে দেশ শাসন অথবা আইন নিয়ে নাড়াচাড়া না করে গোয়েন্দা উপন্যাস রচনায় তিনি তাঁর সমস্ত

শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। ড্রিফিলডকে দেখবার তাঁর কৌতূহল ছিল অপরিমেয়, যে মুহূর্তে লেডি হডমার্স ঐ প্রস্তাব করেছিলেন সেই ক্ষণেই তিনি লাফিয়ে উঠেছিলেন। সেদিনকার পার্টির সেরা অতিথি ছিলেন একটি তরুণী ডাচেস। দেখা গেল ঐ বিশিষ্ট সাহিত্যিকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল এত গভীর যে লণ্ডনে আর একটি এনগেজমেণ্ট বাতিল করে দিতেও তাঁর আপত্তি ছিল না এবং সেই বিকেলের আগে রওনা হবার ইচ্ছে দেখা গেল না।

—তাহলে আমরা চারজন হচ্ছি। লেডি হডমার্স বললেন। আমার মনে হয় এর বেশি না হলে তাঁদের কোনো অসুবিধে হবে না বোধ হয়। আমি এক্ষুনি মিসেস ড্রিফিলডকে খবর পাঠাচ্ছি।

ড্রিফিলডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এই দলের সঙ্গে নিজেকে ভিড়িয়ে দেবার কথাটা কিছুতেই মনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারছিলাম না। তাই তাঁদের ঐ পরিকল্পনাকে ভণ্ডুল করে দেবার জন্য আমি একটু সচেষ্ট হলাম।

—ওঁকে কিন্তু ভীষণ উত্যক্ত করা হবে এতে। আমি বললাম। এরকম অপরিচিত লোকের একটি দলের এ জাতীয় হামলা কিছুতেই তিনি বরদাস্ত করতে পারবেন না। অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়েছেন তো।

—তার জন্যই তো, যদি দেখা করতেই হয়, এখনই করা উচিত। আর কত দিনই বা উনি বাঁচবেন বলুন। মিসেস ড্রিফিলড বলেন লোকজন গেলে নাকি উনি খুব খুশী হন। ডাক্তার আর পাদরী, এদের সঙ্গেই তো কেবল এঁদের দেখা হয়; এই একটু পরিবর্তন খারাপ লাগবে না বোধহয়। পছন্দ মতো লোক পেলে সঙ্গে নিয়ে যেতে মিসেস ড্রিফিলড অনেকবার আমাকে বলেছেন। অবশ্য তাঁকে একটু বেশী সতর্ক থাকতে হয়। শুধু মনের কৌতূহল মেটাবার জন্য অনেকেই অকারণ বিরক্ত করতে আসে। আবার অনেকেই তাঁকে লেখা পড়িয়ে শুনাতে চায়। গ্রামের ছেলেদের অত্যাচার তো আছেই। কিন্তু অপূর্ব মহিলা এই মিসেস ড্রিফিলড! যাদের তিনি অবাঞ্ছিত মনে করেন, অতি নিপুণভাবে তিনি তাদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন। অর্থাৎ এক কথায় সবাইকে দেখা করতে দিলে বৃদ্ধকে আর খুঁজেই পাওয়া যেত না হয়তো। তবে আমাদের কথা অবশ্যি আলাদা।

নিজেকে আমি তাই মনে করতাম, কিন্তু যখন ওঁদের দিকে তাকালাম, লক্ষ্য করলাম ডাচেস এবং লর্ড স্কেলিয়নও নিজেদের তাই মনে করছেন। কাজেই আর কিছু না বলাই উচিত মনে করলাম।

একখানা ঝকঝকে হলুদ রঙের রোলস রয়েস গাড়িতে আমরা যাত্রা করলাম। ব্লেকস্টেবল থেকে ফার্নে কোর্ট দূরত্বে মাত্র তিন মাইল। বাড়িটা চূণ-বালির।

১৮৪০ সন নাগাদ তৈরী হয়েছিল মনে হলো, অতি সাধারণ এবং অতি সাদা সিধে, কিন্তু অত্যন্ত মজবুত। সামনে পেছনে একই রকম, দুইধারে দুইটা বিরাট লম্বা বাহু চলে গেছে মাঝখানকার চৌকো অংশটা থেকে, ওতেই বাড়ির সম্মুখের দরজা। দোতলাতেও ঠিক তেমনি একই রকম দুখানা বিরাট বাহু। একটা উঁচু মতন আলিসায় ছাতটা ঢাকা পড়েছে। প্রায় এক একর বাগান জমির মাঝখানে বাড়িটা, নানা রকম গাছ-গাছড়া চারদিক ঢেকে রয়েছে, কিন্তু সবগুলো গাছ বেশ পরিপাটি করে ছেটে দেওয়া আছে। ড্রয়িং রুমের জানালা দিয়ে বাইরে সবুজ বনানী ও দূরান্তের ঢালু জমির সুন্দর একখানা ছবি চোখে পড়ে! গ্রামাঞ্চলের একটি অতি সাধারণ বাড়িতে ড্রয়িং রুমের যতটুকু পরিপাট্য আশা করা যায় এ বাড়ির ড্রয়িংরুমখানাও ঠিক এমন করেই সাজানো গোছানো। আরাম কেদারাগুলো এবং বড়ো বড়ো সোফাগুলো তকতকে পরিষ্কার। ছোট্ট চিপেনডেল টেবিলের ওপর বিরাট ওরিয়েন্টাল ফুলদানিতে ফুল ভর্তি। ঘিয়া-রঙ দেওয়ালগুলোতে বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিককার বিখ্যাত শিল্পীদের জল রঙে আঁকা সুন্দর ছবি ঝুলছে। প্রচুর ফুল নিঁখুতভাবে সাজানো আছে। পিয়ানোটার ওপরে রূপালী ফ্রেমে বাঁধানো নামকরা অভিনেত্রী মৃত সাহিত্যিক এবং ছোটোখাটো রাজপুরুষের ছবিও দেখা যায়।

কাজেই একটুও আশ্চর্য হবার নয় যে ঘরে ঢুকেই ডাচেস চেঁচিয়ে উঠলেন, সত্যি কী চমৎকার ঘরখানা! এমনি একখানা ঘরেই একজন বিখ্যাত সাহিত্যিকের পক্ষে তাঁর জীবন সায়াহ্ন কাটিয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। মিসেস ড্রিফিলড অতি সাধারণ ভদ্রতার সঙ্গে আমাদের গ্রহণ করলেন। তাঁর বয়স প্রায় পয়তাল্লিশের মতন বলে মনে হলো, ছোটো মুখখানা এবং অতি চোখা চোখা মুখের আদল। একটা কালো রঙের টুপি সারা মাথা জুড়ে চেপে পরা ছিল, গ্রে রঙের স্কার্ট ও কোট পরেছিলেন। তাঁর দেহের গড়ন কিছুটা ছিপছিপে মতন, খুব লম্বাও নয় তেমন বেঁটেও নয়। তাঁকে বেশ ফিটফাট এবং কর্মক্ষম আর সপ্রতিভ বলেই মনে হলো। গ্রাম্য ভদ্রলোকের বিধবা কন্যা বলেও তাঁকে মনে করা যেত, যিনি গ্রাম্য সমাজ পরিচালনা করতেন এবং সংগঠণ করবার অদ্ভুত ক্ষমতাও যার ভেতর বর্তমান ছিল। তিনি একজন পাদরী এবং একজন ভদ্রমহিলার সংগে আমাদের সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমাদের ভেতরে আসবার সাথে সাথেই তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা দুজন ব্লেকস্টেবলের ভিকার ও তাঁর স্ত্রী। লেডি হডমার্স এবং ডাচেস তক্ষুনি এমন একটা অতি আপ্যায়িতভাব প্রকাশ করলেন যা নাকি একটু নিচু স্তরের লোকের সামনে অভিজাত সমাজের লোকেরা

দেখিয়ে থাকে, ভাবটা এমনি যেন শ্রেণীগতভাবে তাঁদের ভেতর একটা ব্যবধান আছে এটা তাঁদের নজরেই আসেনি কখনও।

এরপর এডওয়ার্ড ড্রিফিল্ড এই ঘরে এলেন। চিত্র পত্রিকায় অনেকবার আমি তাঁর ছবি দেখেছি। কিন্তু রক্ত মাংসে তাঁকে দেখে একটু নিরাশ হতে হলো আমাকে। তাঁকে আমার যতটুকু মনে আছে তার চেয়েও ছোটোখাটো লাগল সেদিন, আরও ভীষণ রোগা, মাথায় খুবই অল্প কয়েক গাছা রুপালী চুল, দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার করে কামানো, গায়ের চামড়ার রঙ অতি স্বচ্ছ লাগল। তাঁর নীল চোখদুটি একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চোখের পাতার ধারগুলো কেমন লাল। একজন বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ, বলেই মনে হলো তাঁকে, মৃত্যুর সঙ্গে যেন একটি অতি ক্ষীণ সূত্রে বাঁধা ; মুখে ধবধবে সাদা বাঁধানো দাঁত, তাঁর হাসিও যেন কেমন বিকৃত ও নীরস লাগছিল এই জন্য। দাড়ি ছাড়া আমি তাঁকে দেখিনি কখনো এবং সেসময় তাঁর ঠোঁট দুটি ছিল আরও সরু ও রঙ সজীব। অতি পরিপাটি করে তৈরী নীল সার্জের একখানা স্যুট তিনি পরেছিলেন। তাঁর নিচু কলারের ভেতর দিয়ে অতি শীর্ণ গলাটা বেশ চোখে পড়ছিল। একখানা মুক্তো দিয়ে আঁটা কালো টাই তিনি বেঁধেছিলেন। সুইজারল্যাণ্ডে গ্রীষ্মের অবকাশ কাটাতে গিয়েছেন প্রায় এমনি একজন ডিনের মতো লাগল তাঁকে।

তিনি ঘরে আসতেই মিসেস ড্রিফিল্ড তাঁর ওপর একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন এবং একটুখানি উৎসাহ সূচক হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠল। স্বামীর পোশাক পরিচ্ছদ ও পরিচ্ছন্ন বাহ্যিক আবরণ দেখে নিশ্চয় তিনি খুশি হয়েছেন। অতিথিদের সবার সঙ্গে ড্রিফিল্ড করমর্দন করলেন এবং সম্ভ্রম সূচক দু একটা কথাও বললেন সবাইকে। আমার কাছে যখন পৌঁছুলেন তিনি বললেন ঃ আপনার মতো এমন একজন ব্যস্ত কৃতীমান ব্যক্তির পক্ষে এই হতশ্রী বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এতদূর কষ্ট করে আসা সত্যি খুব আনন্দের কথা।

আমি একটুখানি ভড়কে গেলাম। কেননা তিনি এমনভাবে কথাটা বললেন যেন এর আগে আর কোনোদিন তিনি আমাকে দেখেন নি, আমার ভয় হলো, হয়তো আমার বন্ধুরা মনে করবেন যে ড্রিফিল্ডের সঙ্গে আমার একদিনকার ঘনিষ্ঠতার দাবিটা নেহাত আমার একটা মিথ্যে চাল। আমি ভাবতে লাগলাম হয়তো ড্রিফিল্ড একেবারেই ভুলে গেছেন আমাকে।

—আমি মনেই করতে পারছি না, সে আজ কতকাল আগে আপনার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল। গলায় একটুখানি আন্তরিকতার সুর আনবার চেষ্টা করে আমি কথাটা বললাম।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, মাত্র কয়েকটি সেকেণ্ডের বেশী নয় হয়তো কিন্তু আমার মনে হলো যেন কতক্ষণ তিনি তাকিয়ে আছেন এমনি করে; পরক্ষণেই আমি হঠাৎ চমকে উঠলাম, তিনি ভ্রূকুটি করলেন আমার দিকে। ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে আমি ছাড়া আর কেউ হয়তো টের পেল না, এবং ঐ স্বনামধণ্য পুরুষটির কাছ থেকে এটা এতই অপ্রত্যাশিত যে আমার নিজের চোখকেই যেন আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। আবার পরক্ষণেই তাঁর চোখে মুখে প্রশান্তি ফিরে এল, সেই প্রশান্তি বুদ্ধির দীপ্তিতে যেমনি ভাস্বর আবার তেমনি ধীরতায় স্বচ্ছ। লাঞ্চে বসবার ডাক এল। ডাইনিং রুমের দিকে আমরা সবাই চললাম দল বেঁধে।

এখানেও যা দেখলাম, সুরুচির পরাকাষ্ঠাই বলব তাকে। চিপেনডেল সাইড বোর্ডের ওপর রূপোর মোম-দানি। টেবিলের মাঝখানটায় একটা রূপোর বাটিতে গোলাপ ফুল সাজানো, সেটাকে ঘিরে রূপোর প্লেটে প্লেটে চকোলেট আর পিপারমেণ্ট ক্রীম। রূপোর নুনদানিগুলিও ঝকঝক করে পালিশ করা, এবং স্পষ্টতই সেগুলি জর্জিয়ান। ঘিয়া রঙের দেয়ালে স্যার পিটার লেলির আঁকা মেয়েদের ছবি ঝুলছে, চিমনির ওপর একটা নীল মাটির পুতুল। ধূসর বর্ণের ইউনিফর্ম পরা দুজন চাকরানী পরিবেশন করছিল এবং মিসেস ড্রিফিলড তাঁর অবিশ্রান্ত বাক্য-স্রোতের ভেতরও নজর রেখেছিলেন সেদিকে। আমি অবাক হয়ে গেলাম এই মহিলা কেণ্ট অঞ্চলের এই মেয়েগুলিকে (ওদের গায়ের সজীব রঙ ও উঁচু চোয়ালের হাড় পরিচয় করিয়ে দিল যে এরা এতদঞ্চলেরই মেয়ে) কেমন করে নৈপুণ্যের এতটা উঁচু পর্দায় এনে তুলেছিলেন। লাঞ্চের ব্যবস্থাও বেশ সময়োপযোগী হয়েছিল, বেশ বাছা বাছা অথচ খুব শোভন চটকদার নয়, সাদা সচেজ দিয়ে মোড়া মাংসের রোল, মুরগির রোস্ট, সঙ্গে নতুন তাল্ও কাঁচা মটরশুটি, সাধারণ সবজি আর গুজবেরী। এমনি একটা ডাইনিং রুম, খাবারের ব্যবস্থা এবং আদব কায়দা স্বল্পবিত্ত ও সুবিখ্যাত একজন সাহিত্যিকের পক্ষেই যে উপযুক্ত বুঝতে কষ্ট হবে না একটুও।

মিসেস ড্রিফিলড অধিকাংশ লেখক পত্নীদের মতোই বেশ আলাপী মহিলা ছিলেন। টেবিলে তাঁর দিকটার কথা বন্ধ হতে দিতেন না কখনও, কাজেই টেবিলের অপরদিকে তাঁর স্বামীর মুখের কথা শুনবার যত আগ্রহ আমাদের থাকুক না কেন সে সুযোগ আর পেলাম না আমরা। তিনি যেমনি আমুদে আবার তেমনি সজীবতায় উজ্জ্বল। যদিও এডওয়ার্ড ড্রিফিলডের ভগ্নস্বাস্থ্য এবং অতি বার্দ্ধক্যের জন্য বছরের বেশী সময় গ্রামেই থাকতে হতো, তবু মাঝে মাঝে ছুটে গিয়ে শহরের সব হালচাল জেনে আসবার সুযোগ তিনি করে

নিতেন। এরই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই লর্ড স্কেলিয়নের সঙ্গে লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটক এবং রয়াল আকাডেমির অকথ্য ভিড় সম্বন্ধে নিবিষ্ট আলোচনায় তিনি মশগুল হয়ে পড়লেন। সবগুলো ছবি দেখে আসতে মাত্র বার দুই তাঁকে যেতে হয়েছিল, তা সত্ত্বেও জলরঙ ছবিগুলি দেখবার সময় তিনি করে উঠতে পারেননি। জলরঙ ছবি তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন, ওগুলি তাঁর কাছে স্বাভাবিক এবং সরল মনে হতো। অস্বাভাবিকতা ও কপটতা তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না।

গৃহস্বামী এবং গৃহকর্ত্রীকে টেবিলের দুই প্রান্তে বসবার রীতি বলেই লর্ড স্কেলিয়ানের পাশে ভিকার বসলেন, তাঁর স্ত্রী বসলেন ডাচেসের পাশে। ডাচেস ভিকার-পত্নীর সঙ্গে শ্রমিকদের বাসস্থান বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেন. পাদরী-ঘরনীর চেয়ে তাঁকেই একটু বেশী তৎপর মনে হলো এ বিষয় সম্বন্ধে নিজেকে এসব থেকে মুক্ত রাখবার সুযোগ পেয়ে এডওয়ার্ড ড্রিফিলডকেই আমি বিশেষ করে লক্ষ্য করতে লাগলাম। তিনি লেডি হডমার্স-এর সঙ্গে কথা বলছিলেন। কেমন করে উপন্যাস লিখতে হয়, মনে হলো, তাই বুঝি লেডি হডমার্স বলছিলেন তাঁকে এবং কোন কোন বই তাঁর পড়া উচিত তারও বুঝি একটা ফিরিস্তি দিচ্ছিলেন। মনে হলো সসম্ভ্রমে আগ্রহ নিয়ে তিনি কথাগুলি শুনছিলেন। মাঝে মাঝে দু'একটা মন্তব্যও করছিলেন হয়তো, এত ক্ষীণ কণ্ঠে যে আমি শুনতে পাচ্ছিলাম না, লেডি হডমার্স যখন দু'একটা ঠাট্টা তামাসা করছিলেন (মাঝে মাঝেই তিনি করছিলেন দু'একটা বেশ ভালো লাগছিল) ড্রিফিলড খিল খিল করে হেসে উঠছিলেন এবং এমন দৃষ্টি তিনি মহিলাটির দিকে নিক্ষেপ করছিলেন যেন তাঁর সেই দৃষ্টি বলছিল : মহিলাটি তাহলে সত্যি নিরেট নয়। বিগত দিনের কথা স্মরণ করে আমার মনে কৌতূহল জাগছিল, না জানি কী তিনি ভাবছিলেন এদের এই সংসর্গ, তাঁর অতি পরিচ্ছন্ন ও কেতাদুরস্ত স্ত্রী আর তাঁর গৃহের সৌখিন পরিবেশ সম্বন্ধে। আমি ভাবছিলাম তাঁর প্রথম জীবনের উশৃঙ্খলতা কি তবে অনুশোচনা জাগিয়েছিল তাঁর মনে ? ভাবছিলাম এসব কিছু কি বিন্দুমাত্র আনন্দ দিচ্ছিল তাঁকে, নাকি তাঁর চরিত্রের নিরঙ্কুশ অমায়িকতা শুধু আড়াল করে রেখেছিল মনের একটা কুৎসিত ক্লান্তিকে। হয়তো তাঁর দিকে আমি তাকিয়ে আছি এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কেননা তিনিও মুখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। কিছুক্ষণের জন্য তাঁর ঐ দৃষ্টি তন্ময় হয়ে নিবদ্ধ হয়ে রইল আমার ওপর, সে দৃষ্টি অতি কোমল আবার তেমনি বিশ্লেষণী। তারপর আবার হঠাৎ, এবার আমি নিশ্চিত ভুল করিনি, একটা ভ্রুকুটি করলেন আমার দিকে। তাঁর বয়োঃজীর্ণ শুকনো মুখখানার ওপর ভেসে ওঠা

হালকা ভাবটা হঠাৎ যেন কেমন চমক লাগিয়ে দিল, শুধু তাই নয়। একটু যেন অপ্রস্তুত করে তুলল আমাকে। বুঝতে পারলাম না কী করব। আমার ঠোঁটের ওপর একটা দুর্বোধ্য হাসির রেখা ফুটে উঠল।

কিন্তু ডাচেস টেবিলের অপর প্রান্তের আলোচনায় ব্যস্ত থাকায় ভিকার-পত্নী আমার দিকে মনোযোগ দিলেন।

—বহুদিন থেকে এ'কে আপনি চেনেন, তাই না? একটু নিচু গলায় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন।

উপস্থিত আর সবার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলেন, আর কেউ নজর দিচ্ছে না আমাদের দিকে।

—ত'ার স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছা পুরনো দিনের এমন কোনো কথা আপনি উত্থাপন না করেন যাতে ত'ার মনে কষ্ট হয়। দেখছেন তো, ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছেন। একটুতেই চঞ্চল হয়ে পড়েন।

—আমি সাবধান থাকব।

—যেভাবে মিসেস ড্রিফিলড ত'াকে সামলে রাখছেন সেটা সত্যি খুব বিস্ময়কব ত'ার এই অদ্ভুত একাগ্রতা আমাদের শিখবার বিষয়। তিনি অনুভব করেন এ দায়িত্ব তাঁর কাছে কত বড়ো অমূল্য সম্পদ। তাঁর নিঃস্বার্থপরতা অপ্রকাশনীয়। গলাটা আরো একটু নিচু করলেন। অবশ্য ড্রিফিলড খুবই বুড়ো হয়েছেন, এবং বুড়ো মানুষ অনেক সময় ভারি অসহনীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু মিসেস ড্রিফিলডকে আমি ধৈর্য হারাতে দেখিনি কখনো। স্বামীর মতো তিনিও অপূর্ব বিস্ময়।

এগুলো এমনি সব কথা যার উত্তর দেওয়া সত্যি খুব কঠিন, কিন্তু আমার মনে হলো আমার কাছ থেকে যেকোনো একটা উত্তরের প্রত্যাশা আছে যেন কথাগুলিতে।

—সবদিক থেকে বিবেচনা করলে, আমার কিন্তু মনে হয় তিনি খুব ভালো আছেন। আমি বললাম।

—স্ত্রীর কাছেই তিনি এজন্য ঋণী।

লাঞ্চ খাওয়া শেষ হওয়ার পর আমরা সবাই আবার ড্রয়িং রুমে ফিরে এলাম এবং আমরা দু তিন মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবার পর এডওয়ার্ড ড্রিফিলড আমার কাছে এলেন। আমি ভিকারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম এবং আর কিছু বলবার ছিল না বলে বাইরের দৃশ্যটাকেই প্রশংসা করছিলাম। আমি গৃহকর্তার দিকে ফিরে তাকালাম।

—আমি এক্ষুনি বলছিলাম, দূরে ঐ নিচে সারিবদ্ধ কুটিরগুলি দেখতে কী অপূর্ব সুন্দর।

—হ্যাঁ, এখান থেকে দেখলে। ড্রিফিলড ঐ বিক্ষিপ্ত সারিবদ্ধ কুটিরগুলির দিকে তাকালেন। একটা পরিহাসের ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল তাঁর ঠোঁটের কোণে। ঐগুলির একটাতেই আমি জন্মেছিলাম। খুব অবাক লাগে, কী বলেন ?

কিন্তু মিসেস ড্রিফিলড যেন উদ্ভাসিত বিনয়ের ভাব নিয়ে ছুটে এলেন, আমাদের কাছে। তাঁর কণ্ঠ যেমনি চঞ্চল তেমনি সঙ্গীত-মধুর।

—এডওয়ার্ড, ডাচেস তোমার লেখবার ঘরটা দেখতে চাইবেন নিশ্চয়। এক্ষুনি আবার ওঁকে ফিরতে হবে।

সত্যি, আমি খুব দুঃখিত। টেরকানবারিতে তিনটে আঠাবো মিনিটের ট্রেনটা আমাকে ধরতেই হবে। ডাচেস বললেন।

আমরা সবাই চললাম ড্রিফিলডের পড়ার ঘরের দিকে। বাড়ির অপর প্রান্তে একখানা বিরাট ঘর থেকে বাইরের যে দৃশ্যটা চোখে পড়ে সেই একই দৃশ্য দেখা যায় এই ঘর থেকেও। লেখক স্বামীর স্বাচ্ছান্দ্যের জন্য নিষ্ঠাবান স্ত্রীর হাতের স্পর্শে সজীব ঘরখানি। অদ্ভুত পরিচ্ছন্ন ঘরটা এবং বড়ো বড়ো পাত্রে সাজান ফুলগুলি নারী স্পর্শের স্বাক্ষর দিচ্ছে।

—এই টেবিলটিতে বসেই শেষ জীবনের সবগুলো বই লিখেছেন। টেবিলের ওপর উপুড় করে খোলা একখানা বই বন্ধ করতে করতে মিসেস ড্রিফিলড বললেন। ডিল্যুক্স এডিসনের তৃতীয় খণ্ডের মুখবন্ধ এই বইখানা।

টেবিলটাকে সবাই আমরা প্রশংসা করলাম। এবং লেডি হডমার্স যখন বুঝতে পারলেন কেউ দেখছে না, টেবিলের ধারটা হাত দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলেন আসল জিনিস কিনা। মিসেস ড্রিফিলড হাসলেন আমাদের দিকে তাকিয়ে।

—ওঁর বইয়ের একখানা পাণ্ডুলিপি দেখবেন ?

—নিশ্চয়, খুব খুশী হব তাহলে। ডাচেস বললেন। আর তারপর আমি দে ছুট্। নীল মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো একখণ্ড পাণ্ডুলিপি বই মিসেস ড্রিফিলড সেলফ থেকে নামিয়ে আনলেন। যখন দলের সবাই অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে দেখছিলেন সেই ফাঁকে ঘরের ভেতর রাখা সারি সারি বইগুলো আমি এক নজরে দেখে নিলাম। লেখকরা যেরকম করে থাকেন, আমিও সেরকম এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে দেখলাম আমার কোনো বই আছে কিনা, কিন্তু এক খানাও পেলাম না ; তবে অলরয় কিয়ারের বইগুলি একপ্রস্থ আছে দেখলাম। অনেকগুলো উপন্যাসের বহিরাবরণ তখনও যেন চকচকে, তখনও অপঠিত বেশ স্পষ্ট সন্দেহ হয়। আমি আন্দাজ করলাম হয়তো এগুলি সেইসব লেখকের বই যারা গুরুর প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ বইগুলো উপহার দিয়েছিল,

হয়তো আশা করেছিল দু-এক ছত্র প্রশংসার বাণী পাবে তাঁর কাছ থেকে, প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে কাজে লাগবে। কিন্তু বইগুলো এত সুন্দর ভাবে গোছানো ছিল, ও এত পরিচ্ছন্ন ছিল যে, বইগুলো খুব কমই পড়া হয়েছে বলে ধারণা না করে আমি পারলাম না। একখানি অক্সফোর্ড ডিকসনারি দেখলাম। সুন্দর বাঁধানো ক্লাসিকসও ছিল। যেমন ফিলডিং, বসওয়েল হেজলিট ইত্যাদি এমনি আরো, তারপর সমুদ্র সমন্ধেও অনেকগুলো বই ছিল নৌ-বিভাগ থেকে প্রকাশিত নানা রঙের বিরাট বিরাট নাবিকদের প্রতি নির্দেশনা পুস্তকগুলিও চিনতে পারলাম। তারপর বাগান করা সমন্ধেও কতকগুলো বই আছে দেখলাম। ঘরখানাকে কোনো লেখকের কারখানা-গৃহ বলে মনে হলো না। কোনো স্বনামধন্য পুরুষের স্মৃতি-মন্দির বলে মনে হল আমার কাছে এবং কোনো উদ্দেশ্যহীন আগন্তুকের শ্লথছন্দ পায়ের ধ্বনি যেন আপনার কানে বাজবে। মানুষের পদচিহ্ন পড়ে না এমন কোনো রুদ্ধদ্বার যাদুঘরের সোঁদা গন্ধ আপনি টের পাবেন। আমার মনে একটা সন্দেহ উঁকিঝুকি দিত যে হয়তো ড্রিফিলড আজকাল 'গার্ডেনার্স ক্রনিকল' অথবা 'শিপিং গ্যাজেট' ছাড়া আর কিছুই পড়েন না। ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের উপর তারই একটা বাণ্ডিল আমার চোখে পড়ল।

মহিলারা যখন তাঁদের দ্রষ্টব্য সব কিছু দেখা শেষ করলেন তখন আমরা গৃহকর্তা আর গৃহকর্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। কিন্তু লেডি হডমার্স অশেষ বুদ্ধিসম্পন্না মহিলা ছিলেন। এটা নিশ্চয় তাঁর চোখে পড়েছিল যে যাকে উপলক্ষ্য করে এই পার্টির আয়োজন আমার সঙ্গে সেই এডওয়ার্ড ড্রিফিলডের কথা হয়েছে কদাচিত দু একটি। কারণ দোর গড়ায় এসে একটা প্রীতিপূর্ণ মিষ্টি হাসিতে আমাকে ছাপিয়ে দিয়ে ড্রিফিলডকে তিনি বললেন

বহুকাল আগে থেকেই আপনি এবং মিঃ এসেনডেন সুপরিচিত শুনে আমি খুবই আগ্রহান্বিত হয়েছিলাম। আপনি ভীষণ ভালো ছেলে ছিলেন বোধহয়, তাই না?

ড্রিফিলড তাঁর সেই অতি পরিচিত শ্লেষ-কটাক্ষ নিয়ে মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকালেন। আমার ধারণা হলো কেউ সেই সময় কাছে না থাকলে হয়তো জিব বার করে ভেংচি কাটতেন আমাকে।

—ভীষণ লাজুক। তিনি উত্তর দিলেন। আমি সাইকেল চড়াতে শিখিয়েছিলাম।

আমরা আবার সেই হলুদ রঙের রোলস্ রয়েস গাড়িতে চড়ে বসলাম। গাড়ি ছুটল।

—সত্যি কী মিষ্টি উনি! ডাচেস বললেন। আমরা গিয়েছিলাম বলে খুব ভালো লাগছে।

—ও'র ব্যবহার কত সুন্দর, তাই না? লেডি হডমার্স বললেন।

—ছুরি দিয়ে মটর শুঁটি কেটে খাওয়ার মতো উন্নাসিক নিশ্চয়ই নন তিনি!' আমি বললাম।

—হলেই বোধহয় ভালো হতো। স্কেলিয়ন বলল। কী অদ্ভুত সুন্দর লাগত দেখতে।

—কাজটা কিন্তু খুব কঠিন, ডাচেস বললেন। অনেকবার চেষ্টা দেখেছি, কখনও পারিনি।

—কাটা যায় না, বিঁধতে হয়। স্কেলিয়ন বলল।

—মোটেই না, ডাচেস জবাব দিলেন। সমতল ক্ষেত্রের উপর সোজা করে দাঁড় করাতে হয়, কিন্তু কিছুতেই থাকে না, গড়িয়ে যায়।

—মিসেস ড্রিফিলডকে আপনার কেমন লাগল? লেডি হড্‌মার্স প্রশ্ন করলেন।

—বেচারা, অত্যন্ত বুড়ো হয়ে গেছেন, কাউকে না কাউকে ও'কে দেখবার জন্য চাই-ই। জানেন বোধহয় মিসেস ড্রিফিলড হাসপাতালের নার্স ছিলেন।

—তাই নাকি? ডাচেস বললেন। আমি ভেবেছিলাম ও'র সেক্রেটারী, টাইপিস্ট বা অমনি একটা কিছু ছিলেন বোধহয়।

—খুব ভালো মেয়ে। প্রিয় বান্ধবীর পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে লেডি হডমার্স বললেন।

—নিশ্চয়।

—বছর কুড়ি আগে একবার ড্রিফিলড ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, ইনি তখন তাঁর নার্স ছিলেন। তারপর সেরে উঠবার পর এ'কেই বিয়ে করলেন।

—সত্যি, পুরুষ মানুষ কী অদ্ভুত, দেখুন! মিসেস ড্রিফিলড নিশ্চয় বয়সে অনেক বছরের ছোটো ছিলেন তাঁর চেয়ে। মিসেস ড্রিফিলডের বয়স এখন কত? এই চল্লিশ বা পয়তাল্লিশ?

—না, তা মনে হয় না। সাতচল্লিশ বলতে পারেন। শুনেছি স্বামীর জন্য অনেক কিছু করেছেন। মানে, মানুষের পাতে দেবার উপযুক্ত করেছেন। অলরয় কিয়ারের কাছে শুনেছি এর আগে ড্রিফিলড নাকি একটা ভবঘুরের মতো ছিলেন।

—সাধারনত লেখক পত্নীরা একটু অদ্ভুত হন।

—এরকম স্বামী নিয়ে ঘর করা একটা শাস্তি নয় কি?

—মারাত্মক। আমার বিশ্বাস নিজেরা বুঝতে পারেন না।

—হতভাগ্যের দল! তারা অনেক সময় ঠকে এই ভেবে যে মানুষ তাদের প্রীতির

চোখে দেখে, তাদের ভালো লাগে। আপন মনে বিড় বিড় করে আমি বললাম।

আমরা টেরকানবারিতে এসে পৌঁছলাম। ডাচেসকে স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে নিজেদের পথে যাত্রা করলাম।

পাঁচ

এড্ওয়ার্ড ড্রিফিলড আমাকে সাইকেল চড়তে শিখিয়েছিলেন, কথাটা সত্যি। বাস্তবিক এই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। সাইকেল পদযন্ত্রযানটি কবে আবিস্কৃত হয়েছিল জানিনা। তবে এটা জানি যে, আমি যেখানে মানুষ হয়েছিলাম কেন্টের সেই সুদূর অঞ্চলে তখনও এ পদার্থটি চালু হয়নি এবং দুচাকার উপর ভর দিয়ে কাউকে ছুটে যেতে দেখলেই আপনি ঘাড় ফিরিয়ে দেখতেন। দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে থাকতেন। মাঝ বয়সী ভদ্রলোকদের কাছে তখনও এটা ছিল বেশ মজার জিনিস, আর তাঁরা বলতেন টাট্টু ঘোড়া অনেক ভালো এর চেয়ে। বৃদ্ধা মহিলাদের কাছে ছিল ভীষণ ত্রাসের বস্তু। আসতে দেখলেই ছুটে পালাতেন পথ ছেড়ে দিয়ে। কোনো ছেলেকে সাইকেল চড়ে ইস্কুল আসতে দেখলে অনেকদিন আমার হিংসে হতো। সাইকেলের হাতল না ধরে ইস্কুলের ফটক পেরিয়ে আসার ভেতর নিজের বাহাদুরী জাহির করবার যেন সুযোগ দেখতে পেতাম। গ্রীষ্মের ছুটির গোড়ার দিকটায় আমাকে একটা কিনে দেবার জন্য অনেক বলে কয়ে কাকাকে রাজী করিয়ে ছিলাম, যদিও কাকীমা এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কেননা, তাঁর ধারণা ছিল সাইকেল চড়ে আমি হাত-পা ভেঙে মরব, তবু আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে স্বেচ্ছায় কাকা সম্মত হয়েছিলেন। কারণ আমার নিজের টাকা দিয়েই কিনতে বলেছিলাম। ইস্কুল ছুটি হবার আগেই আমি অর্ডার দিলাম এবং কয়েক দিনের ভেতরই টেরকানবারি থেকে সাইকেল এসে হাজির হলো।

নিজে নিজেই চড়তে শিখব বলে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। ইস্কুলের ছেলেরা আমাকে বলেছিল মাত্র আধা ঘণ্টার চেষ্টাতেই নাকি তারা শিখেছিল। বার বার অনেকবার আমি চেষ্টা করলাম এবং শেষপর্যন্ত বুঝতে পারলাম আমি একটি আস্ত গর্দভ (এখন অবশ্যি বলব তখন একটু বেশী বাড়িয়ে ভেবেছিলাম), কিন্তু আমাদের মালীর কাছে সাহায্য নিয়ে নিজের আত্মাভিমানকে খর্ব করে একটা দিন চেষ্টা করবার পরও মনে হলো নিজের চেষ্টায় যতটুকু করেছিলাম তার চেয়ে একটুও বেশী এগোয়নি। পরদিন, ভিকারেজের রাস্তা একটু আঁকা বাঁকা বলে অসুবিধে ভেবে সাইকেলটাকে কাছাকাছি একটা

রাস্তায় নিয়ে গেলাম, ঐ রাস্তাটা বেশ সোজা এবং সরল বলেই আমি জানতাম এবং এতই নির্জন যে আমার মুর্খামী নজরে পড়বে না কারো। আমি অনেকবার চাপতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু প্রতিবারই পড়ে গেলাম। পেডেলের সঙ্গে পায়ের নলি কবারই ঘা খেল। আমিও খুব উত্ত্যক্ত এবং বিরক্ত হয়ে উঠলাম। পুরো একটি ঘণ্টা এমনিভাবে কাটাবার পর, ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় আমি সাইকেল শিখি, এই কথাটা ততক্ষণ ভাবতে শুরু করলেও যেমন করে হোক শিখবার জেদ আমাকে পেয়ে বসেছিল (কেননা কাকা অথবা ব্রেকস্টে-বলের অন্যান্য সবার বিদ্রূপ কটাক্ষ সহ্য করা কঠিন হতো আমার পক্ষে), দু'জন লোককে সাইকেল চড়ে এই নির্জন রাস্তা ধরে আসতে দেখে ভীষণ বিরক্তিতে আমার মন ভরে উঠল। তৎক্ষণাৎ আমার সাইকেলটাকে রাস্তার এক পাশে নিয়ে গেলাম। একটা পাথরের ওপর বসে উদাস দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলাম। যেন সাইকেল চড়তে এসে একটু সময় বিশ্রাম নিয়ে বিরাট সমুদ্রের সীমাহীন জলের দিকে তাকিয়ে আমি সব ভুলে বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম। ঐ আগন্তুক দু'জন, যারা আমার দিকেই এগিয়ে আসছিল, তাদের থেকে আমার দৃষ্টি সরিয়ে রাখলাম, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম তারা এগিয়ে এসেছে আমার কাছে। আড়চোখে দেখলাম তাদের একজন পুরুষ আর অপরটি একজন মহিলা। আমাকে কাটিয়ে গিয়েই হঠাৎ মহিলাটি আমার দিককার রাস্তাটায় মোড় ঘুরে গেল এবং আমার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

—অত্যন্ত দুঃখিত, মেয়েটি বলল। আমি জানতাম তোমাকে দেখেই আমি পড়ে যাব।

সেই পরিস্থিতিতে আমার নিস্পৃহতার ভান রক্ষা করা একেবারেই কঠিন ছিল, তাই ভীষণ লজ্জায় রক্তিম হয়ে আমি বললাম, ও কিছু নয়।

মেয়েটি পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষটিও সাইকেল থেকে নেমে পড়েছিলেন।

—তোমার লাগেনি তো ? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

—না, লাগেনি।

আমি চিনতে পারলাম এড্ওয়ার্ড ড্রিফিল্ড, লেখক, কয়েকদিন আগে কিউরেটের সঙ্গে রাস্তায় যেতে দেখেছিলাম।

—আমি সবে শিখছি, তাঁর সঙ্গী বললেন।

—রাস্তার উপর কিছু দেখলেই আমি পড়ে যাই।

—তুমি ভিকারের ভাই-পো না ? ড্রিফিলড জিজ্ঞাসা করলেন। ঐ তো সেদিন তোমাকে দেখেছি। গলওয়ের কাছে তোমার পরিচয় পেয়েছি। ইনি আমার স্ত্রী।

মহিলাটি একটু অদ্ভুত রকম সপ্রতিভতার সঙ্গে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন, আমি হাত তুলে নিতেই বেশ একটু আন্তরিকতা দিয়ে আমার হাতে চাপ দিলেন। তাঁর ঠোঁটে এবং চোখের কোণে এক ফালি হাসি ফুটে উঠল। তাঁর ঐ হাসিতে এমন একটা কিছু ছিল যে আমার সেই বয়সেও বিশুদ্ধ করে ভালো লাগল। আমার সব কেমন গুলিয়ে গেল। যাদের আমি চিনি না তাদের সংস্পর্শে এলে আমি কেমন ভীষণ আত্মসচেতন হয়ে উঠতাম। তাই তাঁর চেহারার খুঁটি-নাটি কিছুই আমার চোখে পড়ল না। তিনি একজন রূপসী এবং চটুল মহিলা এই ধারনা শুধু আমার মনে রইল। জানিনা তখন আমি লক্ষ্য করেছিলাম কিনা, না কি পরে, শুধু মনে পড়েছিল যে সেদিন তিনি নীল সার্জের পুরো স্কার্ট, ফিকে লাল রঙের কড়া ইস্তিরি করা সার্ট এবং তেমনি কড়া কলার আর একটা স্ট্র-হ্যাট পরেছিলেন। তখনকার দিনে ওগুলিকে বোটার বলত, ওঁর মাথার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া সোনালী চুলে টুপিটা বেশ চেপে বসেছিল।

—সাইকেল চাপতে আমার ভা-রি ভালো লাগে, তোমার লাগে না? ঢিবিটার উপর হেলান দিয়ে রাখা আমার নতুন সাইকেলটার দিকে তাকিয়ে মহিলা বললেন। ভালো করে চালাতে জানা কী অদ্ভুত, না?

কথাটার ভেতর আমার নৈপুন্যের উপর একটুখানি প্রশংসার আরোপ আমি অনুভব করলাম।

–কিছু না। খালি একটু অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। আমি বললাম।

-আমার কিন্তু এই সবে তৃতীয়বার চেষ্টা, কিন্তু মিঃ ড্রিফিলড বলছেন আমি নাকি বেশ পারছি। আমার কিন্তু এত খারাপ লাগছে যে কী বলি। চাপতে তোমার কদিন লেগেছিল বলতো? আমার চুলের গোড়া পর্যন্ত রাঙিয়ে উঠল। লজ্জাকর কথাটা মুখ দিয়ে বার করতে পারছিলাম না।

-আমি সাইকেল চড়তে জানি না। আমি বললাম। এই সবে এটা কিনেছি, আর আজকেই আমার প্রথম চেষ্টা।

একটু গোপন করলাম, কিন্তু এই গোপনতার জন্য বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়েছিলাম, কেননা সত্যি তো কালকে বিকেল ছাড়া আর চাড়িনিতো!

-আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব, অবশ্য তোমার আপত্তি না থাকলে। ড্রিফিলড তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হালকাভাবে বললেন। এসো।

—না, না, থাক। আমি বললাম। এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

—কেন? ড্রিফিলডের স্ত্রী বললেন। তাঁর নীল চোখে তখনও তেমনি হাসি। মিঃ ড্রিফিলডের তো কোনো আপত্তি নেই, তাছাড়া আমিও একটু বিশ্রাম নিতে পারব।

ডিঁফিলড আমার সাইকেলটা ধরলেন। আমি তাঁদের এই বন্ধুত্বের অত্যাচারকে ঠেকাতে না পেরে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বে সাইকেল চড়তে চেষ্টা করলাম। আমি এদিক ওদিক দুলতে লাগলাম, কিন্তু তিনি শক্ত হাতে আমাকে ধরে রইলেন।

আরো জোরে চালাও। তিনি বললেন।

—আমি পেডেল করতে লাগলাম এবং আমার এদিক ওদিক করে চলার সংগে সংগে তিনিও ছুটতে লাগলেন। আমরা দুজনেই ভীষণ গরম হয়ে উঠেছিলাম, এবং তাঁর চেষ্টা সত্বেও অবশেষে আমি পড়ে গেলাম। এই রকম পরিস্থিতির ভেতর মিস উলফের বেলিফ্ফনয়ের কাছে ভিকার ভ্রাতুষ্পুত্রের আভিজাত্য বজায় রাখা সত্যি খুব কঠিন ছিল। আমি যখন আবার উঠে দাঁড়ালাম ও প্রায় বিশ-ত্রিশ গজ নিজে নিজেই চালাতে পারলাম, আনন্দের আতিশয্যে হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে মিসেস ডিঁফিলড রাস্তার মাঝ খানে দিয়ে ছুটতে ছুটতে চেঁচাতে লাগলেন, বাজি মাৎ বাজি মাৎ, তখন আমি খুশীতে এত হাসতে লাগলাম যে নিজের সামাজিক মর্যাদাব কথা বেমালুম ভুলে গেলাম। নিজের চেষ্টাতেই আমি সাইকেল থেকে নামতে পারলাম। আমার চোখে মুখে অবশ্যি একটা জয়ের উত্তেজনা ফুটে উঠেছিল এবং এক দিনের চেষ্টাতেই সফলকাম হওয়ার জন্য একটুও বিব্রত বোধ না করে ডিঁফিলডদের কাছ থেকে অভিনন্দন আমি গ্রহণ করলাম।

—দেখি আমিও নিজে নিজে পারি কি না। মিসেস ডিঁফিলড বললেন। আমিও আবার পথের ধারে ঢিবিটার ওপর বসলাম এবং তাঁর স্বামী আর আমি তাঁর ব্যথ চেষ্টা দেখতে লাগলাম।

নিরাশ হলেও তখনও তিনি বেশ প্রফুল্ল। একটু বিশ্রাম নেবার জন্য আমার পাশে এসে বসলেন। ড্রিফিলড তাঁর পাইপ ধরালেন। আমরা গল্প-গুজব করতে লাগলাম। তখন অবশ্যি আমি উপলব্ধি করতে পারি নি, কিন্তু এখন আমি বুঝতে পারছি যে মিসেস ড্রিফিলডের স্বভাবে এমন একটা প্রাণখোলা ভাব ছিল যা তাঁর সংস্পর্শে এলেই সহজ হবার সুযোগ দিত। বেশ আগ্রহ নিয়ে তিনি কথা বলতেন, জীবনের আনন্দে ভরপুব শিশুর উচ্ছ্বাসের মতো, তাঁর চোখ-দুটি সব সময় ঠোঁটের গায় মাখা মনভোলানো হাসির জ্যোতিতে চিক চিক করত। জানিনা কেন ঐ হাসিটা আমার ভালো লাগত। চোখ ধূর্তামিতে ভরা থাকত। কিন্তু এত সরল যে ধূর্তামি বলব না একে।

সেই সময় হাত-ঘড়ি দেখে ড্রিফিলড খাবার কথা বললেন, এবং সবাই মিলে সাইকেল চড়ে ফিরবার প্রস্তাব করলেন। ঠিক এইসময় কাকা ও কাকীমার

বেড়িয়ে ফিরবার কথা। কাজেই যাঁদের সংস্পর্শ তাঁরা সমর্থন করেন না এমনি লোকের সঙ্গে তাঁদের সামনে ধরা পড়বার ঝুঁকি নেবার ইচ্ছা আমার ছিল না। তাই তাঁদের আগে যেতে বললাম, কেননা আমার চেয়ে তাঁরা জোরে চালাবেন। মিসেস ড্রিফিলড রাজী হলেন না, কিন্তু মিঃ ড্রিফিলড বেশ একটু মজা এবং আমুদে দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, আমার অজুহাত তিনি বুঝতে পেরেছেন ভেবে আমি লজ্জায় লাল হয়ে উঠলাম, তাই তিনি বললেন।

ওকে একা যেতে দাও, রোজি। একাই ভালো পারবে।

–বেশ। কালকেও আসছ তো? আমরা আসছি।

—চেষ্টা করব। আমি উত্তর দিলাম।

তাঁরা চলে গেলেন। আমিও একটু পর পেছন পেছন রওনা হলাম। মনটা বেশ প্রফুল্ল ছিল বলেই ভিকারেজ ফটক পর্যন্ত একটিবার না পড়েও আমি সাইকেল চালিয়েই যেতে পারলাম। খাবার সময় বোধহয় খুব বাহাদুরী দেখিয়ে কথা বলেছিলাম, কিন্তু ড্রিফিলডদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা প্রকাশ করলাম না।

পরদিনও প্রায় এগারটা নাগাদ গাড়ি-ঘর থেকে সাইকেল বার করলাম। ঘোড়ার চিহ্নমাত্র না থাকলেও ওটাকে আমরা ঐ বলতাম। আসলে মালী তার কোদাল কুড়ুল ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ঐ ঘরে রাখত আর মেরিআন ঐ ঘরে মুরগির খাবার রাখত। ফটক পর্যন্ত সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে গেলাম। তারপর, খুব সহজ না হলেও, চেপে বসে টেরকানবারি রোড ধরে চালাতে লাগলাম যতক্ষণ না টার্নপাইক ফটকের কাছে এসে জয় লেন ধরে মোড় ঘুরলাম।

আকাশ তখন বেশ নীল, আর হাওয়া যদিও বেশ পরিষ্কার এবং উষ্ণ, রোদের তাপে যেন কেটে কেটে গায় বিঁধছিল। রোদের আলো বেশ উজ্জ্বল, যদিও চোখ-ধাঁধানো লাগল না। সূর্যের রশ্মি যেন কোন এক নিক্ষিপ্ত শক্তিতে সাদা-রাস্তার উপর ঠিকরে পড়ে রবারের গোলার মতো ছিটকে পড়ছিল।

ড্রিফিলডদের প্রতীক্ষায় আমি আগুপিছু সাইকেল চালাতে লাগলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যে দেখতে পেলাম তাঁরা আসছেন। আমি হাত নাড়িয়ে তাঁদের ইশারা করলাম এবং মোড় ঘুরে (এ জন্য নামতে হলো অবশ্য) তিনজন পাশাপাশি চলতে লাগলাম এক সঙ্গে। আমাদের আশানুরূপ উন্নতির জন্য মিসেস ড্রিফিলড এবং আমি পরস্পরকে অভিনন্দন জানালাম। সাইকেলের হেণ্ডেল-বারকে আপ্রাণ আঁকড়ে ধরে দুরু দুরু বুকে আমরা চালাতে

লাগলাম। কিন্তু মনে আমাদের অপার আনন্দ। ডিঃফিলড বললেন, যখন বুঝব নিজেদের উপর আস্থা এসেছে তখন নির্বিবাদে সারা শহরময় আমরা ছুটতে পারব।

—দাঁড়াও না, একটা মজা দেখাব তোমাকে। তিনি বললেন।

আমি কিছুই বুঝলাম না, তিনিও বুঝিয়ে বলতে চাইলেন না।

—দুদিন অপেক্ষা করো, আমি তোমায় দেখিয়ে দেব। তিনি বললেন। আগামীকাল চোদ্দ মাইল সাইকেল চালাতে পারবে। সাত মাইল যাওয়া আর সাত মাইল ফিরে আসা?

—হয়তো পারব, আমি বললাম।

—আমি তোমার জন্য সব ব্যবস্থা করে নিয়ে আসব। কিন্তু তুমি তোমার কাকাকে বলে এসো।

—দরকার হবে না।

—তাহলেও, আমার মনে হয় তোমার বলা উচিত।

তাঁর চোখের একটা অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে মিসেস ডিঃফিলড আমার দিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টি একদিকে যেমন কপট আবার তেমনি প্রীতিতে ভরা, আমি কেমন লাল হয়ে উঠলাম। আমি জানতাম জিজ্ঞাসা করলেই কাকা না বলবেন। এ সম্বন্ধে তাঁকে কিছু আদৌ না বলা বেশী ভালো হবে। কিন্তু পথ চলতে চলতে হঠাৎ দেখলাম তাঁর ডগ কার্ট চড়ে ডাক্তারবাবু আমাদের দিকেই আসছেন। আমি সোজা সামনের দিকে তাকালাম, এই মিথ্যে আশায় যে, আমি না তাকালে তিনি দেখতে পাবেন না আমাকে। আমার কেমন একটু অসোয়াস্তি বোধ হলো। যদি তিনি আমায় দেখে থাকেন! কথাটা সঙ্গে সঙ্গেই কাকা অথবা কাকীমার কানে গিয়ে পৌঁছুবে এবং যেটাকে আর গোপন রাখা সম্ভব হবে না সেই গোপনীয় কথাটা নিজের মুখে প্রকাশ করে দেওয়া নিরাপদ হবে কিনা আমি ভাবতে লাগলাম। ভিকারেজের ফটকের কাছে পৌঁছে যখন আমরা বিদায় নিলাম (এঁদের সঙ্গে এতদূর পর্যন্ত আসাটা আমি কিছুতেই এড়াতে পারলাম না) তখন ডিঃফিলড বললেন যে যদি আমি কালকে যাওয়াই স্থির করি তবে যেন সকাল সকাল গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

—আমরা কোথায় থাকি তুমি জানো বোধহয়? কনগ্রিগেশানেল চার্চের ঠিক পরের বাড়িটা। বাড়িটাকে 'লাইম কটেজ বলে।

খেতে বসে কেবলি আমি সুযোগ খুঁজছিলাম, ডিঃফিলডদের সঙ্গে আমার আকস্মিক দেখা হয়েছে এ খবরটা কথাচ্ছলে বলব বলে; কিন্তু ব্রেকস্টেবলে খবর হাওয়ার আগে চলত।

—আজকে সকালে কাদের সঙ্গে তুমি সাইকেল চালাচ্ছিলে? কাকীমা জিজ্ঞাসা করলেন। ডাঃ এনস্টে-এর সঙ্গে শহরে দেখা হয়েছিল, তিনি তোমাকে দেখেছিলেন বললেন।

অসমর্থনের ভাব দেখিয়ে কাকা রোস্ট চিবুতে লাগলেন এবং বেশ একটা রাগত ভাব নিয়ে প্লেটের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

—ডিক্রিফিলডদের সঙ্গে। নিস্পৃহভাবে আমি বললাম। ঐ লেখক, আপনারা চেনেন। মিঃ গলওয়ে ওঁদের চেনেন।

—এঁদের খুব বদনাম আছে। আমি চাই না তুমি এঁদের সঙ্গে মেশ।

—কেন? আমি বললাম।

—তোমাকে কৈফিয়ত দিতে আমি প্রস্তুত নই। আমি পছন্দ করি না, এই যথেষ্ঠ।

—তোমার সঙ্গে ওদের পরিচয় হলো কি করে? কাকীমা বললেন।

—আমি সাইকেল চালাচ্ছিলুম, তাঁরাও চালাচ্ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সাইকেল চালাতে তাঁরা আমাকে বললেন, তাই। সত্যকে একটু বিকৃত করে আমি বললাম।

—বেশ বাহাদুরী বটে! কাকা বললেন।

আমি কেমন গুম হয়ে গেলাম। বিরক্তি প্রকাশ করবার জন্য মিঠাই পাতে পড়তেই, যদিও রাপসবেরির এই খাবারটা আমি খুব পছন্দ করতাম, আমি খাব না বললাম। কাকীমা জানতে চাইলেন আমার শরীর ভালো আছে কিনা?

—আছে। বেশ তেজ দেখিয়েই আমি জবাব দিলাম খুব ভালো আছে।

—অল্প একটু খাও। কাকীমা বললেন।

—না, খিদে নেই। খাব না। আমি উত্তর দিলাম।

—একটুখানি, লক্ষ্মী সোনা। কেবল আমাকে খুশী করবার জন্য।

—পেট ভরেছে কি ভরেনি, ওর নিজেরই বুঝা উচিত। কাকা বললেন।

আমি তাঁর দিকে একটা তিক্তদৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম।

—বেশ, খাচ্ছি। আমি বললাম।

কাকীমার হাতে বেশ খানিকটা উঠল, সবটুকু আমি খেয়ে ফেললাম। দারুণ তীব্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুধু কঠোর কর্তব্যের খাতিরে কোনো কাজ করতে গিয়ে যেমন হয়, আমার চোখে-মুখে সেরকম একটা ভাব ফুটে উঠল। খাবারটা অতি উপাদেয় ছিল। মেরিআন এমন সুন্দর পেস্ট্রী তৈয়ার করত যে মুখে পুড়লেই মিলিয়ে যেত। কিন্তু আরো একটু নেবার কথা যখন কাকীমা বললেন আমি ভীষণ বিরক্তি দেখিয়ে সেটাকে প্রত্যাখ্যান করলাম।

তিনিও আর পীড়াপীড়ি করলেন না। কাকা প্রার্থনা সমাপন করলেন এবং আমিও একটু বিক্ষত মন নিয়ে ড্রইং-রুমে ফিরে গেলাম।

কিন্তু যখন বুঝতে পারলাম চাকরদেরও খাওয়া শেষ হয়ে গেছে তখন আমি রান্না ঘরের দিকে গেলাম। এমিলি প্লেটগুলি পরিষ্কার করে তুলছিল। মেরিআন ধোয়া-মোছার কাজ করছিল।

—আচ্ছা ডিফিলডদের এত বদনাম কেন? আমি মেরি আনকে জিজ্ঞাসা করলাম।

মেরিআন যখন আমাদের এই ভিকারেজে এসেছিল তখন তার বয়স ছিল মাত্র আঠার বৎসর। আমি তখন খুব ছোট্ট ছিলাম। ও আমাকে স্নান করাত, পাউডার মাখিয়ে দিত, স্কুলে যাবার সময় আমার বাক্স গুছিয়ে দিত, অসুখ হলে শুশ্রূষা করত, যখন বিরক্ত হতাম বই পড়ে শুনাত, যখন দুষ্টামি করতাম গালাগালি করত। এমিলি আবার এত বদমেজাজী ছিল যে মেরিআন বলত ওর হাতে পড়লে আমি হয়তো মরেই যেতুম। মেরিআন এই ব্লেকস্টেবলের মেয়ে ছিল। জীবনে কোনোদিন সে লণ্ডন যায় নি, এমন কি টেরকানবেরিতে ও হয়তো দু তিন বারের বেশি যায় নি কখনো। কোনোদিন ওর অসুখ বিসুখ করতে দেখিনি। কোনোদিন সে ছুটি নেয় নি। বছরে বারো পাউণ্ড মাইনে পেত। সপ্তাহে মাত্র একটি দিন সে তার মাকে দেখতে শহরে যেত। তার মা ভিকারেজের কাপড় কাচত; আর রবিবার দিন সন্ধ্যায় গির্জায় যেত। কিন্তু ব্লেকস্টেবলের সব ঘটনা তার নখদর্পণে থাকত। কে কোন লোক তার ঠিকুজি সব তার মুখস্থ ছিল। কে কাকে বিয়ে করেছে, কার বাবা কোন রোগে মারা গিয়েছে, কোন মেয়েছেলের কটি ছেলেমেয়ে এবং কোনটির কি নাম কিছুই তার অজানা ছিল না।

আমি আমার প্রশ্নটা মেরি আনকে করলুম এবং সে একটা ভিজা ন্যাকড়া ধপ করে বালতির জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

—তোমার কাকাকে আমি দোষ দিই না, বাছা, সে বলল।—ওদের সঙ্গে আমিও তোমাকে মিশতে দিতাম না বাছা। আমার ভাই-পো হলেও না। আশ্চর্য, ওদের সঙ্গে সাইকেল চড়বার কথা ওরা বলতে পারল তোমাকে? কতগুলো লোক আছে, যা খুশি তাই করতে পারে।

আমি বুঝতে পারলাম খাবার ঘরের বিতর্কের আবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এখানেও।

—আমি কচি খোকা নই। আমি বললুম।

—সেই জন্যেই তো আরো বেশী বিপদ। কিন্তু এখানে আসবার

আস্পর্দ্ধা এদের হলো কেমন করে ? আশ্চর্য, আবার এখানে একটা বাড়িও নিয়েছে। ভদ্রলোক সেজে স্বামী স্ত্রীর মতন বাস করছে। শোন, আর ওদিক পানে কখনো মাড়িও না, বাছা।

রাপসবেরির খাবারটা তখনো টেবিলে রাখা ছিল, আমি খানিকটা ভেঙে নিয়ে মুখে পুড়ে ফেললাম।

—এই, এটা সাপারের জন্য রেখে দিয়েছি। এতই যদি লোভ, যখন সাধা হচ্ছিল খাওনি কেন শুনি ? টেড্ ডিভ্রিফিলড কোনো সময় কোনো কিছুতে লেগে থাকতে পারত না। ভালো লেখাপড়া শিখেছিল। আমার দুঃখ হয় শুধু ওর মার জন্য। জন্মের দিন থেকেই ওর মাকে ও জ্বালিয়ে এসেছে। তারপর ও কিনা ঐ রোজি গ্যান মেয়েটাকে বিয়ে করে বসল। শুনেছি ওর কুকর্মের কথা যখন ওর মাকে বলেছিল বেচারা সেইদিন থেকেই বিছানা নিয়েছিল, তিন তিনটা হপ্তা কাটিয়ে দিল, কারো সঙ্গে একটা কথাও বলল না।

—আচ্ছা, বিয়ের আগে মিসেস ডিভ্রিফিলডের নাম রোজি গ্যান ছিল বলছিলে, এই গ্যানরা কারা ? ব্লেকস্টেবলে সাধারণ পরিচিত নামগুলির মধ্যে এই গ্যান নামটিও একটি। গির্জার অঙ্গন এদের কবরে গিজ গিজ করত।

—তুমি এদের চিনবে না। রোজির বাবার নাম জোসিয়া গ্যান্। ওরও খুব বাউণ্ডুলে স্বভাব ছিল। সেপাইয়ের কাজ নিয়ে একবার কোথায় চলে গিয়েছিল, ফিরে এল এক খানা কাঠের পা নিয়ে। ছবি আঁকবার জন্য মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যেত। তবে বেশির ভাগ সময় ওর কোনো কাজকর্ম থাকত না। বাইলেনে আমাদের বাড়ির পাশেই ওদের বাড়ি। রোজি এবং আমি একসঙ্গে সানডে স্কুলে পড়তাম।

—কিন্তু তাঁকে দেখলে তো তোমার মত বয়স বলে আমার মনে হয় না। বয়সের স্বাভাবিক নির্বুদ্ধিতা নিয়ে বলে ফেললাম।

—ওর ত্রিশ বছর বয়স আর আসবে না কোনদিন, যাই বল না কেন।

মেরি আনের খাঁদা নাক, দাঁত গুলিও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তবে বেশ চক্চক করত। আমি ভাবতেই পারতাম না ত্রিশ বছরের বেশি ওর বয়েস।

—রোজি আমার চেয়ে চার পাঁচ বছরের বেশি ছোট হতেই পারে না, যতই ও দেখিয়ে বেড়াক। সাজ-গোজ আর রঙ-চঙের জন্য ওকে নাকি আজকাল আর চেনাই যায় না।

—আচ্ছা উনি নাকি মদের দোকানে কাজ করতেন, কথাটা কি সত্যি ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—হাঁ, ঐ রেলওয়ে আর্মস শুঁড়িখানায়, পরে হেভারসান-এ প্রিন্স অফ ওয়েলস ফেদার্স-এ। মিসেস রিভস রেলওয়ে আর্মস-এ ওকে নিয়েছিলেন' কিন্তু

এমন পরিস্থিতি ও করে তুলেছিল যে ওকে ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। রেলওয়ে আর্মস শুঁড়িখানা লণ্ডন-বেথাম ডোভার্স রেলওয়ে স্টেশনের ঠিক উলটো দিকটায় ছিল। কেমন একটা রহস্যময় জাকজমক ঐ শুঁড়িখানাটাকে ঘিরে থাকত। শীতের রাত্তিরে ওটার সামনে দিয়ে যেতে যেতে কাঁচের দরজার ভেতর দিয়ে বারের সামনে বসা লোকদের স্পষ্ট দেখা যেত। আমার কাকার ঘোরতর আপত্তি ছিল এই শুঁড়িখানার বিরুদ্ধে, এর লাইসেন্স বাতিল করার জন্য তিনি বহুদিন ধরে চেষ্টা করেছিলেন। রেলের কুলি, কয়লা খনির মজুর এবং চাষীরা সাধারণত ওখানে যেত। ব্লেকস্টেবলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ওখানে পদার্পন করবার কথা চিন্তা করতেও ঘৃণা বোধ করতেন। যদি কোন সময় বিয়ার পান করবার ইচ্ছা হতো তখন 'বিয়ার এণ্ড কি' অথবা 'ডিউক অব কেন্টে' তাঁরা যেতেন।

—কেন বল তো? তিনি কী করেছিলেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম। দারুণ কৌতূহলে আমার দুটি চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল।

—কি করেননি বলতে পার? মেরি আন বলল। কিন্তু তোমাকে এসব কথা বলছি তোমার কাকা জানতে পারলে কী যে করবেন জানিনা। ওখানে মদ খেতে যারা যেত তাদের এমন কেউ বাদ যেত না যার সঙ্গে ওর লটর-পটর হতো না। যে কেউ হোক—কোনো বাদ বিচার ছিল না। একজনকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত না। একজনের পর একজন,- এমনি করে ওর চলত। ভাবতেও গা ঘিন ঘিন করে উঠে। এমনি সময়ই লর্ড জর্জকে নিয়ে তার কেচ্ছা শুরু। ওরকম জায়গায় লর্ড জর্জ অবশ্যি যেত না কখনও। ওর মর্যাদা বোধ আরও একটু বেশী ছিল. কিন্তু শোনা যায় একদিন ঘটনাচক্রে নাকি সে ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল. ট্রেনটা সেদিন খুব লেট ছিল। সেইখানেই লর্ড জর্জের পরিচয় হলো রোজির সংগে। তারপর থেকেই ওখানে যাওয়া যার তার বন্ধ হলো না। ওখানকার ঐ অসভ্য জংলী পরিবেশের সঙ্গে নিজেও বেশ মিশে গেল; অবশ্যি বারের মালিক বুঝতে পেরেছিল কেন সে যেত ওখানে। অথচ মজা এই তখন লর্ড জর্জের স্ত্রী এবং তিন তিনটি ছেলেমেয়ে বর্তমান। ঐ বেচারা বউটির জন্য সত্যি আমার ভারী দুঃখ হতো। তারপর যে কেচ্ছা শুরু হলো! এতটা বাড়াবাড়ি হতে লাগল যে মিসেস রিভস বাধ্য হলেন, তিনি রোজিকে তার পাওনা চুকিয়ে দিলেন এবং তাকে চলে যেতে অনুরোধ করলেন। পচা নর্দমা থেকে আস্তাকুঁড়, মন্দ কি, এই আমি ভাবলাম।

আমি লর্ড জর্জকে ভালোভাবেই জানতাম। তার আসল নাম জর্জ কেম্প। যে উপাধির জন্য সে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল, সেটা তার স্বভাবের

সৌখিনতা-বাহুল্যের জন্য তামাসাচ্ছলে তাকে সেখানকার বাসিন্দারা দিয়েছিল। সে আমাদের অঞ্চলে কয়লার ব্যবসায়ী ছিল। কখনও সখনো বাড়ি-ঘরের ব্যাপারে মাথা ঘামাত। দুটো একটা কোলিয়ারীর দু একখানা শেয়ার তার ছিল। নিজের জমির উপর ইটের পাকা বাড়িতে সে বাস করত, এবং নিজের টেৃপ গাড়ি চালাত। দেখতে বেশ মোটা সোটা ছিল। খোচা খোচা দাড়ি, বেশ সৌখিন চকৃচকৃ করত চোখ দুটি, বেশ বড় বড় নীল রঙ। তার কথা ভাবতে গিয়ে আজকে আমার মনে হয় হয়তো যে কোনো ওলন্দাজ শিল্পীর হাতে আঁকা লালমুখো সওদাগরদের মতই সে দেখতে ছিল। সবসময় বেশ জাঁকজমক পোশাক পরত, এবং যখন সে হাই স্ট্রীটের মাঝখান দিয়ে তার গাড়ি ছুটিয়ে যেত। তার গায় থাকত হরিণ শিশুর রঙের মত কচি কচি রঙের কোট, বড়ো বড়ো বোতাম দেওয়া বাদামী রঙের বাউলার। টুপিটা মাথার এক দিকে হেলে থাকত, বাটম হোলে একটা রক্ত গোলাপ শোভা পেত। তখন তা না পরে কেউ পারত না। প্রতি রবিবার ঝকৃঝকে টপ হ্যাট এবং ফ্রক কোর্ট পরে গির্জায় আসত। সবাই জানত চার্চ ওয়াডেন হবার জন্য তার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষার কথা, এবং এত সত্যি যে তার এমনি জীবনী শক্তি হয়তো কাজেও লাগত, কিন্তু আমার কাকা বিরূপ ছিলেন। প্রতিবাদ স্বরূপ যদিও সে পাকা একটি বছর চ্যাপেলে যাওয়া আসা বন্ধ করেছিল তবু কাকা এক তিল নড়লেন না।

শহরে তার সঙ্গে পথে দেখা হলে কাকা ভ্রূক্ষেপও করতেন না। অবশেষে একটা আপোষ নিষ্পত্তি হয়েছিল বটে, এবং লর্ড জর্জও আবার চার্চে আসতে শুরু করেছিল, কাকা শুধু এইটুকু নামতে রাজী হলেন, তাকে একজন সহকারী বলে নিযুক্ত করলেন। সেখানকার ভদ্রসমাজ তাকে অত্যন্ত অসভ্য মনে করত এবং সে যে অত্যন্ত দেমাকি এবং বড়ো বড়ো কথা বলত সে সম্বন্ধে আমার মনেও কোনো সন্দেহ ছিল না। তার উঁচু গলা এবং কর্কশ হাসির জন্যে সবাই অভিযোগ করত। রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে সে যখন কারো সঙ্গে কথা বলত অপর পার থেকে তার প্রতিটা কথা স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যেত। এবং তার আচার ব্যবহারকেও সবাই কুৎসিত মনে করত। তবে সে অতি মাত্রায় বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। সে যখন কথা বলত, এমন ভাব করত যেন কত আনাড়ি সে। সবাই তাকে বেশ ধুরন্ধর বলে ভেবে নিয়েছিল। তাই সামাজিকতা করবার অতি উৎসাহের বদলে সে পেত সবার অপকট বিরোধীতা।

আমার বেশ মনে আছে, একদিন ডাক্তারের স্ত্রী কাকীমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। সেই সময় এমেলি এসে খবর দিল যে মিঃ জর্জ কেম্প কাকার

সঙ্গে দেখা করতে চান।
—কিন্তু এমেলি, আমি যে সামনের দরজায় বেল বাজতে শুনলাম। কাকীমা বললেন।
—আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি সামনের দরজায় এসেছিলেন।
একটা ভারী বিশ্রী পরিস্থিতির উদ্ভব হোলো কিছুক্ষণের জন্যে। এমনি একটা অস্বাভাবিক অবস্থায় কী করা উচিত কেউ যেন ভেবে পেলেন না। এমনকি এমেলী নিজেও জানত কে সামনের দরজা দিয়ে আসবে, কে পাশের দরজায় যাবে, আবার কে পেছনের দোর দিয়ে আসবে, যেন কেমন একটু থতমত খেয়ে গেল! আমার কাকীমার নরম মন, মনে হলো তিনি বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। অবশেষে কাকা নিজেই এ ভাবটা কাটিয়ে দিলেন।
—ওঁকে পড়ার ঘরে বসতে দাও, এমেলি। তিনি বললেন। চা খেয়েই আমি আসছি।
কিন্তু লর্ড জর্জ তখনও তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি শূন্যগর্ভ, তেমনি উল্লসিত রইল। যে শহরটা মৃতপ্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে, সে ওকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে। রেল কোম্পানীকে ধরে প্রমোদ ভ্রমণের ব্যবস্থা সে করবে। মারগেটের মত তাদের শহরটাও যে কেন হবে না তা সে বুঝতে পারত না। তারপর তাদের একজন মেয়র থাকবে না কেন? ফার্নে-বে তে মেয়র আছে।
—বোধহয় তার নিজেরই মেয়র হবার মতলব। ব্লেকস্টেবলের সাধারণ লোক বলাবলি করত। তাদের শুকনো ঠোঁট তারা জিভ কেটে ভিজিয়ে নিত। জেনে রেখো, অতি দর্পে হত লংকা, তারা বলত।
এবং আমার কাকা মন্তব্য করতেন ঘোড়াকে জলের কাছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কিন্তু জল খাওয়া ঘোড়ার ইচ্ছা।
আমিও বলব, আর সবার মতো আমিও লর্ড জর্জকে ঘৃণার চোখে দেখতাম। রাস্তায় দাঁড় করিয়ে আমাকে যখন নাম ধরে ডাকত এবং এমন করে কথা বলত যেন কোনো সামাজিক বৈষম্য নেই আমাদের ভেতর, তখন রীতিমত অপমানিত বোধ করতাম। আমাকে তার সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলবার জন্য সে প্রস্তাব করত। কিন্তু তার ছেলেরা হেভারসামের গ্রামার স্কুলে পড়ত কাজেই ওদের সঙ্গে মেলামেশা করবার কোনো কথাই ছিল না আমার।
মেরি আনের মুখে ঐ কাহিনী শুনে আমি যেমনি আহত হয়েছিলাম তেমনি একটা ভীষণ উত্তেজনাও অনুভব করেছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করতে আমার কঠিন মনে হয়েছিল। সে সময়ের ভেতর আমি অনেকগুলি উপন্যাস পড়ে ফেলেছিলাম এবং প্রেমের বিষয় নিয়ে বেশী মাথা ঘামানোর শিক্ষা আমি

স্কুলে পেয়েছিলাম তবে আমি মনে করতাম যে এ বিষয়টা শুধু তরুণদের ব্যাপার। কিছুতেই ধারণা করতে পারতাম না, যে লোকের দাড়িগোঁফ উঠেছে, যে বিয়ে করেছে, আমার সমবয়সী ছেলে আছে, তার মনেও কোনোদিন এমনি জিনিস বাসা বাঁধতে পারে। আমি ভাবতাম বিয়ে করবার সঙ্গে সঙ্গেই এসব জিনিষেরও শেষ হয়ে যায়। তিরিশ বছর বয়স পেরিয়ে গিয়েও কেউ কখনও প্রেমে পড়তে পারে! ভাবতেও কেমন বিশ্রী লাগত।

—নিশ্চয় তাঁরা এমন কিছু করেননি? আমি মেরি আনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

—করেন নি মানে? শুনেছি খুব কমই কিছু ছিল যা রোজিগ্যান করেনি। তাছাড়া শুধু ঐ লর্ড জর্জের সঙ্গেই নয়।

—কিন্তু, তাহলে রোজির কোনো ছেলেপুলে হয়নি কেন!

আমি উপন্যাস পড়েছিলাম যখনই কোনো সুন্দরী মেয়ে খারাপ হয়ে যেত তার ছেলেপুলে হতো। দেখতাম কারণটা ভীষণ সতর্কতার সঙ্গে বলা হতো, কোনো কোনো সময় কেবল কতগুলো ফুটকি ফুটকি দিয়ে ইংগিতে শেষ করে দেওয়া থাকত, কিন্তু সবক্ষেত্রে ফল একই এবং অবিসংবাদিত।

—সে ওর সৌভাগ্য, সতর্কতা এবং সুবুদ্ধির জন্য নয়, এ আমি জোর করে বলব। মেরি আন বলেছিল। তারপরেই সে নিজেকেই একটু সংযত করে নিয়েছিল এবং ধোয়া প্লেটগুলি মুছে তুলে রাখতে শুরু করেছিল। বা-বা যা তোমার জানার কথা নয় তার চেয়েও অনেক বেশী কিছু তুমি জান দেখছি। সে বলেছিল।

নিশ্চয় জানি। বেশ বাহাদুরীর ভাব দেখিযে আমি বললাম—মরুকগে, কিন্তু এখন আমি বড়ো হয়ে গেছি?

—এইটুকু তোমাকে বলতে পারি, মেরি আন বলতে লাগল—মিসেস রিভস যখন রোজিকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তখন লর্ড জর্জই হেভারসামের প্রিন্স অব ওয়েলস ফেদার্স-এ তাকে আবার কাজ জুটিযে দিয়েছিল এবং জর্জ নিজের গাড়ি চড়ে সব সময় ওখানে যাওয়া আসা করত। ওখানকার মদ এখানকার চেয়েও একটু বেশী মিষ্টি নয় নিশ্চয়।

—তাহলে টেড ড্রিফিলড কেন রোজিকে বিয়ে করেছিলেন? আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

—বল কেন! মেরি আন বলল—ঐ ফেদার্স-এ গিযেই রোজির সঙ্গে ড্রিফিলডেরও পরিচয় হয়েছিল। আমার বিশ্বাস আর কোনো মেয়ে ওর কপালে জুটত না। কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে কিছুতেই তাকে বিয়ে করত না।

—রোজির ব্যাপারে তিনি কিছু জানতেন না ?

—তাকেই তুমি জিজ্ঞাসা করো।

এরপর আমি নীরব রইলাম। সবটা ব্যাপার কেমন ঘোলাটে লাগছিল আমার কাছে।

—রোজি এখন দেখতে কেমন ? মেরি আন জিজ্ঞাসা করল—বিয়ে করবার পর ওর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। রেলওয়ে আর্মস-এর কেচ্ছা কাহিনী শুনবার পর থেকে কথাই বলতাম না ওর সঙ্গে।

—ভালোই তো দেখতে। আমি বললাম।

—বেশ, আমার কথা ওর মনে আছে কিনা তুমি ওকে জিজ্ঞাসা করো, দেখো ও কি বলে।

ছয়

পরদিন সকালে ড্রিফিলডদের সঙ্গে যাব বলেই আমি প্রায় মনস্থির করে ফেলেছিলাম। তবে আমি জানতাম যাওয়া সম্বন্ধে কাকার অনুমতি নেওয়া অর্থ-হীন। যদি তিনি জেনে ফেলেন এবং হৈ চৈ করেন তাহলেও কিছু করবার ছিল না আমার। আর ড্রিফিলড যদি জানতে চান আমি কাকার অনুমতি নিয়েছি কিনা তাহলে নিয়েছি বলব বলেই তৈরী ছিলাম। কিন্তু আসলে মিথ্যা কথা আমাকে বলতে হয়নি। বিকেলের দিকটায় ভরা জোয়ার ছিল বলে স্নান করতে সমুদ্র তীরের দিকে গিয়েছিলাম এবং কাকাও বিশেষ কাজে শহরের দিকে যাবার পথে কিছু পথ আমার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে গিয়েছিলেন। বিয়ার এণ্ড কি রেস্তোরাঁর সামনে দিয়ে যখন আমরা যাচ্ছিলাম ঠিক সেই সময় টেড ড্রিফিলড বেরিয়ে এল সেখান থেকে। তিনি আমাদের দেখতে পেয়েছিলেন, নিজেই সোজা কাকার কাছে চলে এলেন। তাঁর এমনি ধীরতা দেখে আমার চমক লেগে গিয়েছিল।

—আমার সান্ধ্য নমস্কার নেবেন, ভিকার। তিনি বললেন—জানিনা আমার কথা এখনও আপনার মনে আছে কিনা। ছেলেবেলায় আমি কয়ার গাইতাম। আমি টেড ড্রিফিলড। মিস উলফের বেলিফ আমাকে প্রতি-পালন করতেন।

কাকা একটু ভীতু গোছের লোক ছিলেন, তিনি হকচকিয়ে গেলেন।

—ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ,·········তা······কেমন আছেন আপনি ?

আপনার পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে সেদিন ভীষণ দুঃখিত হয়েছিলাম।

—আপনার এই ভাইপোটির সঙ্গে আমি কিন্তু বেশ ভাব জমিয়ে বসেছি। ভাবছিলাম কালকে সকালে ওকে আমার সঙ্গে বাইরে যেতে দিতে আপনার

কোনো আপত্তি হবে না বোধহয়। একা একা সাইকেল চালাতে নিশ্চয় ওর খুব বিরক্তিকর লাগছে। ফার্নে চার্চে যাব মনে করছি।

—খুব ভালো কথা কিন্তু……

কাকা অমত করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ডিফিলড তাঁকে বাধা দিলেন।

—ও যাতে কোনো রকম দুষ্টুমি না করে সেদিকে আমি লক্ষ্য রাখব আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি। ওর হয়তো ভালো লাগবে। বেশ উৎসাহ পাবে। কাগজ এবং মোমের ব্যবস্থা আমি করে দেব, ওকে কিছু খরচ করতে হবে না।

আমার কাকার সংযোজনশীল মন ছিল না, তাই কাগজ এবং মোমের মূল্য ডিফিলড দেবেন শুনে তিনি এমন চটে গিয়েছিলেন যে আমাকে আদৌ যেতে দেবার অনিচ্ছার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন।

—কাগজ ও মোমের ব্যবস্থা সে নিজেই করতে পারবে; তিনি বললেন —তার হাত খরচার টাকার অভাব নেই, আজে বাজে খাবার কিনে খেয়ে শরীর খারাপ করার চেয়ে এমনি কাজে ব্যয় করা ঢের ভালো আমি মনে করি।

—বেশ, হেওয়ার্ডদের দোকানে গিয়ে আমাকে যা যা দিয়েছে সে কথা বললেই তাকেও তাই দিয়ে দেবে।

—আমি এক্ষুনি যাব। আমি বললাম। কাকাকে মত বদলাবার সুযোগ না দিয়ে রাস্তা ধরে ছুটে পালিয়ে গেলাম।

সাত

শুধু নিছক মমত্ববোধ ছাড়া অন্য কী কারনে ডিফিলড পরিবার আমার সম্বন্ধে এতটা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন আমি জানি না। আমি নিতান্ত গো-বেচারা খোকাটি ছিলাম। বেশী কথা বলতে পারতাম না। আমাকে নিয়ে যদি ডিফিলডরা আনন্দ পেয়ে থাকেন সেও আমার অজান্তে। হয়তো আমার শ্রেষ্ঠত্ববোধ তাঁদের বেশ একটু নাড়া দিয়েছিল। মিস উলফের বেলিফ-পুত্রের সঙ্গে মেলা মেশা করা যে আমার তরফ থেকে একটা দাক্ষিণ্য প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয় এই ধারণা আমি মনে মনে পোষণ করতাম। যখন কতকটা দেমাকের ভাব দেখিয়েই হয়তো তাঁর একখানা বই পড়তে চেয়েছিলাম এবং তিনিও আমার ভালো লাগবে না বলে এড়িয়ে গিয়েছিলেন তখন তাঁর কথা আমি সত্যি বলেই মেনে নিয়েছিলাম। কোনো রকম পীড়াপীড়ি করিনি। একবার ডিফিলডদের সঙ্গে বাইরে যাবার অনুমতি দেবার পর কাকার কাছ থেকেও আর তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করবার বিরুদ্ধে কোনো রকম আপত্তি

আসত না। কখনও আমরা নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। কখনো মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের পরিবেশে চলে যেতাম, এবং ড্রিফিলড দু একখানা জল রঙে ছবি আঁকতেন। জানিনা, সেসব দিনে ইংলণ্ডের জল বায়ু সত্যি সত্যি খুব ভালো ছিল কি না, নাকি এ শুধু যৌবনের একটা মায়া মরীচিকা মাত্র, কিন্তু এখনও আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে সেবার সারা গ্রীষ্মকাল ধরে রৌদ্রজ্জ্বল দিনের একটা অবিচ্ছিন্ন ধারার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সেই উঁচু নিচু এবং প্রাচুর্যে ভরা স্বচ্ছ সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশের জন্য একটা সকৌতূহল প্রীতি আমার সারাটা অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল। দূরান্তের মাঠে আমরা চলে যেতাম, কখনও এক গির্জা ছেড়ে অন্য গির্জায়, সঙ্গে থাকত তৃণ বর্মধারী নাইট আর খড়খড়ে ঘাগরা পরা মহিলারা। এমনি স্বভাব-সরল অভিযানের পথে ড্রিফিলড তাঁর অন্তরের আনন্দোচ্ছ্বাস দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। এবং আমিও আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি দিয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলাম। বেশ গর্বের সঙ্গে আমার পরিশ্রমের ফল কাকাকে দেখিয়েছিলেন। মনে হয় হয়তো তিনি ভেবেছিলেন যে যাদের সঙ্গেই আমি মিশি না কেন ধর্মের দিকে মতি থাকলে অনিষ্ট হবার কোনো আশঙ্কা ছিল না! আমরা যখন কাজে ব্যস্ত থাকতাম মিসেস ড্রিফিলড গির্জার বাইরে অপেক্ষা করতে-। সেলাই নিয়েও নয় বই পড়েও নয়, কেবল ঘুরে বেরিয়ে সময় কাটিয়ে দিতেন, বিরক্তিবোধ না করে বেশিক্ষণ কিছু না করে তিনি থাকতে পারতেন না বলেই মনে হতো।

কখনো আমি বাইরে বেরিয়ে এসে ঘাসের উপর কিছুক্ষণ বসতুম তাঁর সঙ্গে। আমার ইস্কুল, সেখানকার বন্ধু বান্ধব, ইস্কুলের মাস্টারমশাই, ব্লেকস্টেবলের লোকজন এমন কত কি সমন্ধে আমরা আলোচনা করতাম। তাঁর মুখে মিঃ এসেনডেন নামটা শুনে আমি ভারি খুশী হতাম। আমার মনে হয় তিনিই হয়তো প্রথম, যিনি আমাকে এই নামে ডেকেছিলেন। এতে আমার বয়স বেড়ে গেছে বলে আমি মনে করতে লাগলাম। কেউ কখনো মাস্টার উইলি বলে ডাকলে আমার ভীষণ রাগ হতো। এরকম নাম কারো আছে ভাবতেও যেন আমার ভীষণ কদর্য লাগত। আসলে আমার নামের দুটোর কোনটাই আমার ভালো লাগত না। পছন্দ মতো নাম খুঁজতে আমি বহু সময় নষ্ট করতাম। রোডারিক রেভেনসওয়ার্থ নামটা আমি বেশি পছন্দ করতাম, পাতার পর পাতা বিশেষ লিপি কৌশলে এই নাম স্বাক্ষর করে আমি ভরিয়ে তুললাম। লিউডোভিক মণ্টোগমারি নামটাও আমার খারাপ লাগত না।

মিসেস ড্রিফিলড সমন্ধে মেরি আন যেসব কথা আমাকে বলেছিল যেগুলো কিছুতেই আমি মন থেকে দূর করতে পারছিলাম না। যদিও নিতান্ত তথ্য

হবার কোনো আশঙ্কা ছিল না। আমরা যখন কাজে ব্যস্ত থাকতাম মিসেস ডিংফিলড গির্জার বাইরে অপেক্ষা করতেন। সেলাই নিয়েও নয়, বই পড়েও নয়। ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটিয়ে দিতেন। বিরক্তিবোধ না করে বেশিক্ষণ তিনি থাকতে পারতেন না বলেই মনে হতো।

কখনো আমি বাইরে বেড়িয়ে এসে ঘাসের উপর কিছুক্ষণ বসতাম তাঁর সঙ্গে। আমার ইস্কুল, সেখানকার বন্ধু-বান্ধব, ইস্কুলের মাস্টার মশাই, ব্লেকস্টেবলের লোকজন, এমন কতকী সম্বন্ধে আমরা আঁলোচনা করতাম। তাঁর মুখে মিঃ আসেনডেন নামটা শুনে আমি ভারি খুশী হতাম। আমার মনে হয় তিনিই হয়তো প্রথম, যিনি আমাকে এই নামে ডেকেছিলেন। এতে আমার বয়স বেড়ে গেছে বলে আমি মনে করতে লাগলাম! কেউ কখনও মাস্টার উইলি বলে ডাকলে আমার ভীষণ রাগ হতো। এরকম নাম কারও আছে ভাবতে যেন আমার ভীষণ কদর্য লাগত। আসলে আমার নামের দুটোর কোনটাই আমার ভালো লাগত না। আমার পছন্দ মতো নাম খুঁজতে আমি বহু সময় নষ্ট করতাম। রোডারিক রেভেনস ওয়ার্থ নামটা আমি বেশ পছন্দ করতাম। পাতার পর পাতা বিশেষ লিপি কৌশলে স্বাক্ষর করে আমি ভরিয়ে তুলতাম। লিউডোভিক মণ্টগোমারী নামটাও আমার খারাপ লাগত না।

মিসেস ডিংফিলড সম্বন্ধে মেরি আন যেসব কথা আমাকে বলেছিল সেগুলো কিছুতেই আমি মন থেকে দূর করতে পারছিলাম না। যদিও নিতান্ত তথ্য হিসাবে আমি জানতাম বিয়ের পর মানুষ কি করে থাকে এবং সেসব কথা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ ও করতে পারতাম, তবে আসলে এর গূঢ় রহস্য কিছুই আমি বুঝতাম না। সত্যি এগুলোকে আমার ভারি বিশ্রী লাগত, এবং সত্যি সত্যি এগুলো আমি মোটেই বিশ্বাস করতে পারতাম না। পৃথিবীটা যে আসলে গোল এ আমি জানতাম, কিন্তু এ যে একটু চাপা এও আমার অজানা ছিল না। মিসেস ডিংফিলডকে এত প্রাণখোলা মনে হতো, তাঁর হাসি এত সরল এবং আন্তরিক লাগত, তাঁর স্বভাবে এমন একটা কচি এবং শিশু-সুলভ কিছু আমি পেতাম যে নাবিকদের সঙ্গে তাঁর কিছু হওয়া সম্ভব আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। উপন্যাসে পড়া দুষ্ট মেয়েমানুষের মতো কিছুতেই তাঁকে মনে হতো না। অবশ্যি আমি জানতাম তিনি খুব ভালো ছিলেন না, ব্লেকস্টেবলের গেঁয়ো সুরে কথা বলতেন। 'হ' উচ্চারণ থেকে প্রায়ই তিনি বাদ দিয়ে দিতেন। এমন কি অনেক সময় তাঁর ব্যাকরণ জ্ঞান দেখে আমি আঁতকে উঠতাম। তবু তাঁকে পছন্দ না করে পারতাম না।

আমি সিদ্ধান্তে এলাম যে মেরি আন বর্ণিত কাহিনী সবই মিথ্যা।

মেরি আন আমাদের বাড়িতে রাঁধুনীর কাজ করে এই কথা একদিন আমি

তাকে বললাম।
—সে বলে রাই-লেনে আপনাদের বাড়ির পাশের বাড়িতেই নাকি তারা থাকত। মিসেস ডিংফিলড কোনোদিন তার নামই শোনেননি এমনি জবাবের জন্য প্রস্তুত হয়েই আমি কথাটা বলেছিলাম।
কিন্তু তিনি একটু মুখ টিপে হাসলেন। তাঁর নীল চোখ দুটো কেমন চিক চিক করে উঠল।
—কথাটা সত্যি। জানো, সে আমাকে সানডে স্কুলে পৌঁছে দিত। আমাকে সামলে রাখবার মতো কঠিন কাজটাও সে করত কিন্তু। শুনেছিলাম সে ভিকারেজে চাকুরি নিয়ে গিয়েছিল। বা! বা! এখনো সে ঐ কাজেই আছে! উফ! সে আজ কতকাল তার সঙ্গে আমার দেখা হয় না জানো! আবার দেখা হলে কত খুশী হতাম। পুরনো দিনের কথা আলোচনা করতে পারতাম। তাকে বলো আমার কথা, বুঝলে? কেমন, বলবে তো? বলো বিকেলের দিকে বেড়াতে বেড়াতে যেন আমার এখানে আসে কোনোদিন। অন্তত এক পেয়ালা চা আমি দিতে পারব তাকে।
আমি একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম তাঁর কথা শুনে। ডিংফিলডরা যে বাড়িতে থাকতেন সেটা কিনবার কথা তাঁরা ভাবছিলেন। মেরি আনকে চা খেতে বলার কথা তাঁদের মনে আসতে পারে এ আমি ভাবতে পারতাম না। আমার নিজের অবস্থার কথাটাও ভাববার ছিল সেখানে। কী করা উচিত আর কী মোটেই করা উচিত নয় বোধহয় তার কোনো ধারণা ছিল না তাঁদের। তাঁদের অতীত জীবনের কাহিনী তাঁরা যেভাবে আলোচনা করতেন এবং যেসব কথা উল্লেখ করা স্বপ্নেরও অগোচর বলে আমার মনে করা উচিত সেইসব কথায় আমি বিব্রত বোধ না করে পারতাম না। জানিনা যাদের পরিবেশে আমি বাস করতাম তারা যত বড়ো লোক নয় বা যতটুকু অভিজাত নয় তার চেয়েও বেশী জাহির করত কিনা। তবে ফেলে আসা দিনগুলির কথা ভাবতে গিয়ে কেবল আমার মনে হয়, সত্যি এরা সবাই কপটতায় তাদের জীবনকে ডুবিয়ে রেখেছিল। কৌলিন্যের মুখোশ নিয়ে তারা আড়াল দিয়ে থাকত। টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে খালি পায়ে কখনও তাদের বসে থাকতে দেখতে পেতেন না। মহিলারা সান্ধ্য পোশাক পরতেন। পোশাক পরা শেষ হবার আগে তাদের দেখা মিলত না। ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনে এমনি কঠোর ব্যয় সঙ্কোচের ভিতর তারা দিন কাটাত যে হঠাৎ গিয়ে পড়লে এক খুঁদ-কুঁড়াও জুটত না কারো ভাগ্যে। অথচ নিমন্ত্রিতের জন্য ভোজ্য দ্রব্যের পাহাড় উঁচু খাবার টেবিলে। সংকটে অভিভূত হয়েও তারা দিশেহারা হতো না। মাথা উঁচু রেখে সেই সংকটকেও তারা অবহেলা করত। পরিবারের

একটি ছেলে হয়তো কোনো অভিনেত্রীকে বিয়ে করেছে। কিন্তু এই দুর্নীতির কথা ভুলেও তারা উল্লেখ করত না কখনও, প্রতিবেশীরা আতঙ্কে শিউরে উঠলে সেই থিয়েটারের নাম উল্লেখ করত না তাদের সামনে। আমরা সবাই জানতাম মেজর গ্রীনকোটের স্ত্রী এমন কোনো ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন যে স্বামী বা স্ত্রী কেউ কখনও তাঁদের এই অসম্মানজনক গোপণীয় কথা ইঙ্গিতেও উল্লেখ করতেন না। যদিও আমরা আড়ালে নাক সিঁটকাতাম, তবু কোনো তৈজসপত্রের নাম পর্যন্ত করতাম না তাঁদের সামনে। এই ব্যবসাই ছিল মিসেস গ্রীণকোর্টের উপার্জনের মূলকেন্দ্র।

কোনো রুষ্ট পিতাকে মাত্র একটি শিলিং হাতে দিযে ছেলেকে পথে বার করে দিতে অথবা মেযেকে (যে নাকি আমার মায়ের মতো সলিসিটরকে বিয়ে করে-ছিলেন) বাপের বাড়িব দোর-গড়া মাড়াতে নিষেধ করবার কাহিনী অজানা ছিল না কারো। এ সবকিছুর সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল। অত্যন্ত স্বাভাবিক লাগত আমার। কিন্তু আমি মর্মাহত হয়েছিলাম যেদিন তাঁর মুখে শুনেছিলাম যে টেড ড্রিফিলডও নাকি কোনো এক সময় হলবর্নের কোনো একটা রেস্তোরাঁয় ওয়েটারের কাজ করতেন, যেন এই সংসারে কত ছোটো এই কাজটা। আমি জানতাম তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে জাহাজে কাজ নিয়েছিলেন। কাজটা খুব রোমাণ্টিক সন্দেহ নেই। আমি জানতাম অবশ্য বই পড়েই বেশীর ভাগ ছেলেরাই এমনি করে রোমাঞ্চকর অভিযানে বেরিয়ে পড়ে ফিরে অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা নিয়ে; কিন্তু টেড ড্রিফিলড মেডস্টোনে গাড়ি চালাতেন এবং বাকিংহামের এক বুকিং অফিসে কেরানিগিরি করতেন। একদিন রেলওয়ে আর্মস এর সম্মুখ দিয়ে সাইকেলে যেতে কথাচ্ছলেই মিসেস ড্রিফিলড বলে ফেলেছিলেন—তাঁর জীবনের তিনটি বছর তিনি কাটিয়ে ছিলেন এইখানেই। এমনভাবে কথাটা বলেছিলেন, যেন কাজটা খুবই স্বাভাবিক যেকোনো লোকের পক্ষে।

—এইখানেই আমার হাতে খড়ি। তিনি বলেছিলেন—তারপর আমি গিয়ে-ছিলাম হেভারসার্মে-এব ফেদার্স-এ। বিয়ে করবার জন্য আমি ওখানকার কাজ ছেড়ে দিয়েছিলাম।

তিনি হেসে ফেলেছিলেন। যেন এই স্মৃতিটুকু তিনি উপভোগ করেছিলেন। কী বলব বুঝতে পারিনি। অপরিসীম লজ্জায় আমি লাল হয়ে উঠেছিলাম। আর একবার একটা লম্বা পরিভ্রমণ থেকে ফিরবার পথে ফার্নে-বে-র ভিতর দিয়ে আসছিলাম। সেদিন ছিল ভীষণ গরম আর আমরা সবাই তখন খুব তৃষ্ণার্ত। তিনি প্রস্তাব করলেন ডলফিন-এ গিয়ে এক গ্লাস বিয়ার পান করলে মন্দ হয় না। বার-এর পেছনে মেয়েদের সঙ্গে তিনি অবলীলাক্রমে

গল্প জুড়ে বসেছিলেন এবং আমি শুনে শিউরে উঠেছিলাম যে একাদিক্রমে পাঁচ বছর তিনি এই ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন। দোকানের মালিক এসে যোগ দিয়েছিলেন আমাদের সঙ্গে। টেড ড্রিফিলড তাকে এক গ্লাস বিয়ার এগিয়ে দিয়ে আপ্যায়িত করেছিলেন। মিসেস ড্রিফিলড বলেছিলেন বার-এর মেয়েটিকেও এক গ্লাস দিলে হয়। তারপর বেশ কিছুক্ষণ নানারকম গল্পগুজব চলেছিল তঁাদের ভেতরে। ব্যবসাপাতি, ঘরবাড়ি, জিনিসপত্রের দাম কেমন বেড়ে চলেছে এমনি আরও কত কী! কেমন একটা উত্তেজনায় আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বেরিয়ে আসবার পর মিসেস ড্রিফিলড বলেছিলেন।

—জানো টেড, ঐ মেয়েটাকে ভারি ভালো লাগল। ওর উন্নতি হওয়া উচিত। আমি ওকে বলেছি, এখানকার জীবন খুবই কঠিন। কিন্তু খুব আনন্দময়। চোখ খুললেই সববিছু তুমি দেখতে পারবে। নিজের ঘুঁটি যদি বুদ্ধি করে চালাতে পার তবেই বাজি মাৎ। বিয়ের ফুল টুপ করে পড়বে তোমার কোলে। লক্ষ্য করলাম মেয়েটির আঙুলে এনগেজমেন্ট রিং। কিন্তু মেয়েটি বলল, ওটা পরার উদ্দেশ্য যাতে সবাই তার সঙ্গে মজা করবার সুযোগ পায়।

ড্রিফিলড হাসলেন। মিসেস ড্রিফিলড আমার দিকে ফিরে তাকালেন।

—জানো, আমি যখন বার-মেড ছিলাম খুব স্ফুর্তিতে দিন কাটাতাম। কিন্তু চিরকাল তো আর এমনি কাটান চলে না! নিজের ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হয় একটু একটু।

কিন্তু এর চেয়েও বড়ো একটা ধাক্কা অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। তখন সেপটেম্বর মাসের আধা আধি, এবং আমার ছুটিও প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। ড্রিফিলডদের নিয়ে আমি বেশ মশগুল হয়েছিলাম। কিন্তু বাড়িতে এঁদের কথা আলোচনা করবার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা কাকার তাড়নায় প্রতিহত হচ্ছিল বার বার।

—সারাদিন ধরে তোমার বন্ধুদের কথা গিলবার মতো সময় নেই আমাদের। তিনি বলেছিলেন। এর চেয়ে দরকারি অনেক কথা আছে আলোচনা করবার। কিন্তু আমার মনে হয়, যেহেতু টেড ড্রিফিলড এ অঞ্চলেরই লোক এবং প্রায় রোজই দেখা করতে আসছেন তোমার সঙ্গে কাজেই তিনি চার্চেও আসতে পারেন মাঝে মাঝে।

একদিন আমি ড্রিফিলডকে বললাম—আমার কাকার ইচ্ছে আপনি চার্চে আসুন।

—বেশ। রোজি, চল আসছে রবিবার রাত্রে আমরা চার্চে যাব।

—আমার কোনো আপত্তি নেই। রোজি বললেন।

তাঁদের আসবার কথা আমি মেরি আনকে বললাম। ভিকারেজের হোমরা চোমড়াদের বসবার আসনের ঠিক পেছনটায় আমি বসেছিলাম। ঘুরে ফিরে দেখবার সুযোগ ছিল না, কিন্তু অলিন্দের অপর দিকটায় উপবিষ্ট আমার প্রতিবেশীদের হাবভাব লক্ষ্য করে আমি বুঝতে পারলাম তাঁরাও আছেন ওখানে। পরদিন যখন আমি সুযোগ পেলাম মেরি আনকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁদের সে দেখেছিল কিনা।

—দেখেছি বই কি। বেশ গম্ভীর ভাবে মেরি আন উত্তর দিল।

—তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলে?

—আমি? হঠাৎ সে রাগে ফেটে পড়ল—তুমি বেড়িয়ে যাও ঘর থেকে। সারাদিন ধরে কেবল বিরক্ত করতে কেন আস এই ঘরে? সবসময় এরকম করলে কাজ করি কি করে?

—বেশ, আমি যাচ্ছি। আমি বললাম—আর খামোকা গজ গজ করতে হবে না তোমাকে।

—তোমার কাকা কেন যে তোমাকে ঐসব লোকগুলোর সঙ্গে মিশতে দিচ্ছে কিছুই আমি বুঝে উঠতে পারছি না। দেশশুদ্ধ সবাই ওদের ছি ছি করে। আমি অবাক হয়ে যাই, মেয়েটার লজ্জাও করে না মুখ দেখাতে। যাও, এইবার পালাও আমার কাজ আছে।

জানিনা, মেরি আন এতটা রেগে গিয়েছিল কেন। এরপর আর কখনো মিসেস ডিংফিলেডর নাম করিনি তার কাছে। কিন্তু দুই দিন বাদে কী একটা জিনিষ আনতে পাকশালের দিকে যেতে হয়েছিল আমাকে। সেকালে ভিকারেজে দুটো পাক-শাল ছিল। একটা ছোটো, যেখানে রান্না-বান্না হতো, আর একটা বিরাট বড়ো। আমার মনে হয় সেই কোন অতীত যুগে, যখন পাদরীদের বিরাট সংসার থাকত এবং সে অঞ্চলের বড়ো লোকদের ডিনার খেতে ডাকা হতো, তখন বোধহয় এটা তৈরি হয়েছিল। দিনের কাজ সেরে এই ঘরটায় বসে মেরি আন বিশ্রাম নিত, সেলাই করত। রাত্রি আটটায় আমরা ঠাণ্ডা সাপার খেতাম। কাজেই বিকেলে চা খাবার পর তার আর কোনো কাজ থাকত না। তখন প্রায় সাতটা বাজতে চলেছিল, দিনও শেষ হয়ে আসছিল। সেদিন বিকেলে এমিলির বাইরে বেড়াতে যাবার কথা। কাজেই মেরি আনকে একাই পাব আশা করেছিলাম। কিন্তু প্যাসেজ দিয়ে যেতে যেতে কাদের কণ্ঠস্বর ও হাসির আওয়াজ আমার কানে এল। ভাবলাম কেউ হয়তো দেখা করতে এসেছে মেরি আনের সঙ্গে। ঘরে আলো জ্বলছিল কিন্তু আলোটায় একটা সবুজ ঘেরা-টোপের জন্য ঘরের ভেতরটা প্রায় অন্ধকার মনে হচ্ছিল। টেবিলের উপর একটা টি-পট কয়েকটা

পেয়ালা দেখতে পেলাম। মেরি আন তার বন্ধুর সঙ্গে অবেলায় চা খাচ্ছিল। আমি দরজাটা খুলবার সাথে সাথেই কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল। আমি একজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

—গুড ইভনিং।

আমি চমকে উঠে দেখলাম মেরি আনেরবন্ধু আর কেউ নয়, মিসেস ড্রিফিলড। আমাকে অবাক হতে দেখে মেরি আন হেসে উঠল।

—রোজি গ্যান এক পেয়ালা চা খেতে এসেছিল আমার সঙ্গে। সে বলল।

—আমরা পুরনো দিনের কথা বলছিলাম।

আমার কাছে এমনি ধরা পড়ে গিয়ে—মেরি আন একটু লজ্জিত হলো, কিন্তু আমি যতটা হলাম তার অর্দ্ধেকও নয় হয়তো। মিসেস ড্রিফিলড তাঁর সেই শিশুসুলভ দুষ্টুমিতে ভরা হাসিটুকু উপহার দিলেন আমাকে। একটুও বিব্রত ভাব ছিল না তাঁর। বিশেষ কারণে তাঁর পোশাকটা আমি সেদিন লক্ষ্য করেছিলাম; তাঁর এতটা জৌলুস আমি আর দেখিনি কখনো। জামাটা একটু ফিকে নীল রঙের, কোমরের কাছে খুব আঁটো, হাত-কাটা, ঘাগড়াটাও বেশ লম্বা এবং নিচের দিকটায় একটু ফাঁপানো। মস্ত বড়ো একটা কালো রঙের স্ট্র-হ্যাট তিনি মাথায় পড়েছিলেন, টুপিটায় বেশ কয়েকটা গোলাপ ফুল পাতা এবং ডাল লাগান ছিল। রবিবার দিন নিশ্চিত তিনি এই টুপিটা পরেই চার্চে এসেছিলেন।

—ভাবলাম, মেরি আনের অবসরের অপেক্ষা করলে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত সেই অপেক্ষায়ই থাকতে হবে। তাই নিজে এসে দেখা করাটাই আমি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলাম।

বেশ অপ্রসন্নতার ভাব নিয়ে মেরি আন একটু ভুরু কুঁচকালো, কিন্তু বিশেষ অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হলো না। যেজন্য এসেছিলাম, সেই জিনিষটা আমি চাইলাম এবং অতি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। বাগানের দিকটায় চলে গেলাম এবং উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে লাগলাম। রাস্তা পর্যন্ত হেঁটে গেলাম এবং ফটকের উপর দিয়ে বাইরে তাকালাম। রাত্তির হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় আর একটি লোককে হেঁটে হেঁটে সেই দিকে আসতে দেখলাম। তার দিকে আমি তাকালাম না, কিন্তু সে একবার এগিয়ে আসছিল আবার পিছিয়ে যাচ্ছিল। মনে হলো বোধহয় সে কারো জন্য অপেক্ষা করছিল। একবার ভাবলাম হয়তো টেড ড্রিফিলড; তাই আমি ফটকের বাইরে যাব মনে করছিলাম। সেই সময় সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকে পাইপ ধরাতে দেখলাম। আমি চিনতে পারলাম, লর্ড জর্জ। ভেবে অবাক হয়ে গেলাম এখানে সে কেন, তক্ষুনি খেয়াল হলো নিশ্চয় সে মিসেস

ডিংফিলডের জন্য অপেক্ষা করছে। আমার হৃদপিণ্ড দপ্ দপ্ করতে লাগল এবং যদিও অন্ধকারের আড়ালে ছিলাম তবু একটা ঝোপের পেছনে আত্মগোপন করলাম। আরো কয়েক মিনিট অপেক্ষা করতে লাগলাম। তখনই আমি দেখলাম আমাদের বাড়ির পাশের খিড়কির দরজাটা খুলে গেল। মেরি আনের সঙ্গে মিসেস ডিংফিলড বেরিয়ে এলেন। কাঁকড়ের উপর তাঁর পায়ের আওয়াজ আমি শুনতে পেলাম। ফটকের কাছে এলেন এবং ফটকটি খুলে ফেললেন। একটু মৃদু আওয়াজ করে ফটক খুলে গেল। আওয়াজ শুনেই লর্ড জর্জ রাস্তা পেরিয়ে এল এবং মিসেস ডিংফিলড বেরিয়ে আসবার আগেই ভেতরে ঢুকে পড়ল। চট করে তার দুই বাহুর ভেতর টেনে নিয়ে মিসেস ডিংফিলডকে সে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরল। তিনি খালি একটু ছোট্ট হাসি হাসলেন।

—এই দেখো, আমার টুপিটা—ফিস ফিস আওয়াজ করে তিনি বললেন।

তাদের কাছ থেকে তিন ফুটের বেশি দূরত্বে আমি ছিলাম না। কাজেই ভয় পেলাম, পাছে তারা আমায় দেখে ফেলে। আমি ভীষণ লজ্জা বোধ করলাম। কেমন একটা উত্তেজনায় আমি থর থর করে কাঁপতে লাগলাম। প্রায় মিনিট খানেক সে এমনি বুকে চেপে রাখল মিসেস ডিংফিলডকে।

—এই বাগানটায় গেলে কেমন হয়? সে বলল। তখনো সে ফিস ফিস করেই কথা বলছিল।

—না এ বাড়ির ছেলেটা হয়তো আছে ওখানে। চলো মাঠের দিকে যাই।

তারা ফটকের ভেতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। লোকটার হাত তখনো রোজি ডিংফিলডের কোমর জড়িয়ে আছে। তারপর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার হৃদপিণ্ডটা বুকের ছাতির উপর এমনি জোরে জোরে আঘাত করছিল যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। দম নিতে পারছিলাম না। যা দেখলাম তাতে আমি এমনি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম যে আমি একেবারেই কিছু ভাবতে পারছিলাম না। কাউকে বলতে পারলে হয়তো আমার বুকের ভেতরটা কিছুটা হালকা বোধ করতাম কিন্তু এ ঘটনা এমনি গোপনীয় যে একে লুকিয়ে রাখতেই হবে আমাকে। নিজের মূল্য বৃদ্ধির কথাটা মনে আসতেই আত্মতৃপ্তিতে বেশ একটা শিহরণ আমি অনুভব করলাম। ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে চললাম এবং পাশ দরজা দিয়েই ভেতরে ঢুকে পড়লাম। দরজা-খোলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে মেরি আন ডাকল আমাকে।

—কে, মাস্টার উইলি নাকি?

—হ্যাঁ।

পাক-শালের দিকে গেলাম। মেরি আন ডাইনিংরুমে নিয়ে যাবার জন্য একটা ট্রেতে সাপার গুছিয়ে তুলছিল।

—রোজি গ্যান এখানে এসেছিল একথা আমি তোমার কাকাকে জানাব না। সে বলল।

—না, না, কখ-খনো বলো না।

—অবাক করে দিয়েছিল। যখন পাশের দরজায় টোকার আওয়াজ শুনে দরজা খুলে দেখলুম যে রোজিগ্যান, তখন আমার এমন অবস্থা হয়েছিল যে একটা পালকের ঘা খেয়েই হয়তো মুর্চ্ছা যেতাম। মেরি আন বলে সে ডাকল আমাকে। কী জন্য সে এসেছে বুঝতে চেষ্টা করবার সুযোগ না দিয়েই সে আমার সারা মুখে চুমোয় চুমোয় ভরে ফেলল। তাকে ভেতরে না ডেকে আমি পারলাম না। তারপর সে যখন ভেতরে এল এক পেয়ালা চাও দিতে হল তাকে।

তার কৃতকর্মের সাফাই দেবার জন্য মেরি আন খুবই অস্থির হয়ে উঠেছিল। মিসেস ড্রিফিলড সম্বন্ধে যেসব কথা সে আমাকে বলেছে এর পর তাকে আবার সেই মেয়েটিরই সঙ্গে এক ঘরে বসে চা খেতে এবং হাসি তামাসায় মশগুল হয়ে থাকতে দেখলে খুবই অবাক হবার কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি কিছু বললাম না।

তিনি এমন কিছু মন্দ লোক নন, তাই না ? আমি কেবল বললাম।

মেরি আন একবার মুখ টিপে হাসল। তার কালো কালো মড়া দাঁত সত্ত্বেও সেই হাসিটা কেমন একটু মিষ্টি এবং আবেগ চঞ্চল মনে হলো আমার কাছে।

—এটা যে কী আমি ঠিক বলতে পারব না, কিন্তু রোজির ভেতর কী একটা আছে যার জন্য তাকে তুমি ভালো না বেসেই পারবে না। প্রায় এক ঘণ্টা সে এখানে ছিল, আমি ওর হয়েই বলব, কিন্তু এর মধ্যে দেমাকের একটু মাত্র লেশ সে দেখায় নি। তারপর তার জামার কাপড়টার কথা সে নিজেই বলল আমাকে। প্রতি গজ তের শিলিং এগার পেন্স করে নাকি পড়েছে, আমি বিশ্বাস করেছি। দেখলাম সব কথা ওর মনে আছে। ও যখন ছোট্ট খুকুটি ছিল তখন কেমন করে আমি ওর চুল আঁচড়ে দিতাম, তারপর চা খেতে যাবার আগে কেমন করে আমি ওর হাত ধুইয়ে দিতাম, সবকিছু ওর মনে আছে। জানো, অনেক সময় ওর মা আমাদের সঙ্গে চা খাবার জন্য আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিত! সেসব দিনে ছবির মতো সুন্দর লাগত ওকে।

মেরি আন যেন অতীতের দিনগুলিতে ফিরে গেল! তার চোখে মুখে কেমন একটা ছায়া ঘনিয়ে এল।

—যাক্ গে। একটু সময় চুপ করে থাকবার পর সে বলল—জান, আমি

স্বরূপ করে বলব, রোজি অনেকের চেয়ে কোনো অংশে মোটেই খারাপ নয়। প্রলোভনের মুখে তাকে পড়তে হয়েছিল এবং আমি এও বলব, যারা তার নিন্দায় পঞ্চমুখ, তারাই সুযোগ পেলে রোজির চেয়ে ভালো কিছু করত না।

আট

হঠাৎ আবহাওয়াটা কেমন খারাপ হয়ে উঠল বেশ ঠাণ্ডা পড়ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ বৃষ্টি। আমাদের বাইরে বেরোন বন্ধ হয়ে গেল। আমি দুঃখিত হইনি। কেননা লর্ড জর্জের সাথে যে অবস্থায় তাঁকে দেখেছিলাম, তারপর মিসেস ড্রিফিলডের মুখের পানে আমি কী করে তাকাব সেই আমার একটা ভাবনা ছিল। আমি যত আঘাত পাইনি, তার চেয়ে বেশী অবাক হয়েছিলাম। কিছুতেই বুঝতে পারলাম না এও কী করে সম্ভব হলো যে ঐ বৃদ্ধ লোকটির চুম্বন তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন। আর এমন একটা উদ্ভট কল্পনা আমার মনের পর্দায় ছায়া ফেলে গেল যে হয়তো বা অতিরিক্ত উপন্যাস পাঠ থেকেই এর উদ্ভব। হয়তো বা লর্ড জর্জ কোনো উপায়ে তাঁকে নিজের হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছিল এবং হয়তো কোনো একটা ভীতি বহুল গোপন শক্তির প্রভাবে সে তার ঘৃনিত আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করতে তাঁকে বাধ্য করেছিল। আমার কল্পনা ভীষণতম সম্ভাবনার ছবি এঁকে চলতে লাগল। বহু বিবাহ, খুন জালিয়াতি এমন আরো কত কি! নাটক উপন্যাসের ভিলেনদের ভেতর খুব কমই আমি দেখেছি যারা এমনি যে কোনো একটি অপরাধের ভয় দেখিয়ে অসহায় নারীকে নিজের মুঠোয় রাখতে অসফল হয়েছে। হয়তো মিসেস ড্রিফিলড কোনো একটা বাজিতে দান ফেলেছিলেন, কী সে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি কখনো, কিন্তু জানতাম এর পরিণাম অতি ভীষণ। কল্পনার পাখা উড়িয়ে তাঁর মনের কোনো এক নিভৃত বেদনার ছবি নিয়ে আমি নিজের মনে খেলা করতাম। ভাবতাম রাতের পোশাকে কত সুদীর্ঘ নিদ্রাহীন রাত্রি তিনি কাটিয়ে দিতেন জানলার ধারে বসে বসে। তাঁর আলুলায়িত কুন্তল পরতো হাঁটুর উপর পর্যন্ত, ভোরের প্রতীক্ষায় কাটত তাঁর প্রতিটা বেদনা-মধুর মুহূর্ত। এবং মনে করতাম আমি নিজে (সপ্তাহে মাত্র ছয়টি পেনির করা গোঁফ, লৌহ-কঠিন পেশীবহুল সৌখিন সান্ধ্য পোশাক পরা মালিক পনর বছর বয়সের এক কিশোর মাত্র নয়, মোম দিয়ে কঠিন করা দীর্ঘ দেহ এক সাবালক পুরুষ) অপরিসীম সৌর্য বীর্যের সহযোগে ঐ জালি-য়াতের কঠিন বাহু-বন্ধন থেকে তাঁকে মুক্ত করতে এগিয়ে গেছি। অথচ এও মনে হলো না যে অনিচ্ছার সঙ্গে তিনি লর্ড জর্জের বাহু বন্ধনে ধরা দিয়েছিলেন এবং তাঁর ঐ অদ্ভুত হাসিটার প্রতিধ্বনি কিছুতেই আমার

কান থেকে মিলিয়ে গেল না। ঐ হাসিতে এমন একটা সুর ছিল যা আমি এর আগে আর শুনিনি। কেমন একটা নিঃশ্বাস রোধকারী অনুভূতি আমার সকল ইন্দ্রিয়কে বিবশ করে ফেলেছিল। ছুটির বাকি কদিনের ভেতর মাত্র আর একবার ড্রিফিলডদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। শহরে গিয়ে হঠাৎ একদিন আকস্মিক ভাবে তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা দাঁড়িয়ে পড়লেন আমাকে দেখে এবং কথা বলতে লাগলেন আমার সঙ্গে। আবার আমি হঠাৎ কেমন সঙ্কোচ বোধ করলাম, কিন্তু মিসেস ড্রিফিলডের দিকে মুখ তুলে তাকাতে কেমন একটা সরমে আমার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল, কারণ তাঁর চেহারায় এমন কিছু দেখতে পেলাম না যা থেকে তাঁর মনের এমন কোনো গোপন অপরাধের আভাস মেলে। তাঁর নীল চোখের নরম চাউনিতে তিনি তাকালেন আমার দিকে। আমি দেখলাম চপল শিশুর দুষ্টুমিতে ভরা সেই চাউনি। অনেক সময় তিনি তাঁর মুখটা একটু খুলে রাখতেন। মনে হতো এই বুঝি একটু হাসি ফুটে উঠল। তাঁর ঠোঁট দুটিও ছিল যেমন টস টসে আবার তেমনি লাল। তাঁর মুখমণ্ডলের উপর কেমন একটুখানি সরলতা এবং সততার ছাপ ফুটে উঠত, আবার তেমনি একটা বিচিত্র স্পষ্টবাদিতাও দেখতাম, যদিও তখন ঠিক মনের ভাব প্রকাশ করতে পারতাম না, তবুও বেশ গভীর ভাবে অনুভব করতাম। যদি কথায় প্রকাশ করতাম তাহলে তখন হয়তো বলতাম পাশার চোখের মতো স্পষ্ট তাঁর চোখের দৃষ্টি। কাজেই এ অসম্ভব যে লর্ড জর্জের সঙ্গে একটা কিছু ছিল তাঁর। এর পেছনে কোনো যুক্তি এবং ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে। আমার চোখ যা দেখেছিল তাও আমি বিশ্বাস করলাম না।

তারপর আমার স্কুলে ফিরে যাবার দিন এল। গাড়িতে আমার বাক্স বিছানা চলে গিয়েছিল, আমি পায়ে হেঁটে স্টেশনে গিয়েছিলাম। স্টেশনে গিয়ে আমাকে তুলে দিয়ে আসতে কাকীমাকে যেতে দিইনি, একা একা যাওয়া আমি পৌরুষ মনে করলাম, কিন্তু যেতে যেতে মনটা কেমন ভারি হয়ে উঠল। সেই রেলওয়ে লাইনটা টেরকানবারি যাবার একটা শাখা লাইন। আর স্টেশনটাও ছিল শহরের অপর প্রান্তে, ঠিক সমুদ্রের ধারে। টিকিট কেটে একখানা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় এক কোণে গিয়ে আমি বসলাম। হঠাৎ একটা গলার স্বর আমার কানে এল—ঐ তো সে! মিঃ এবং মিসেস ড্রিফিলড, হৈ হৈ করতে করতে হুড় মুড় করে আমার কামরায় এসে ঢুকে পড়লেন।

—আমরা ভাবলাম তোমাকে উঠিয়ে দিতে আসা আমাদের উচিত। মিসেস ড্রিফিলড বললেন—খুব খারাপ লাগছে তোমার, কেমন?

—উঁহু, না তো!

—তবে বেশিক্ষণ থাকবে না। আবার যখন খ্রীষ্টমাসের সময় আসবে দেখো, কী মজায় কাটাব আমরা! তুমি স্কেটিং জান?

—না।

—আমি জানি। তোমায় শিখিয়ে দেব।

তাঁর খুশি মনের প্রাণ প্রাচুর্য আমার মনকেও চাঙা করে তুলল। আবার তাঁরা আমাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে স্টেশন পর্যন্ত এসেছেন এই কথাটা ভেবে আমার গলা ভারি হয়ে উঠল।

—এবার বোধহয় প্রাণ ভরে ফুটবল খেলতে পারব। আমি বললাম।

—স্কুলের দ্বিতীয় পঞ্চদশ টিমে নিশ্চয় এবার স্থান পাব।

মমতা ভরা উজ্জ্বল চাউনিতে মিসেস ডিংফিলড তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। তাঁর লাল টসটসে ঠোঁট দুটিতে এক ফালি মিষ্ট হাসি চিক চিক করে উঠল। তাঁর ঐ হাসিতে এমন কিছু ছিল যা আমি বড়ো ভালোবাসতাম। এবং তাঁর কণ্ঠস্বরে—হাসির হিল্লোল, কান্নার উচ্ছ্বাস থেকে থেকে কেঁপে উঠল যেন। একটি পলকের জন্য আমার মন ক্ষীণ আতঙ্কে শিউরে উঠল। মনে হলো তিনি হয়তো চুমু খাবেন আমাকে। আমার সহজ বুদ্ধিও হারিয়ে গেল। তিনি বক্ বক্ করে যেতে লাগলেন। বড়রা সাধারনতঃ ছোটদের নিয়ে যেমন করে তিনিও তেমনি মজা করতে লাগলেন আমাকে নিয়ে, আর ডিংফিলড দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। একটিও কথা নেই তাঁর মুখে। চোখে একটু ক্ষীণ হাসির আভা নিয়ে তিনি তাকালেন আমার দিকে। ধীরে ধীরে দাঁড়িতে হাত বুলোতে লাগলেন। গার্ডের কর্কশ বাঁশি বেজে উঠল, একটা সবুজ নিশাণ উড়িয়ে দিল। মিসেস ডিংফিলড আমার একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে একটু ঝাকুনি দিলেন। ডিংফিলড এগিয়ে এলেন আমার কাছে।

—গুড বাই। তিনি বললেন—এই নাও, এটা তোমার জন্য।

একটা ছোট্ট প্যাকেট তিনি আমার হাতে গুঁজে দিলেন। হুস হুস করে ট্রেন ছেড়ে দিল। খুলে দেখলাম টয়লেট পেপারে মোড়া দুখানা হাফ ক্রাউন। আমার চুলের গোড়া পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। বাড়তি আরো পাঁচ শিলিং হাতে পেয়ে আমি খুব খুশী হয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু ডেভ ডিংফিলড আমাকে টিপস্ দিতে সাহস করলেন এই কথা ভেবে লজ্জা অপমানে রাগে আমার সমস্ত শরীর রিরি করে উঠল। তাঁর কাছ থেকে কিছু হাত পেতে নেওয়া অসম্ভব আমার পক্ষে। তাঁদের সঙ্গে আমি সাইকেল চালিয়েছি সত্যি নৌকোয় চড়েছি, কিন্তু তিনি এমন কিছু সাহেব হয়ে উঠেন নি (এই

শব্দটা আমি মেজর গ্রীন কোর্টের কাছ থেকে শিখেছিলাম) এবং এমনি করে আমাকে পাঁচ শিলিং দেওয়া ভীষণ অপমানকর মনে হলো আমার। কোনো কথা না বলে ওটা ফিরিয়ে দেব আমি ভেবেছিলাম। নির্বাক থেকে তাঁকে বুঝিয়ে দিতে চাইছিলাম তাঁর ঐ স্পর্দ্ধা কত উত্যক্ত করেছিল আমাকে; কিন্তু ভাবতে ভাবতে মাথায় একটা স্পষ্ট এবং গুরু গম্ভীর চিঠির বয়ান ঠিক করে ফেললাম। তাঁর ঐ বদান্যতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ দেব তাঁকে, কিন্তু এও থাকবে চিঠিতে যে তাঁর মতো লোকের পক্ষে এটা বুঝা উচিত যে একজন অপরিচিত অনাত্মিয়ের কাছ থেকে কোনো ভদ্রলোক কোনো কিছু নিতে পারে না এমনি করে। দু তিন দিন ধরে আমি শুধু এই কথাটাই ভাবতে লাগলাম এবং প্রতিদিন মনে হতে লাগল ঐ দুটি হাফ ক্রাউন ফিরিয়ে দেওয়া কত কঠিন আমার পক্ষে। আমি নিশ্চিত অনুভব করলাম ভালো মনে করেই ড্রিফিলড ওটা করেছিলেন, এবং সত্যি সাধারণ আদপ-কায়দা তাঁর জানা ছিল না বোধহয়। ফেরত পাঠিয়ে তাঁকে শুধু আঘাতই দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত ওটা আমি খরচ করে ফেললাম। কিন্তু ঐটুকু উপহারের বিনিময়ে ড্রিফিডকে কোনো রকম ধন্যবাদ না জানিয়ে আমি আমার আহত আত্মাভিমান প্রশান্ত করলাম।

যখন খ্রীটমাস এল এবং আমিও ছুটিতে ব্লেকস্টেবল ফিরে এলাম তখন কিন্তু এই ড্রিফিলড পরিবারের সঙ্গে প্রথম দেখা করবার জন্য আমার মন আঁকু পাঁকু করে উঠল। যে বাইরের দুনিয়া আমার দিবাস্বপ্ন এবং উৎকণ্ঠিত কৌতূহলকে সঞ্চারিত করতে শুরু করেছিল, সেই দুনিয়ার সঙ্গে এই ছোট্ট এঁদো পল্লীর ভেতর শুধু তাঁদেরই যেন একটা যোগসূত্র ছিল। কিন্তু তাঁদের বাড়ীতে গিয়ে দেখা করবার জন্য সঙ্কোচ লজ্জা আমি কাটিয়ে উঠতে পারলাম না। মনে মনে ঠিক করলাম গ্রামের বাইরে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করলেই ভালো হবে বোধহয়। কিন্তু তখন আব-হাওয়া ছিল ভারি বিশ্রী।

দু-চারজন মহিলা পথে বেরিয়েছিল। তাদের ঘাগড়ায় হাওয়া লেগে ঝড়ের মুখে পাল তোলা মেছো ডিঙির মতো তারা ভেসে চলছিল। কনকনে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিল ঝড়ের বেগে। যে আকাশ গ্রীষ্মকালে প্রীতির আলিঙ্গনে জড়িয়ে রাখত গ্রামটিকে সেই আকাশই যেন একটা অবগুণ্ঠনে ঢেকে দিয়েছিল সারাটা পৃথিবীকে। আকস্মিক ভাবে ড্রিফিলডদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল খুব কম এবং একদিন চা খাবার পর বুকে সাহস এনে নিজেই বেড়িয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। স্টেশন পর্যন্ত রাস্তাটা একেবারে ঘুরঘুটি অন্ধকার, কিন্তু সেখানে রাস্তার

দু চারটা অস্পষ্ট আলো সহজ করছিল পথ চলাকে। সদর রাস্তা ছাড়িয়ে পাশের গলিতে একটা ছোটো দোতলা বাড়িতে তাঁরা থাকতেন। হলদে রঙের ইঁট দিয়ে তৈরি বাড়িটা, কয়েকটা নিচু নিচু জানলাও দেখেছিলাম। আমি দরজায় ধাক্কা দিলাম। তক্ষনি বাড়ির একটি চাকরানী এসে সদর দরজা খুলে দিল; মিসেস ডিফিলড বাড়ি আছেন কিনা আমি জিজ্ঞাসা করলাম। কেমন একটা অনিশ্চিত অর্থহীন দৃষ্টিতে সে তাকাল আমার দিকে। ভেতরে গিয়ে দেখে আসছে বলেই প্যাসেজের ভেতর আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে চলে গেল। পাশের ঘরে গলার আওয়াজ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু চাকরাণী দরজাটা খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল এবং সেও ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। কেমন একটু রহস্যজনক লাগল আমার কাছে। কাকার বন্ধুদের বাড়িতে দেখেছি ঘরে চুল্লি না থাকলেও কেউ ঢুকবার সঙ্গে আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হতো, এবং অতিথিকে প্রথমেই ড্রয়িং রুমে নিয়ে গিয়ে বসানো হতো। একটু পরেই দরজা খুলে গেল এবং ডিফিলড বেরিয়ে এলেন। তখন প্যাসেজের ভিতর একটুখানি অস্পষ্ট আলো জ্বলছিল। প্রথমেই কে এসেছে তিনি বুঝতে পারলেন না কিন্তু একটুক্ষণ বাদেই তিনি আমাকে চিনতে পারলেন।

—ও তুমি! আমরা ভাবছিলাম কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। বলেই তিনি ডাকতে লাগলেন,—রোজি, দেখবে এসো, শ্রীমান আসেনডেন এসেছে। এবার একটা চিৎকার শোনা গেল। নিঃশ্বাস নেবার মতো অবসর নেবার আগেই মিসেস ডিফিলড এসে আমার হাত চেপে ধরলেন।

—এসো, এসো, ভেতরে এসো। কোট খুলে ফেল। ওয়েদারটা কী বিশ্রী, তাই না? নিশ্চয় তোমার আসতে কষ্ট হয়েছে।

তিনি আমাকে কোট খুলতে সাহায্য করলেন এবং মাফলারটা নিজের হাতেই খুলে দিলেন। টুপিটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ঘরের ভেতর টেনে নিয়ে গেলেন আমাকে। ঘরের ভেতরটা কেমন গরম এবং গুমোট লাগছিল। খুব ছোট্ট ঘর। আসবাব দিয়ে একেবারেঠাসা। চুল্লিতে আগুন জ্বলছিল। ওদের বাড়িতে গ্যাসের ব্যবস্থা ছিল। আমাদের ভিকারেজে ছিল না ফ্রস্টেড কাঁচের ডোমের ভেতরে তিনটি আলো থেকে কর্কশ আলো বেরিয়ে এসে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। তামাকের ধোঁয়ায় ঘরটা অচ্ছন্ন হয়েছিল। তীব্র আলোতে ঝলমলিয়ে এবং তাঁদের অভ্যর্থনার আতিশয্যের বহর দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। তাই প্রথমে আমি লক্ষ্য করিনি। আমি ঘরে ঢুকবায় সাথে সাথে কারা দুজন উঠে দাঁড়াল। পরে দেখলাম তাদের একজন

আমাদের কিউরেট মিঃ গলওয়ে, অপর জন লর্ড জর্জ কেম্প। আমার মনে হলো যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে কিউরেট আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন।
—কেমন আছ? মিসেস ড্রিফিলড খান কয়েক বই দিয়েছিলেন, সেগুলো ফিরিয়ে দিতে এসেছিলাম। তারপর মিসেস ড্রিফিলড একটু চা খেতে অনুরোধ করলেন।
আমি ঠিক দেখলাম না, যেন অনুভব করলাম কেমন একটা বিদঘুটে দৃষ্টিতে ড্রিফিলড তাকাল তার দিকে। নিরপাপবিদ্ধতার ধনকুবের সম্বন্ধে কী একটা কথা তিনি বললেন, একটা উদ্ধৃতি বলে আমার মনে হলো, কিন্তু এর অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। মিঃ গলওয়ে হাসতে লাগলেন।
—ওসব সম্বন্ধে আমি কিছু জানিনা। মিঃ গলওয়ে বললেন। তাহলে পাবলিকান বা ফিসারসদের বেলায় কি?
কথাটাকে কুরুচির পরিচয় বলে আমার মনে হলো, কিন্তু পরক্ষণেই লর্ড কেম্প আমাকে নিয়ে পড়ল। কোনো দ্বিধা বা সঙ্কোচ ছিল না তার কথায়।
—তারপর ইয়ংম্যান, ছুটিতে বাড়ি এলে বুঝি? কিন্তু বেশ জোয়ান মরদ হয়ে উঠেছ দেখছি! এর মধ্যেই নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তার করমর্দন করলাম। মনে হলো, না এলেই বোধহয় ভালো করতাম।
—বেশ কড়া করে এক পেয়ালা চা দিই তোমাকে, কি বল? মিসেস ড্রিফিলড আমাকে বললেন।
—থাক, আমি চা খেয়ে এসেছি।
—আবার একটু খাও, আপত্তি কী? লর্ড জর্জ বলল। এমন ভাবে কথাটা উচ্চারণ করল যেন সে ই বাড়ির মালিক—তোমার মতো জোয়ান ছেলের পক্ষে আরো দু এক টুকরো রুটি মাখন আর জ্যাম মোটেই তেমন কিছু বেশি হবে না। তাছাড়া মিসেস ডি তাঁর মিষ্টি হাত দিয়ে রুটি কেটে দেবেন। চায়ের সরঞ্জাম তখনো টেবিলেই ছিল এবং সবাই চারধারে গোল হয়ে বসেছিল। আমার জন্য আর একখানা চেয়ার আনা হলো এবং মিসেস ড্রিফিলড এক টুকরো কেক দিলেন আমাকে।
একখানা গান শুনিয়ে দিতে এইমাত্র আমরা টেডকে খোসামুদ করছিলাম। লর্ড জর্জ বলল—কই টেড, এসো শুরু করে দাও।
—না, না আগে 'First wo m›ppod tho floor with Him' এই খানা গাও।
—তোমরা বিশেষ মন-টন না দিলে আমি দুখানাই গাইব। ড্রিফিলড বলল।
বেঞ্জো তুলে নিলেন, কটেজ পিয়ানোর উপর ওটা রাখা ছিল। সুর দিয়ে গাইতে

শুরু করলেন। বেশ দেরাজ গলা ছিল তাঁর। গান শোনার অভ্যাস ছিল। ভিকারেজে যখন কোনো চা পার্টি হতো অথবা মেজরদের কিংবা ডাক্তারের ওখানে কোনো পার্টিতে যখন আমি যেতাম, দেখতাম সবাই তাঁদের যন্ত্র সঙ্গে নিয়ে আসতেন। সবাই অবশ্য ওগুলো হল ঘরে রেখে আসতেন। যাতে কেউ না মনে করে যে গাইবার বাজাবার অনুরোধ পাবার আশাতেই তাঁরা ওগুলো নিয়ে আসতেন। কিন্তু চা খাবার পর গৃহকর্ত্রী জিজ্ঞাসা করতেন কেউ তাঁদের যন্ত্র এনেছেন কিনা। বেশ সঙ্কোচ নিয়ে তাঁরা স্বীকার করতেন, এবং ভিকারেজ হল থেকে আমি নিয়ে আসতে যেতাম। কখনো কোনো তরুনী মহিলা হয়তো বলতেন তিনি গান-বাজনা ছেড়ে দিয়েছেন তাই কিছু সঙ্গে আনেন নি, কিন্তু তাঁর মা আসল কথা ফাঁস করে দিতেন। বলতেন তাঁরা এনেছেন। যখন গান শুরু হতো তখন সেগুলো নেহাত হাসি তামাসা হতো না।

একবার এসেমবলি রুমস-এ বাৎসরিক কনসার্ট উপলক্ষ স্মিথসন একখানা কৌতুক সংগীত গেয়েছিল, যদিও হলের পেছন দিককার শ্রোতার দল প্রশংসায় হাততালি দিয়েছিল, কিন্তু সাধারণ ভদ্রলোকদের আদৌ ভালো লাগেনি। কোনোরকম হাসি কৌতুক ওঁরা খুঁজে পাননি। হয়তো ছিলও না। সে যাহোক, পরের বৎসর কনসার্টের আগেই গান-টান সম্বন্ধে আরও একটু সতর্ক হবার জন্য স্মিথসনকে বলে দেওয়া হয়েছিল (মিঃ স্মিথসন মনে রাখবেন ওখানে মহিলারাও এসে থাকেন।) তাই সেবার সে 'Death of Nelson' গানখানা গেয়েছিল। দ্বিতীয় গান যেটা ডিফিলড গাইলেন সেটা ছিল একটা সমবেত সঙ্গীত। কিউরেট এবং জর্জ বেশ আনন্দের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

গানটা শেষ হলে পর এসব পার্টির রীতি অনুযায়ী সৌজন্য রক্ষার জন্য মিসেস ডিফিলডের দিকে আমি ফিরে তাকালাম।

—আপনিও গাইতে পারেন বোধহয়? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—পারি, তবে আমার গান শুনলে দুধ ছানা কেটে যায়, তাই কেউ আমাকে কখনও গাইতে দেয় না।

ডিফিলড বেঞ্জো রেখে দিয়ে পাইপ ধরালেন।

—তারপর টেড, তোমার বইগুলো কত দূর এগুলো?

বেশ আন্তরিকতার সংগে লর্ড জর্জ বলল।

—চলছে। অনেকটা এগিয়েছি।

—আমাদের সেই চির পুরাতন টেড আর তার চিরসঙ্গী বই! বলতে বলতে লর্ড জর্জ হেসে উঠল—আচ্ছা, কোথাও স্থায়ী ভাবে বসে সম্মানজনক

একটা কিছু তুমি করনা কেন বলত ? আমার অফিসে একটা কাজ দিতে পারি তোমাকে।

—থাক, আমি বেশ আছি।

—জর্জ, ওকে ছেড়ে দাও। মিসেস ড্রিফিল্ড বললেন—ও লিখে আনন্দ পায়, তাই আমি বলি যাতে ও খুশী হয় তাই ওকে করতে দিতে আপত্তি কি ?

—কিন্তু জানো, তোমাদের এইসব বই-টইয়ের ব্যাপারে আমি আদৌ বিজ্ঞ নই তাছাড়া আমি......। জর্জ কেম্প আরও কি বলতে যাচ্ছিল।

—বেশতো, তাহলে এব্যাপারে আর কোনো কথা বলো না। বাধা দিয়ে একটু হেসে ড্রিফিলড বললেন।

—Fair Hakins এর মতো একখানা বই লিখে লজ্জা পাবার কিছু নেই আমি মনে করি। মিঃ গলওয়ে বললেন—এবং সমালোচকরা কি বলল তাতে কান দেওয়াও আমি উচিত মনে করি না।

—টেড, ছেলেবেলা থেকে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়, কিন্তু কোনোদিন আমি তোমার একখানা বইও পড়তে পারিনি। যদিও আমার উচিত ছিল। জর্জ কেম্প বলল।

—থাক, এসব বই টইয়ের কথা এখন রাখ! মিসেস ড্রিফিলড বললেন।

—আমাদের একখানা গান শুনিয়ে দাও টেড।

—আমি এবার উঠব। কিউরেট বলল। আমার দিকে ফিরে তাকালেন। চলো আমরা একসঙ্গে হেঁটে হেঁটে যাই। ড্রিফিলড, আমাকে আরও কিছু পড়তে দেবেন নাকি ?

ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের ওপর স্তূপাকৃতি কতকগুলো নতুন বই ড্রিফিলড দেখিয়ে দিলেন। যেটা ইচ্ছে নিয়ে যান।

—সর্বনাশ, এতগুলো বই। লোভাতুর দৃষ্টিতে বইগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি বললাম।

—সব বাজে বই। রিভিউ করবার জন্য পাঠিয়েছে। ড্রিফিলড বললেন।

—আপনি কি করেন এতগুলো দিয়ে।

—টেরকানবারিতে নিয়ে গিয়ে যা পাই তাইতেই বেচে দিই। অন্তত মাংসের দামটা উঠে আসে।

যখন বেরিয়ে এলাম, কিউরেট এবং আমি, তাঁর বগলে খান তিন চার বই, তিনি বললেন আমাকেঃ—এ বাড়িতে আসছ তোমার কাকাকে বলে এসেছিলে ?

—না, এমনি বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, হঠাৎ মনে হলো একটু ঘুরে যাই।

কথাটা কতকটা সত্যির অপলাপ বটে। কিন্তু গলওয়েকে এটা বলবার একটুও প্রয়োজন মনে করিনি যে, যদিও আমার বয়স হয়েছিল তবু কাকা এটা কম

বুঝতেন যে, যাদের সম্বন্ধে তাঁর বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবার বিরোধিতা করতে যথেষ্ট সামর্থ্য ছিল ত'ার।

—তুমি যদি কিছু না বল, আমি আর কিছু বলব না তোমাদের বাড়িতে। ডি্ফিলডরা সত্যি অতি ভালো মানুষ, কিন্তু তোমার কাকা এ'দের ঠিক সমর্থন করেন না।

—আমি জানি। আমি বললাম। সত্যি এটা ভারি বিশ্রী।

—তবে এ'রা খুবই সাধারণ মানুষ এ সত্যি, কিন্তু ডি্ফিলড খুব খারাপ লেখেন না। যে পরিবেশে তাঁর জন্ম সেই কথা ভাবলে সত্যি অবাক হতে হয় তিনি লেখক হলেন কেমন করে।

বুঝতে পেরে খুশী হলাম কোথায় আমি দাঁড়িয়ে আছি। ডি্ফিলড পরিবার-এর সঙ্গে তাঁরও বন্ধুত্ব আছে এই কথাটা কাকাকে জানতে দিতে মিঃ গলওয়ে নারাজ। আমি নিশ্চিন্ত হলাম কোনো মতেই তিনি আমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবেন না।

ভিকটোরিয় যুগের শেষাংশে খ্যাতিমান ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে যিনি এতকাল পর্যন্ত স্বীকৃতি পেয়ে এসেছেন, ত'ারই সম্বন্ধে আমার কাকার একজন নগণ্য কিউরেট সেকালে যেরকম পৃষ্ঠপোষকতার শুর নিয়ে কথা বলতেন সত্যি তাতে হাসি পেত। কিন্তু ব্লেকস্টেবলে ত'ার সম্বন্ধে সে যুগে এভাবেই সবাই কথা বলত। একদিন আমরা মিসেস গ্রিনকোর্টের বাড়িতে চা খেতে গিয়েছিলাম। ত'ার এক তুতো বোন, কোনো একজন অক্সফোর্ডের খেতাবধারীর পত্নী, তখন ত'ার বাড়িতে ছিলেন কিছুদিন। শুনেছিলাম তিনি নাকি খুব শিক্ষিতা এবং কৃষ্টি সম্পন্না। ত'ার নাম ছিল মিসেস এনকোমবে। ছোটোখাটো দেখতে মহিলাটি। বেশ একটু কৌতূহল দীপ্ত কুঞ্চন রেখাঙ্কিত ত'ার মুখখানা। আমরা দেখে বেশ একটু বিস্মিত হয়েছিলাম। কারণ ত'ার মাথার পাকা চুল ছোটো করে কাটা ছিল এবং কালো সার্জের তৈরী ঘাগরা এত নিচে নামান ছিল যে তাঁর চৌকো মুখ জুতোর গোড়ালির নিচ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছিল। রেকস্টেবলে নব্য মহিলা এই আমরা প্রথম দেখলাম। আমরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম, তক্ষুণি আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয়ে উঠলাম। কারণ তাঁকে খুবই ইনটেলেকচুয়াল মনে হলো এবং আমরা নিজেদের অত্যন্ত সঙ্কুচিত বোধ করলাম। পরে অবশ্য আমরা সবাই তাঁকে বিদ্রূপ করতাম এবং কাকা কাকীমাকে একদিন বলেছিলেন—দেখো এটা আমার সৌভাগ্য যে তুমি খুব চালাক নও, অন্তত এর হাত থেকে আমি রেহাই পেয়েছি। কাকীমাও খেলাচ্ছলে কাকার চটি জোড়াটা আগুণের ধারে দিয়ে গরম করছিলেন। নিজের পায়ের বুট জুতোর উপর পরে বলেছিলেন—এই দেখো আমিও

একজন নব্য মহিলা। তারপর আমরা সবাই বলেছিলাম—মিসেস গ্রিণকোর্ট ভারি মজার লোক। এরপর যে কী খেল তিনি দেখাবেন বলা কঠিন। তবে তিনি অবিশ্যি পুরোমাত্রায় স্বয়ং-পূর্ণ নন। তবু আমরা কিন্তু ভুলতে পারতাম না যে তাঁর পিতা হাঁড়ি-কলসি তৈরী করতেন এবং ঠাকুরদা কারখানায় মজুরী করতেন।

তবে মিসেস এনকোমবের মুখে তাঁর পরিচিত লোকদের গল্প শুনতে সবাই আমরা বেশ আগ্রহ বোধ করতাম। আমার কাকাও অক্সফোর্ডের ছাত্র ছিলেন। যাদের কথা তিনি জানতে চাইতেন ত'াদের প্রায় সবাই মৃত মনে হলো। মিসেস এনকোমবে মিসেস হামফি্র ওয়ার্ডকে চিনতেন, এবং 'রবার্ট এলস্‌মিয়ার' বইখানা খুব প্রশংসা করতেন। কাকা ঐ বইটিকে খুবই জঘণ্য মনে করতেন, এবং তিনি আশ্চর্য হয়েছিলেন মিঃ গ্লাডস্টোন, যিনি নিজেকে অন্তত খ্রীস্টান বলে মনে করতেন, কেমন করে এই বইটিকে প্রশংসা করতে পারলেন। তাদের সবারই স্বপক্ষে অবিশ্যি যুক্তি ছিল! কাকা বলতেন, ত'ার মতে এই বইটা মানুষের চিন্তাধারা এবং মতবাদকে বিক্ষিপ্ত করবে এবং এমন সব উদ্ভট আইডিয়া মাথায় চাপিয়ে দেবে যেগুলোর অভাবই মঙ্গল তাদের পক্ষে! মিসেস এনকোমবে জবাব দিয়েছিলেন, মিসেস হামফি্র ওয়ার্ডকে জানলে হয়তো কাকা এরূপ বলতেন না। তিনি খুবই উঁচু দরের মহিলা মিঃ ম্যাথ্যু আর্নলড-এর ভাগ্নী। বইখানা সম্বন্ধে যা কিছু বলুন না (অবশ্যি মিসেস এনকোমবেও স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন যে বইটার কোনো কোনো অংশ বাদ দিলে হয়তো ভালো হতো) একটা মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই মহিলা বইটি লিখেছিলেন। মিসেস এনকোমবে মিস ব্রাউটনকেও চিনতেন। তিনি বিশিষ্ট পরিবারের মেয়ে ছিলেন, এবং এটা খুব আশ্চর্য যে এইসব বই তিনি লিখেছিলেন।

—আমি এগুলোতে কোনো দোষ দেখি না। ডাক্তার পত্নী মিসেস হেফোর্থ বলেছিলেন—আমার বেশ ভালো লাগে।

—আপনার মেয়েদের ওগুলো পড়তে দেবেন আপনি? মিসেস এনকোমবে জিজ্ঞাসা করলেন।

—এখনো নয় অবিশ্যি। মিসেস হেফোর্থ বললেন, কিন্তু যখন বিয়ে হয়ে যাবে তখন আপত্তি করা উচিত হবে না নিশ্চয়।

—তাহলে শুনতে আপনার আগ্রহ হবে, মিসেস এনকোমবে বললেন, গত ইস্টারের সময় আমি যখন ফ্লোরেন্সে ছিলাম তখন ওইদার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।

—ও অন্য ব্যাপার। মিসেস হেফোর্থ জবাব দিলেন—আমি বিশ্বাস করতে

পারি না কোনো ভদ্রমহিলা ওইদার কোনো বই পড়তে পারেন।
—কৌতূহলবশে আমি কিন্তু একখানা পড়েছিলাম, মিসেস এনকোমবে বললেন, আমি নিশ্চয় বলব, একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলার চেয়ে একজন ফরাসী ভদ্রলোকের কাছে আপনি যতটুকু প্রত্যাশা করবেন এ যেন তার চেয়েও বেশি কিছু।
—কিন্তু আমি যতটুকু জানি তিনি আদৌ ইংরেজ নন। আমি ত'ার প্রকৃত নাম মাদমোয়াজেল দ্য লা বামি বলেই তো শুনেছি।
এই সময় মিঃ গলওয়ে এডওয়ার্ড ড্রিফিলডের নাম উল্লেখ করলেন।
—জানেন বোধহয়, আমাদের এখানেও একজন লেখক আছেন, তিনি বললেন।
—আমরা বিশেষ গর্ব অনুভব করি না তাঁকে নিয়ে। মেজর বললেন—লোকটি মিস উলফের বেলিফের ছেলে এবং একটি বারমেডকে বিয়ে করেছে।
—তিনি লিখতে জানেন? মিসেস এনকোমবে জিজ্ঞাসা করলেন।
—তিনি ভদ্রলোক নয় এ আপনি বলতে পারেন। কিউরেট বললেন—কিন্তু যেসব প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে তাঁকে লড়াই করতে হয়েছিল, সেসব ভাবলে ত'ার হাত দিযেও এমনি সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে এটা খুবই বিস্ময়ের বিষয়।
—লোকটি আমাদের উইলির বন্ধু। কাকা বললেন।
সবাই তাকালো আমার দিকে। আমি অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলাম।
—গত গবমের ছুটিতে দুইজন একসঙ্গে সাইকেল চড়ত, ছুটি শেষে উইলি স্কুলে ফিরে যাবার পর আমি লাইব্রেরী থেকে ওর লেখা একখানা বই আনিয়ে পড়েছিলাম, কী আছে বইটিতে শুধু দেখবার জন্য। কেবল প্রথম খণ্ড পড়েছিলাম, তারপর বইটা ফেরত দিয়েছিলাম। লাইব্রেরিয়ানকে খুব কড়া একখানা চিঠি লিখেছিলাম। পরে শুনে খুশী হয়েছিলাম যে বইখানা প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আমার নিজের সম্পত্তি হলে তক্ষুণি ওটাকে আগুণে দিয়ে দিতাম।
—আমিও একখানা বই পড়েছি। ডাক্তার বললেন—আমার আগ্রহ জেগেছিল কেননা এখানকার পরিবেশ নিযে বইটা লেখা, এবং কোনো চরিত্রও আমাদের চেনা। তবে আমার ভালো লেগেছিল আমি বলতে পারি না, একটু বেশী রকম অনাবশ্যক অশ্লীল মনে হয়েছিল।
—আমি ত'াকে কথাটা বলেছিলাম, মিঃ গলওয়ে বললেন। তিনি বলেছিলেন কয়লাখনির মজুর, যারা নিউক্যাসেলে কাজ করতে যায়, অথবা জেলেরা এবং খামারের মজুর, ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলাদের মতো আচরণ করে না এবং ত'াদের মতো কথাবর্তাও বলে না নিশ্চয়।
—কিন্তু ঐ রকম চরিত্রের লোকদের নিয়ে লিখবার কী প্রয়োজন বলুন তো? কাকা বললেন।

—আমিও তাই বলছি। মিসেস হেফোর্থ বললেন। আমরা সবাই জানি, এ সংসারে অসভ্য শয়তান এবং পাপ প্রকৃতির লোক অনেক আছে, কিন্তু আমি বুঝি না কী লাভ হবে এদের নিয়ে লিখলে।

—আমি তাঁর পক্ষ সমর্থন করছি না, মিঃ গলওয়ে বললেন, শুধু তিনি কী ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন ঐ কথাই আপনাদের বলেছি। তবে এরপর অবশ্য ডিকেন্সের প্রসঙ্গ তিনি উত্থাপন করেছিলেন।

—ডিকেন্সের কথা আলাদা। কাকা বললেন—Pickwicks Paper সম্বন্ধেও কারো আপত্তি করবার আছে এ আমি মনে করতে পারি না।

—আমার মনে হয় সবকিছু ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। কাকীমা বললেন। ডিকেন্সকে সবসময় আমার অতি বিশ্রী লাগত। আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি যে আবহাওয়াটা আজকাল খুব খারাপ, উইলি আর মিঃ ড্রিফিলডের সঙ্গে সাইকেল চড়তে বেরতে পারবে না। ওর সঙ্গে মেলামেশা করে এ আমার মোটেই ভালো লাগে না।

আমি এবং মিঃ গলওয়ে দুজনেই মাথা নুইয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

নয়

ব্লেকস্টেবলে খ্রীষ্টমাসের সময় হালকা ধুমধামের ভেতর হামেশা যে সুযোগ মিলত, সেই সুযোগে কনগ্রিগেশানেল চ্যাপেলের পাশে ড্রিফিলডদের ছোটো বাড়িতে প্রায়ই আমি যেতাম। লর্ড জর্জকে সবসময় আমি সেখানে দেখতাম, কখনো মিঃ গলওয়ে আসতেন। আমাদের দুজনার মুখ বন্ধ রাখবার ষড়যন্ত্র পরস্পরকে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল, এবং যখনই ভিকারেজে অথবা প্রার্থনা শেষে চার্চের বারান্দায় আমাদের দেখা হতো, আমরা বাঁকা চোখে পরস্পরের দিকে তাকাতাম। আমাদের গোপন কথা নিয়ে কিছুই আমরা বলতাম না, কিন্তু মনে মনে উপভোগ করতাম, আমার মনে হয় এই ভেবে আমরা প্রচুর তৃপ্তি পেতাম যে কাকার চোখে ধুলো দিতে আমরা সক্ষম হয়েছি। কিন্তু একদিন আমার খেয়াল হলো জর্জ কেম্প, কাকার সঙ্গে কখনো পথে দেখা হলে, হয়তো কথাচ্ছলে বলতে পারে যে ড্রিফিলডদের বাড়িতে প্রায়ই ওর দেখা হয় আমার সঙ্গে।

—কিন্তু লর্ড জর্জ? আমি বললাম মিঃ গলওয়েকে।

—ও, সে ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।

একটু চাপা হাসি হাসলাম দুজনেই।

লর্ড জর্জকে আমার ভালো লাগতে লাগল। প্রথমে আমি তাকে খুবই অবজ্ঞা করতাম এবং শুধু সাধারণ ভদ্রতা রক্ষা করতাম, কিন্তু আমাদের উভয়ের

সামাজিক বৈষম্য সম্বন্ধে তাকে এতই উদাসীন দেখলাম যে এই সিদ্ধান্ত করতে আমি বাধ্য হলাম যে আমার উদ্ধত এবং নিষ্প্রাণ ভদ্রতা তার মনে চৈতন্য উদয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। সবসময় সে আন্তরিকতা দেখাত, খুব হালকা প্রাণখোলা দেখতাম এবং কখনো অতিরিক্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত, তার স্বভাবের সাধারণ রীতি অনুসারে আমাকে সে উত্যক্ত করত। আমিও বালকোচিত বুদ্ধি দিয়ে তাকে জবাব দিতাম; অপরকে আমরা হাসাতাম এবং এইসব মিলে আমার মনটাও মমতায় তার দিকে ঝুঁকে পড়ত। সবসময় সে তার বড়ো বড়ো পরিকল্পনার কথা নিয়ে লম্বা লম্বা কথা বলত। কিন্তু সে তার উদ্ভট কল্পনাগুলির বিনিময়ে সে-সম্বন্ধে আমার পরিহাস-বিদ্রূপকে খুব সহজভাবে গ্রহণ করত। তার মুখে ব্লেকস্টেবলের মাথা-মোটা হোমড়া-চোমড়া লোকদের গল্প শুনতে আমার খুব মজা লাগত, এবং যখন এইসব লোকের ভাব-বাতিক নিয়ে কৌতুক করত আমি হাসিতে ফেটে পড়তাম। সে একেবারে চাছাছোলা স্বভাবের লোক, তাকে অসভ্য মনে হতো কোনো সময়, এবং যে ধরণের পোশাক সে পরত আমি দেখে হতবুদ্ধি হয়ে যেতাম। আমি কখনো নিউ মার্কেটে যাইনি এবং কোনো টেনারকে দেখিনি। তবে আমার একটা ধারণা ছিল যে নিউ মার্কেটের টেনাররাই এ ধরণের পোশাক পরে থাকে। খাবার টেবিলে তার ব্যবহার অত্যন্ত অভদ্র এবং অমার্জিত লাগত, কিন্তু দিনে দিনে তার প্রতি আমার মনের বিতৃষ্ণা কমে আসতে লাগল। প্রতি সপ্তাহে Pink un পত্রিকা সে আমাকে পড়তে দিত। আমি বাড়ি নিয়ে যেতাম—গ্রেট-কোটের পকেটে খুব সাবধানে লুকিয়ে—এবং শোবার ঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে সেটা পড়তাম।

ভিকারেজে চা খাবার আগে আমি কখনো ড্রিফিলডদের ওখানে যেতাম না, তবু সেখানে গিয়ে দ্বিতীয়বার চায়ের ব্যবস্থা সবসময় আমি করে নিতাম। চায়ের পর ড্রিফিলড কৌতুক সঙ্গীত গাইতেন, কখনো বেঞ্জো বাজিয়ে আবার কখনো পিয়ানোয় বসে। এক নাগোয়াড় এক ঘণ্টা ধরে তিনি গাইতেন, ক্ষীণ দৃষ্টি চোখ দুটি থাকত যন্ত্রের উপর। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি মিটমিট করত। সবাই মিলে সম্মিলিত কণ্ঠে গানে যোগ দিলে তিনি খুশী হতেন। আমরা বিস্তি খেলতাম। আমি ছেলেবেলাতেই এই খেলা শিখেছিলাম। শীতের সুদীর্ঘ সন্ধ্যায় ভিকারেজে কাকা কাকীমা এবং আমি আমরা সবাই মিলে খেলতাম। কাকা সবসময় ডামি হাত নিতেন। যদিও আমরা কোনো বাজি না রেখে খেলতাম তবু কাকা কাকীমা এবং আমি হেড়ে যেতাম। তখন ডাইনিং টেবিলের নিচে গিয়ে আমি কান্না শুরু করে দিতাম। টেড ড্রিফিলড তাস খেলতেন না। তিনি বলতেন ওতে তাঁর মাথা ঢুকত না এবং আমরা যখন

খেলা শুরু করতাম তিনি তখন হাতে একটা পেনসিল নিয়ে মিউজিক করবার জন্য লণ্ডন থেকে সদ্য আগত কোনো একখানা বই নিয়ে আগুনের ধারে গিয়ে বসতেন। তিন জনের জুটি নিয়ে আমি আগে খেলিনি কখনো এবং আমি অবশ্য খুব ভালো খেলতেও পারতাম না, কিন্তু মিসেস ডিঃফিলডের অদ্ভুত তাসের জ্ঞান ছিল। সাধারণতঃ তিনি খুব হিসেব করে প্রতিটা পা ফেলতেন কিন্তু তাস খেলার সময় তাঁর অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা এবং সজাগতা লক্ষ্য করতাম। তিনি একাই আমাদের অন্য সবার মাথা গুলিয়ে দিতেন। তিনি বেশী কথা বলতেন না, যাও বলতেন খুব ধীরে ধীরে বলতেন, কিন্তু এক হাত খেলা হয়ে যাওয়ার পর যখন তিনি খুশী মনে আমার খেলার ভুল ধরিয়ে দিতেন, তখন শুধু সুন্দর করে কথাগুলি বলতেন না, বেশী করে বলতেন। লর্ড জর্জ সবসময় তাঁকে উত্যক্ত করত, যেমনি করত আর সবাইকে। তার বিদ্রূপে তিনি মুচকি মুচকি হাসতেন। কারণ তিনি কখনো প্রাণ খুলে হাসতে পারতেন না। আবার কখনও মাঝে মাঝে ছোট্ট কথায় প্রত্যুত্তর করতেন। প্রেমিকের মতো তাঁরা কখনো ব্যবহার করতেন না। তাঁদের ব্যবহার ছিল অতি পরিচিত বন্ধুর মতো। আমিও হয়তো তাঁদের সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম বা নিজের চোখে যা দেখেছিলাম সবই ভুলে যেতাম কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি তার দিকে এমন ভাবে তাকাতেন যে আমি ভীষণ বিব্রত বোধ করতাম। তাঁর দৃষ্টি শান্ত ভাবে আশ্রয় নিত ওর মুখের উপর। যেন সে মানুষ নয়। একটা টেবিল বা চেয়ারের মতো প্রাণহীন কিছু। তাঁর সেই দৃষ্টিতে শিশুর চঞ্চল মুচকি হাসি ঝিলমিল করে উঠত। তারপরই আমি লক্ষ্য করতাম, হঠাৎ তার চোখমুখ কেমন স্ফীত হয়ে উঠত। চেয়ারের ভেতর কেমন অস্বস্তির সঙ্গে নড়ে চড়ে বসত। আমি অতি ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে কিউরেটের দিকে তাকাতাম, পাছে তিনি কিছু লক্ষ্য করেন কিন্তু দেখতাম তিনি তখন হয়তো তাস নিয়ে মশগুল অথবা পাইপ ধরাতে ব্যস্ত। প্রতিদিন তাঁদের ঐ গরম গুমোট এবং ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ছোটো ঘরের ভেতর যে দুই একটি ঘণ্টা কাটাতাম, সে সময়টুকু যেন বিদ্যুতের গতিতে কেটে যেত এবং ছুটির দিনগুলি যখন ফুরিয়ে আসত তখন ঐ চিন্তায় আমার মন ভারি হয়ে উঠত।

—জানিনা তোমাকে ছেড়ে আমার দিনগুলি কেমন করে কাটবে। মিসেস ডিঃফিলড বলতেন—অগত্যা ডামি খেলতে হবে আমাদের।

আমি খুশী হয়েছিলাম। আমার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের খেলাও ভেঙে যাবে। আমি যখন স্কুলের পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকব, সেই সময় এই ছোট ঘরখানিতে আমার অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে তাঁরা সবাই আনন্দ করবেন।

এখানে ওঁদের যেন কিছুতেই আমি মনে স্থান দিতে পারতাম না।
—ইস্টারে তোমাদের কতদিন ছুটি ? মিঃ গলওয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।
—প্রায় তিন সপ্তাহ।

—তখন বেশ আনন্দে কাটান যাবে। মিসেস ড্রিফিলড বলে উঠলেন—ওয়েদারও তখন ভালো হয়ে উঠবে নিশ্চয়। সকালে ঘোড়ায় চড়ব, বিকেলে চা খেয়ে হুইস্ট খেলা যাবে। জানো, তোমার অনেকটা উন্নতি হয়েছে। তোমার ইস্টারের ছুটির সময় সপ্তাহে তিন চার বার যদি আমরা খেলতে পারি, তাহলে দেখবে, কারোর সঙ্গে খেলতে তুমি আর ভয় পাবে না একটুও।

দশ

কিন্তু স্কুলের সেই টার্মও শেষ হলো। আবার যখন ব্লেকস্টেবলে ট্রেন থেকে নামলাম মন আমার খুশীতে ভরপুর। ততদিনে আমিও বেশ একটুখানি বড়ো হয়ে গিয়েছি টেরকানবারিতে একটা নতুন সুট করিয়েছি। নীল সার্জের সুট। বেশ চটপটে। একটা নতুন টাইও কিনেছিলাম।
বাড়িতে চা-টা কোনো রকমে গিলেই ড্রিফিলডদের বাড়িতে যাওয়া আমার ইচ্ছা ছিল। আমি বেশ জানতাম আমার বাক্স-পেটারা ঠিক সময়েই বাড়িতে গিয়ে পৌঁছবে। এবং নতুন সুটটা আমি নিশ্চয় পরতে পারব। ওটা পরে আমাকে বেশ বড়ো বড়ো লাগবে। গোঁফটা তাড়াতাড়ি গজাবার জন্য রোজই রাত্রে ওপরের ঠোঁটে বেশ করে ভেসেলিন মাখতে শুরু করে দিয়েছিলাম। শহরের ভেতর দিয়ে আসতে আসতে ড্রিফিলডরা যে রাস্তায় থাকতেন সেই রাস্তার দিকে বার বার তাকাকে তাকাতে আসছিলাম। যদি তাঁদের কাউকে দেখতে পাই একবার। তক্ষুণি তাঁদের বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিতে পারলে খুব খুশী হতাম কিন্তু আমি জানতাম সকাল বেলাটা মিঃ ড্রিফিলড-এর লিখবার সময়। আর মিসেস ড্রিফিলডও পাতে দেওয়ার অবস্থায় থাকতেন না। তাঁদের বলবার জন্য কত উত্তেজক কাহিনী আমি সঞ্চয় করে এনেছিলাম। বেলের পুলের কাছে পৌঁছে দেখলাম আরো দুচার খানা বাড়ি উঠছে সেখানে।
—বাই জোভ, আমি বলে উঠলাম—নিশ্চয়ই লর্ড জর্জ কাজটা বাগিয়ে নিয়েছে।
দূরে মাঠে ছোটো ছোটো সাদা ভেড়াগুলি চড়ে বেড়াচ্ছিল। এম্ গাছে সবুজ পাতার অঙ্কুর দেখা দিয়েছে সবে। পাশের দোর দিয়ে আমি বাড়িতে ঢুকলাম। চুল্লির ধারে আর্ম-চেয়ারে বসে কাকা টাইমস পত্রিকা পড়ছিলেন। আমি কাকীমাকে ডাকলাম, তিনি নিচে নেমে এলেন, আমাকে দেখে আনন্দের

উত্তেজনায় তাঁর শুকনো দুই গালে দুই ফোঁটা রক্তিম আভা ফুটে উঠল। তিনি তাঁর বয়োজীর্ণ দুখানা রোগা হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন। অনেক ভালো ভালো কথা তিনি বললেন আমাকে।

—বা-বা-বা, কী বড়োটি তুমি হয়েছ! হায় ভগবান! এর মধ্যে তোমার গোঁফ উঠছে!

কাকার টাক পড়া কপালে আমি চুমু খেলাম, এবং চুল্লির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম দু পা ফাঁক করে চুল্লির দিকে পেছন দিয়ে, সত্যি আমি বড়ো হয়েছি এমনি ভাব প্রকাশ পেল। তারপর আমি উপরে গেলাম এমেলির কুশল মঙ্গল জিজ্ঞাসা করতে। তারপর গেলাম পাকশালের দিকে মেরি আনের সঙ্গে করমর্দন করতে। ওসব সেরে ছুটে বেরিয়ে গেলাম বাগানের দিকে মালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য।

যখন খেতে বসলাম এবং কাকা ছুরি দিয়ে ভেড়ার ঠ্যাঙের মাংস কেটে কেটে দিচ্ছিলেন আমি কাকীমাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ

—আমি চলে যাবার পর ব্লেকস্টেবলে কী কী ঘটেছে বলো না কাকীমা।

—তেমন কিছু না। মিসেস গ্রীনফোর্ট হপ্তা দুয়েকের জন্য মেনটেনে গিয়েছিলেন, দিন কয়েক আগে ফিরে এসেছেন অবাবিশ্য। মেজর বাত-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

—আর তোমার বন্ধু ড্রিফিলডরা পালিয়েছে। কাকা যোগ করলেন।

—কী করেছে? আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

—কেটে পড়েছে, পালিয়েছে। হঠাৎ একদিন রাত্তিরে তারা তাদের জিনিসপত্র সব সরিয়ে লণ্ডন চলে গেছে। চারদিকে অনেক দেনা ছড়িয়ে রেখে গেছে। বাড়ি ভাড়া দেয়নি, ফার্নিচারের ভাড়া বাকি। মাংসওয়ালা হেরিসের কাছেই প্রায় তিরিশ পাউণ্ড ধার।

—ভারি অদ্ভুত তো! আমি বললাম।

—খুব খারাপ। কাকীমা বললেন—শুনতে পাই তিন মাস ধরে একটি কপর্দকও মাইনে দেয়নি ঝি কে।

আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। কেমন একটা বিশ্রী অসোয়াস্তি-ভাব আমাকে চেপে ধরেছিল।

—আশা করি এরপর ভবিষ্যতে তোমার কাকা-কাকী যাদের সমর্থন বা অনুমোদন করবেন না তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবার মতো সুবুদ্ধি হবে তোমার।

—সত্যি, যেসব দোকানদারদের ওরা ঠকিয়ে গেছে ওদের কথা ভাবতেও ভারি কষ্ট হয়। কাকীমা বললেন।

—ঠিক শাস্তি হয়েছে। কাকা বললেন। ওরকম লোককে ধার দেবার

মজা দেখ এবার ! ওরা যে ব্যাউণ্ড্লে ছাড়া আর কিছু নয়, আমার মনে হয়, সবারই ওটা বোঝা উচিত ছিল।

—আমি ভেবেই পাই না তারা এখানে কী করতে এসেছিল।

—কিছু না, এই শুধু নিজেদের একটু জাহির করবার জন্য বোধহয় ! আমার বিশ্বাস ওরা ভেবেছিল যখন পরিচয় হবে সবার সঙ্গে এবং সবাই জানবে তারা কে তখন ধারে জিনিষ পাওয়া সহজ হবে।

কথাটার পেছনে আমি বিশেষ কোনো যুক্তি খুঁজে পেলাম না, কিন্তু তর্ক করবার আর কোনো ইচ্ছা রইল না।

যখনই সুযোগ পেলাম ঘটনাটার বিষয় মেরি আনকে জিজ্ঞাসা করলাম। আমি অবাক হয়ে গেলাম কাকা এবং কাকীমা যেভাবে নিয়েছিলেন সে ভাবে সে আদৌ নিল না ব্যাপারটাকে। সে খিল খিল করে হেসে উঠল।

—যেমনি ঠাকুর তার ঠিক তেমনি পুজোর ব্যবস্থা করেছে। সে বলল—টাকাপয়সার ব্যাপারে দিলদরিয়া, সবাই ভাবত বুঝি প্রচুর টাকা আছে। মাংসের দোকানে সবচেয়ে সেরা মাংস ওদের চাই, স্টিক তৈরির জন্যে তো বটেই। শাকসবজি, আঙ্গুর এমনি সব আরো কত কি চাই, জানিও না সব। শহরের সবগুলো দোকানে ধারের হিসাব থাকত। আমি বুঝি না, মানুষ এত বোকা হয় কেমন করে।

বুঝলাম তার মন্তব্য দোকানদারদের বিষয়েই ডিংফিলডদের সম্বন্ধে নয়।

—কিন্তু সবার চোখে ধুলো দিয়ে এমনি গা-ঢাকা দিল কেমন করে ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—এই প্রশ্নই সবাই করছে। সবাই বলছে লর্ড জর্জ ওদের সাহায্য করেছে। আচ্ছা তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি, যদি লর্ড জর্জ তার গাড়ি দিয়ে না নিয়ে থাকে তাহলে জিনিষপত্রগুলি স্টেশন পর্যন্ত নিল কেমন করে !

—সে কি বলছে ?

—বলছে ঐ চাঁদের বুড়িটার কথা যতটুকু জানে তার চেয়ে বেশী কিছু না। যখন সবাই জানল ডিংফিলডরা পালিয়েছে তখন সারা শহরময় সে কি হৈ চৈ। ঐসব দেখে আমি হেসে মরি। লর্ড জর্জ বলল, সে নাকি ধারণাই করতে পারেনি ওরা এত ভুয়ো, আর সবার মতো সেও নাকি খুব অবাক হয়েছিল। আমি কিন্তু এর একটি কথাও বিশ্বাস করি নি। বিয়ের আগে রোজির সঙ্গে তার ঐ ব্যাপার সবাই আমরা জানতাম, আর ওটা শেষ হয়ে গিয়েছিল মরে গেলেও বিশ্বাস করতাম না। শুনছি তো গত গরমের সময় মাঠের ধারে প্রায়ই দুজনকে এক সঙ্গে চলাফেরা করতে অনেকেই দেখেছে। ওদের বাড়িতেও যেত রোজি।

—সবাই টের পেল কেমন করে ?

—ও, তাহলে সব কথা বলছি শোন। রোজিদের বাড়িতে একটা মেয়ে থাকত। সেই রাত্তিরে মেয়েটাকে তার মার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। জানত পরদিন সকাল আটটার আগে মেয়েটি ফিরবে না। পরদিন ফিরে এসে মেয়েটি বাড়িতে ঢুকতে পারল না। দরজায় ধাকা দিয়ে বেল বাজিয়ে কারো কোনো সাড়া পেল না। পাশের বাড়ির মহিলার পরামর্শ চাইল, তিনি তাকে পুলিশে খবর দিতে উপদেশ দিলেন। মেয়েটির সঙ্গে একজন সার্জেণ্ট এসেও দরজায় ধাক্কাধাক্কি করল। বেল বাজাল, কিন্তু তখনো কোনো সাড়া এল না। সে মাইনে পেয়েছে কিনা জানতে চাইলে মেয়েটি বলল পায়নি, গত তিন মাস ধরে নাকি একটি কপর্দকও মাইনে দেয়নি। সার্জেণ্ট মেয়েটিকে বলল ওরা নিশ্চিত পালিয়েছে। সবাই মিলে ঘরে ঢুকলে দেখা গেল কাপড়-চোপড়, বইপত্র সবকিছু ওরা সঙ্গে নিয়ে গেছে। সবাই বলে ড্রিফিলেদের নাকি গুচ্ছের সব বই ছিল—কিছুই ওরা ফেলে যায় নি।

—তারপর তাঁদের আর কোনো খবর পাওয়া যায় নি বোধহয় ?

—হ্যাঁ, কতকটা তাই। হপ্তা খানেক কেটে যাওয়ার পর মেয়েটির নামে লণ্ডন থেকে একখানা চিঠি এসেছিল। খামের ভেতর কোনো চিঠি ছিল না। শুধু তার মাইনে বাবদ একখানা পোস্টাল অর্ডার। তবে টাকার অঙ্ক যা ছিল তাতে বাকি জীবন আর খেটে খেতে হবে না বোধ করি।

মেরি আনের চেয়েও আমি বেশী আঘাত পেয়েছিলাম। আমি তখন একজন বিশেষ সম্মানিত ভদ্রযুবক। পাঠকদের দৃষ্টি নিশ্চয় এড়ায়নি যে আমার শ্রেণীগত রীতি-নীতিকে আমি প্রকৃতির নিয়ম বলেই মেনে নিয়েছিলাম। যদিও মোটা হাতে ধার করাকে খুব রোমাণ্টিক বলে মনে হতো এবং বেনিয়া আর মহাজনশ্রেণীর সঙ্গে আমি বরাবর পরিচিত ছিলাম, তবু দোকানের বাকি পরিশোধ না করাকে অত্যন্ত হীনতা, ছোটো কাজ বলে মনে না করে পারতাম না। ড্রিফিলডদের সম্বন্ধে যখনই কেউ আমার উপস্থিতিতে আলোচনা করত আমি অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে শুনতাম। যখনই তাদেরকে আমার বন্ধু বলে উল্লেখ করত, আমি বলতাম—রেখে দিন ওদের কথা, আমার সঙ্গে ওদের কেবল পরিচয় ছিল মাত্র এবং যখন জিজ্ঞাসা করত—আচ্ছা, ওরা খুব সাধারণ স্তরের মানুষ ছিল, তাই না ? আমি জবাব দিতাম—এটা খুব সত্যি।

বেচারা গলওয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন।

—অবশ্য তাঁরা বড়লোক, এ আমি কখনো ভাবতাম না। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তবে চলে যাবার মতো অবস্থা তাঁদের ছিল বলেই আমি মনে করতাম। বেশ সুন্দর আসবাবপত্র দিয়ে ওঁরা বাড়িটা সাজিয়েছিলেন, পিয়ানো-

টাও নতুন। এ কথনো আমার ধারণায় আসেনি যে তাঁরা একটারও দাম দেন নি। নিজেদের দুরবস্থা কথনো তাঁরা প্রকাশ করতেন না। আমি বেশী আঘাত পেয়েছি তাঁদের এই ছলনা দেখে। তাঁদের বাড়িতে আমি হামেশাই তো যেতাম, এবং তাঁরাও আমাকে পছন্দ করেন বলেই আমি মনে করতাম। তাঁদের বাড়িতে অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হতো না। তুমি বললে বিশ্বাস করবে না, ঐ সেদিন শেষবার যখন তাঁদের সঙ্গে দেখা হয় তখন আমার সঙ্গে সেক-হ্যাণ্ড করতে গিয়ে মিসেস ডিাফিলড পরদিন আবার আসতে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন এবং ডিাফিলড বলেছিলেন—কালকে চায়ের নিমন্ত্রণ রইল। অথচ তাদের সব জিনিষপত্র তখন বাঁধাছাঁদা হয়ে গিয়েছে। আর সেইদিন রাত্রেই তাঁরা লণ্ডন যাবার শেষ গাড়িতে চেপে বসলেন।

—লর্ড জর্জ এ সম্বন্ধে কী বলে ?

—আমি আর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করিনি। আমার বেশ শিক্ষা হয়ে গেছে। অসৎ-সঙ্গ সম্বন্ধে যে একটা প্রবাদ বাক্য আছে সেটাকে মেনে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে আমি মনে করি।

আমিও প্রায় এরকমই ভাবতাম লর্ড জর্জ সম্বন্ধে। বেশ একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। যদি তার মাথায় খেয়াল চাপে, সবাইকে বলে বেড়ায় যে গত খ্রীস্টমাসের সময় আমি প্রায় রোজ যেতাম ডিাফিলডদের বাড়িতে এবং কথাটা কাকার কানে ওঠে তাহলে একটা অবাঞ্ছিত অপ্রিয় পরিস্থিতির উদ্‌ভব হবে এ আমি দিব্য চোখে দেখতে পেলাম। প্রতারণা, ছলচাতুরী, অবাধ্যতা এবং এমন কি ভদ্রোচিত ব্যবহারের পরিপন্থী বলে কাকা আমাকে দোষারোপ করবেন। সেই মুহূর্তে জবাব দেবার মতো কিছু আমি খুঁজে পেলাম না। এও আমার পরিষ্কার জানা ছিল, খুব সহজে তিনি ব্যাপারটাকে ছেড়ে দেবেন না। আমার এই অবাধ্যতার কথা বার বার বহুদিন ধরে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন। তাই লর্ড জর্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়ায় সত্যি আমি খুশী হয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন হাই-স্ট্রীটের উপর মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল তার সঙ্গে।

—এই যে খোকন বাবু, সে এমন ভাবে চেঁচিয়ে উঠল, যেটা আমার কানে বিশেষ রকম বিরক্তিকর লাগল—ছুটিতে আসা হয়েছে, বুঝি ?

—বেশ নির্ভুল আন্দাজ করতে পারেন দেখছি। একটু কটাক্ষ করে জবাব দিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে হেসে ফেটে পড়ল।

—জিবে যা ঝাঁজ, একটু সাবধান না হলে পুড়বে দেখছি। বেশ মনখোলা ভাবে সে উত্তর দিল—সে যাক্ গে, কিন্তু মনে হচ্ছে এর পর আর

'হুইস্ট' খেলার সুযোগ হবে না তোমার সঙ্গে তাই না? তবে এইবার বুঝতে পারছ তো নিজের সামর্থ্যের বাইরে গেলে কী অবস্থা দাঁড়ায়? সবসময় আমি আমার ছেলেদের কী বলি জান, তাদের বলি তোমার একটি পাউণ্ড থেকে যখন মাত্র উনিশ শিলিং ছয় পেনি খরচ করো তখন তুমি সত্যি বড়ো লোক। কিন্তু যখন তুমি কুঁড়ি শিলিং ছয় পেনি খরচ করো তখন তুমি ভিখিরী। কাজেই পেনির দিকে নজর রেখো হে ছোকরা, পাউণ্ডের ভাবনা আর ভাবতে হবে না তাহলে। নিজের ভাবনা ও নিজেই ভাববে দেখো।

কিন্তু যদিও সে এমনি ভাবে কথাগুলো বলল তবু আমি কোনোরকম অসমর্থনের সুর খুঁজে পেলাম না তার কথায়। একটা হাসির ঝলক যেন উছলে উঠছিল তার ভেতর থেকে। যেন এই কটি উপদেশ বাণীর জন্য অন্তরে অন্তরে একটা কৌতুক বোধ করছিল।

—শুনছি আপনি নাকি তাঁদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। আমি মন্তব্য করলাম।

—আমি? একটা অদ্ভুত বিস্ময়ের ভাব তার সারা মুখ ছেয়ে ফেলল। কিন্তু তার চোখ দুটি একটা ধূর্ত কৌতুকে চিক্ চিক্ করে উঠল—বল কি, যখন শুনলাম ড্রিফিলডরা লম্বা দিয়েছে, আমার অবস্থাই যে তখন সঙ্গীন। পালকের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাবার মতো। কয়লার দাম বাবদ চার পাউণ্ড সাড়ে সতের শিলিং যে আমি পাব তাদের কাছে। একটু একটু ছোঁয়া লেগেছে আমাদের সবারই গায়, এমন কি বেচারা গলওয়েও বাদ যায় নি।

লর্ড জর্জ এতটা মুখ কাটা আমি ভাবি নি। একটা কিছু শ্লেষ বা আরো কড়া রকম কিছু বললে আমি ভালো করতাম, কিন্তু কোনো কিছুই তখন ভাবতে পারছিলাম না, শুধু বললাম—আমি যাই এবার।

একটু মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে আমি চলে এলাম সেখান থেকে।

এগার

অলরয় কিয়ারের অপেক্ষায় বসে বসে যখন ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা এমনি ভাবে ভাবছিলাম তখন সেদিনকার অজ্ঞাত এবং অপরিচিত এক টেড ড্রিফিলডের জীবনের এই একটি অতি বিশ্রী ক্ষুদ্র ঘটনার কথা তাঁরই উত্তর জীবনে পাওয়া প্রভূত সম্মান ও প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গিয়ে বেশ একটু কৌতুক বোধ করছিলাম। জানিনা হয়তো আমার শৈশবকালে আমার চারদিককার সবাই তাঁকে লেখক হিসেবে অতি নগণ্য মনে করত বলেই পরবর্তী কালে শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের অবিসম্বাদিত

স্বীকৃতি সত্বেও আমি কখনো তাঁর ভেতর বিশেষ কোনো অবিস্মরণীয় প্রতিভার খোঁজ পাইনি। অনেককাল তাঁর বদনাম ছিল যে তিনি খারাপ ইংরেজী লিখতেন এবং তাঁর লেখা পড়ে এটাই সবসময় মনে হতো যে তিনি বুঝি ভোঁতা কলম দিয়ে প্রাণহীন লেখা লিখতেন। তাঁর রচনা-শৈলী ছিল বড়ো বেশী কষ্ট-কল্পিত, ক্লাসিকেল এবং চলতি ভাষায় কেমন একটা অসোয়াস্তিকর সংমিশ্রণ ; তাঁর সংলাপ রচনা এমনি যে সেগুলোকে কোনো মানুষের মুখের ভাষা বলে মনে হত না। সাহিত্যিক জীবনের শেষ দিকে যখন তাঁর বইগুলো অনুলিখিত হতো সে সময় তাঁর রচনা-শৈলী সংলাপের স্বাচ্ছন্দ লাভ করে বেশ প্রবাহী এবং স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল : এবং সেসময় সমালোচকেরাও তাঁর পরিণত বয়সের উপন্যাসগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর ভাষায় বিষয়োচিত অপ্রতিভতা এবং উদ্দাম সজীবতা আবিষ্কার করত। তাঁর সাহিত্য কর্মের আদিকাল ছিল সেই সময়, যে যুগে ভাষার অলঙ্কার ব্যবহারের প্রচলন ছিল এবং তাঁর রচনার ভেতর এমন সব বর্ণনা ছিল যেগুলি ইং রজী গদ্যের যেকোনো সঙ্কলনে স্থান পেয়েছিল। সমুদ্রের বর্ণনা, বণানী-ঘেরা কেন্ট অঞ্চলের বসন্ত-ঋতু, এবং টেমস নদীর ভাটি অঞ্চলের সূর্যাস্ত ইত্যাদি সত্যি খুব প্রসিদ্ধি পেয়েছিল। তবে আমার পক্ষে এটা খুবই দুঃখের কারণ যে অসোয়াস্তি বোধ না করে কোনোদিন আমি এগুলো পড়তে পারিনি।

তারপর যখন আমি যৌবনে পা দিলাম সে সময় যদিও তাঁর বইগুলো খুব কম কাটত এবং দু চারখানা বইয়ের কোনো কোনো গ্রন্থাগারে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছিল, তবু তাঁর বইগুলির প্রশংসা করা কৃষ্টির লক্ষণ বলে পরিচিত ছিল। অতি সাহসী বাস্তবপন্থী বলে তিনি গণ্য হতেন। নীতিবাগিশদের মুখ বন্ধ করবার অমোঘ অস্ত্র বলে তিনি গৃহীত হয়ে ছিলেন। কারো কারো মনের অতি-প্রেরণা তাঁর সৃষ্ট নাবিক এবং কৃষকদের সেকস্‌পীরিয় বলে আবিষ্কার করেছিল এবং এইসব প্রগতিপন্থীদের যখনই সমাবেশ হতো তখন তাঁর সৃষ্ট গেঁয়ো লোকদের মুখে শুষ্ক ঝাঁজালো হাসি-কৌতুক নিয়ে তারা নির্মল আনন্দের আতিশয্যে কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠত। এসব রসদ পরিবেশন করতে এডওয়ার্ড ড্রিফিলেডর একটুও অসুবিধে হতো না। তাঁর বইয়ের পাতায় সমুদ্রে ভাসমান কোনো জাহাজের কেবিনে অথবা কোনো ভাঁটিখানায় নাচ ঘরের পরিবেশে আমার মন ভেঙে যেত, আমি বুঝতে পারতাম জীবন নীতি অথবা অমরত্ব সম্বন্ধে বিদ্রূপ-কটাক্ষ বহুল সংলাপের অর্দ্ধ ডজন পাতার বেড়াজালে আমি হারিয়ে যাব। তবু, আমি স্বীকার করতে বাধ্য, এইসব সেকস্‌পীরিয় ভাঁড়দের সব সময় আমার বিরক্তিকর লাগত, এবং তাদেরই

অগণিত সন্তান সন্ততিদের আমি বরদাস্ত করতে পারতাম না।

বস্তুত যে সমাজের লোকদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল, যেমন কৃষক এবং কৃষিমজুর, দোকানদার এবং ভাঁটিখানাওয়ালা, জাহাজের সারেঙ, নাবিক, পাচক ইত্যাদি—সবার কথা বলতে গিয়েই ডিফিলেডর শক্তির পরিচয় পাওয়া যেত। সমাজের উপরতলার মানুষদের কথা যেখানে তিনি বলতে যান সেখানে তাঁর অতি অন্তরঙ্গ ভক্তরাও কেমন একটা বিষাদ অনুভব করেন। তাঁর সৃষ্ট ভদ্রলোকেরা এত বেশী ভদ্র এবং উচ্চ-বংশোদভবা মহিলারাও এত বেশী সৎ এত পবিত্র এবং এত মহৎ যে বাহুল্য আত্মমর্যাদার ভাব না দেখিয়ে নিজেদের প্রকাশ করতে না পারলেও আপনি বিস্মিত হবেন না। তাঁর স্ত্রী-চরিত্রগুলিতে সজীবতা আসে অতি কষ্ট-কল্পনায়। কিন্তু এখানে আমি আবার বলব যে এটা আমার ব্যক্তিগত মত, সারা দুনিয়া এবং প্রখ্যাতনামা সমালোচকদের সবাই একমত যে তাঁদের মতে সেগুলো সমকালীন ইংরেজ নারী চরিত্রের প্রকৃষ্ট প্রতীক, তাঁরা সজীব, তাঁরা সাহসী, তারা উচ্চ-মনা এবং সেক্সপীয়রের নারী-চরিত্রগুলোর সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে অনেক সময়। কোষ্ঠকাঠিন্য নারী জাতির বৈশিষ্ট্য এটা সর্বজনবিদিত, কিন্তু তাই বলে উপন্যাসে তাদের এই রকম করে দেখানো আমার মতে খুবই বাড়া-বাড়ি। আমি অবাক হয়ে যাই মেয়েরা কিন্তু বেশ মেনে নিয়েছে এটাকে। সমালোচকেরা একজন অতি বাজে লেখকের দিকে সারা দুনিয়ার দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারে এবং যে কোনো প্রতিভা-হীন ব্যক্তিকে নিয়ে সারা দুনিয়া উন্মত্ত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে ফল স্থায়ী হয় না; আমি কিছুতেই মনে না করে পারি না যে বিশেষ প্রতিভা এবং ক্ষমতার অভাব সত্ত্বেও একমাত্র এডওয়ার্ড ডিফিলড ছাড়া আর কেউ এতকাল জনসাধারণের মনে নিজেদের স্থান বজায় রাখতে পেরেছে। বাছা-বাছা কোনো সমালোচকের চোখে লোকপ্রিয়তা ঘৃণার বস্তু; লোকপ্রিয়তাকে এমন কি অতি সাধারণত্বের পর্যায়ে আখ্যায়িত করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত নন; কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, যারা উত্তরসূরী তারা অখ্যাত অজানাদের মাঝে তাদের অভিষ্টকে খুঁজে বেড়ায় না। যাঁরা পরিচিত তাঁদের ভেতর থেকেই বেছে নেয়। হয়তো বা কোনো মহৎ সৃষ্টি, যা অমরত্বের দাবি করতে পারত, প্রকাশ মাত্রই মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু উত্তরসূরী তা জানবেও না কোনোদিন। হয়তো বা আজকের দিনের সেরা বইয়ের সবগুলোকেই তারা বাতিল করবে, কিন্তু তাদের বাছতে হবে এ গুলোর ভেতর থেকেই। যাই কিছু হোক, এডওয়ার্ড ডিফিলড চলবেই। তাঁর উপন্যাসগুলো আমার ক্লান্তি আনে, বড়ো বেশী দীর্ঘ মনে হয়; তাঁর উপন্যাসের অতি নাটুকে ঘটনাগুলো, যা

দিয়ে গ্রন্থ-মনা পাঠকের চিত্তকে তিনি আগ্রহে সঞ্জীবিত করে রাখতেন আমার মনকে যেন তুহিন করে তুলত। তবু বলব তাঁর লেখায় নিষ্ঠা ছিল। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিতে জীবনের স্পন্দন আছে এবং সেগুলোর কোনোটাকেই তাঁর রহস্যময় ব্যক্তিত্বের ছায়ার উঁকিঝুঁকি আপনার দৃষ্টি এড়াতে পারবে না। জীবনের আদিপর্বে তিনি প্রশংসা পেয়েছেন। আবার বদনামও কুড়িয়েছেন শুধু তাঁর অতি বাস্তবতার জন্য; সমালোচকদের খামখেয়ালি অনুযায়ী তাঁর সৃষ্টির সত্যটুকুর জন্য তিনি প্রশংসিত হয়েছেন, আবার তেমনি গ্রাম্য-রুক্ষতা দোষে ধিক্কারও তিনি পেয়েছেন। কিন্তু সেই অতি বাস্তবতাও আজকে আর কোনো উত্তেজনা সৃষ্টি করে না, গ্রন্থাগারের পাঠকরাও এক পুরুষ আগে যার সপক্ষে কোমর বেঁধে দাঁড়াত তাইতেই আজ হোঁচট খায়। ডিভ্রিফিলডের মৃত্যুকালীন টাইমস পত্রিকায় সাহিত্য বাসরীয় সংখ্যায় প্রকাশিত প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির কথা বর্তমান গ্রন্থের বিদগ্ধ পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে। এডওয়ার্ড ডিভ্রিফিলডের উপন্যাসগুলিকে বিষয়বস্তু করে প্রবন্ধ লেখক যা লিখেছিলেন সেটাকে সুন্দরের বন্দনা বলে অভিহিত করা হয়েছিল। যারাই পড়েছিল তারাই সেই রচনার উচ্ছ্বাসে (যা নাকি টেলরের মহৎ গদ্য-রচনার কথা মনে করিয়ে দিত) শ্রদ্ধা এবং বিনয়ের প্রকাশে, মনের সঙ্গে অনুভূতির স্পর্শে মুগ্ধ না হয়ে পারেনি; এক কথায়, এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছিল যার শৈলীতে ছিল অলঙ্কার, কিন্তু সাদৃশ্য ছিল না, কোমলতা ছিল কিন্তু স্ত্রৈনভাব ছিল না। রচনাটি স্বকীয় মূল্যে ছিল একটি সার্থক সৃষ্টি। যদি কেউ বলেন যে এডওয়ার্ড ডিভ্রিফিলড একজন স্বভাব-রসিক লোক ছিলেন এবং আরও বলেন যে হাসি ঠাট্টার দুটো একটা চুটকি থাকলে এই প্রশংসাসুচক রচনাটি হয়তো আরো একটু হালকা এবং সরস হতো, তাহলে কিন্তু এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেব যে ঐ রচনাটি আর কিছু নয়, অন্ত্যেষ্টিকালীন ভাষণ মাত্র। তাছাড়া এ কথাটাও মনে রাখা দরকার যে হিউমারের ভীরু প্রকাশের ভেতর দিয়ে সুন্দর কখনো আত্মপ্রকাশ করতে পারে না।

ডিভ্রিফিলডের কথা সে যখন আমাকে বলেছিল রয় কিয়ারের মনে বিশ্বাস ছিল যে ডিভ্রিফিলডের যত দোষই থাকুক, তাঁর রচনার প্রতি ছত্রে ছত্রে সুন্দরের যে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল তাইতেই তাঁর সব দোষ স্খালন হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সেদিনকার আলোচনার কথা ভাবতে গিয়ে আজকে আমার মনে হয়, অলরয় কিয়ারের উপরোক্ত মন্তব্য সেদিন আমাকে বিশেষ রকম রুষ্ট করেছিল।

ত্রিশ বছর আগে সাহিত্যিক মহলে তখন ভগবানের ভীষণ প্রতিপত্তি।

ঈশ্বরে বিশ্বাস করাকে সুলক্ষণ মনে করা হতো। সাংবাদিকেরা শব্দের অলঙ্কারের জন্য এবং কোনো ছত্রের ভারসাম্য রক্ষা করবার জন্য ভগবানের নাম ব্যবহার করত। তারপর সেই ভগবানও বাতিল হয়ে গেল (ভারি মজার ব্যাপার যে ক্রিকেট আর বিয়ার মদও গেল সঙ্গে সঙ্গে) এবং প্যান এসে জুড়ে বসল। শত শত উপন্যাসের পাতায় পাতায় তার দ্বিখণ্ডিত ক্ষুরের ছাপ পড়তে লাগল। লণ্ডন শহরের মাঠে ময়দানে গোধূলির আবছা আলোতে তার উঁকি-ঝুঁকি দেখতে পেত সেদিনকার কবির দল, সারে এবং নিউ ইংলণ্ডের সাহিত্যিক মহিলারা—যান্ত্রিক যুগের পরীর দল, তার বলিষ্ঠ বুক্ষ আলিঙ্গনে নিজেদের কৌমার্যকেও যেন কোনো এক রহস্যজনক ভাবে বিসর্জন দিতে লাগল। আধ্যাত্মিক অর্থে তাদের কুমারী জীবন ফিরল না কখনো। কিন্তু এই প্যানও নিরুদ্দেশ হয়ে গেল একদিন, আজকে সৌন্দর্য এসে দাঁড়িয়েছে সেই স্থলে। কোনো একটি শব্দে, জন্তু জানোয়ার, কুকুর, একটি দিন, যে কোনো একটি ছবি; কোনো পোষাক পরিচ্ছদ, কোনো এক কর্মধারা এসব কিছুতেই মানুষ আজ সৌন্দর্যের অভিষেক দেখছে। তরুণী লেখিকার দল, যাদের প্রত্যেকেই একটা না একটা সার্থক উপন্যাস লিখেছে, কত রকম ভাবে এ কথাটিকে নিয়ে বক্-বক্ করেছে, কখনো ইঙ্গিত, কখনো আভাসে, কখনো গভীর অনুভূতি দিয়ে, আবার কখনো মিষ্টি করে। তারপর তরুণের দল হয়তো সবে অক্সফোর্ড থেকে বেরিয়ে এসেছে। সেখানকার গৌরবের ধুয়ো হয়তো তখনো গায়ে লেগে আছে। সাপ্তাহিকের পাতায় পাতায় তারা বলছে শিল্প জীবন আর এই বিশ্বের অর্থ কি, তারাই তাঁদের আষ্টেপৃষ্ঠে লেখা বইয়ের পাতায় এই জিনিষটিকে নিয়ে কত খামখেয়ালিভাবে ছুঁড়োছুঁড়ি করছে। নিষ্ঠুরভাবে এর ব্যবচ্ছেদ করছে, ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছে। তারা বড়ো নির্মমভাবে ব্যবহার করছে কথাটাকে। আদর্শের অনেক নাম আছে, সৌন্দর্য তারই একটি। আমি অবাক হয়ে ভাবি তবে কি যারা আধুনিক যান্ত্রিক যুগের তীব্রতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি এই হৈ চৈ তাদেরই অন্তরের বেদনার ক্রন্দনের চেয়ে বেশী কিছু নয়। এও আমি ভাবি, তবে কি এদের এই সৌন্দর্যের পিপাসা ভাবালুতার চেয়ে বেশী কিছু নয়! হয়তো বা অনাগত দিন, জীবনের সকল কঠিনতার সঙ্গে পূর্ণভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে, প্রেরণা খুঁজবে। বাস্তব থেকে পালিয়ে নয়, তাকে সাগ্রহে গ্রহণ করে।

জানিনা, আর সবাই আমার মতো কিনা, তবে আমি সচেতন যে সৌন্দর্যকে আমি খুব বেশী করে অনুধাবন করতে পারি না। আমার মতে এনডিমিঅন-এর প্রথম ছত্রে কীটস যা বলেছে তার চেয়ে বড়ো মিথ্যে কথা আর কোনো কবি

বলে নি। যখন সুন্দর কোনো কিছুর অনুভূতির শিহরণের যাদু আমাকে স্পর্শ করেছে তক্ষুনি আমার মন স্থানান্তরে নিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। আমি অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকি। যখনি কেউ বলে যে তারা আনন্দে বিভোর হয়ে কোনো দৃশ্য বা ছবির দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতে পারে। সৌন্দর্য শুধু আনন্দের একটা অনুভূতি মাত্র। ক্ষুধার মতোই সহজ সরল জিনিস। এ সম্বন্ধে বলবার মতো বিশেষ কিছু নেই। এতো শুধু গোলাপের সৌরভের মতো। এর গন্ধ আপনি উপভোগ করতে পারেন। ব্যাস এই পর্যন্তই। সেই জন্যই শুধু সৌন্দর্য ও শিল্পের সঙ্গে সংস্পর্শহীন সমালোচনা ছাড়া শিল্প সমালোচনা অত্যন্ত বিরক্তিকর। হয়তো পৃথিবীতে যত সেরা ছবি আছে, তার মধ্যে যেটিতে সৌন্দর্যের প্রকাশ হয়েছে সেই তাইতানের বিখ্যাত ছবি 'খ্রীস্টের সমাধি' সম্বন্ধে সমালোচকরা শুধু ছবিটা দেখবার পরামর্শই দেবে, এছাড়া আর যাকিছু বলবে, তা ইতিহাস, নয়তো জীবনী অথবা আরও কত কী! কিন্তু মানুষ এই সৌন্দর্যের সঙ্গে আরও কত রকম গুণ এনে সংযোগ করে—অতীন্দ্রিয়তা, মানবিক আকাঙ্ক্ষা, কোমলতা, প্রেম—কারণ সৌন্দর্য তাকে বেশীক্ষণ তৃপ্তি দিতে পারে না। যা সুন্দর তা পরম এবং এই পরমতা (এমনি মানুষের প্রকৃতি) আমাদের আকৃষ্ট করে রাখে শুধু ক্ষণিকের জন্য। গণিতজ্ঞ Phodro-এর দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছিল Quest co que cs Prouvo সে সত্যি ততটা নির্বোধ নয় যতটা তাকে বলা হয়েছিল। সৌন্দর্যের সহিত সম্পর্কহীন অবান্তর কিছুর অবতারণা না করে সত্যি আজও কেউ বলতে পারেনি এক গ্লাস বিয়ারের চেয়ে Prostum-এর Dovjo Temple কেন বেশী সুন্দর। এ এক কানা গলি। এ এক পাহাড়ের চূড়ো, পৌঁছলেই পথের শেষ। সেইজন্য শেষ পর্যন্ত তাইতানের চেয়ে এল গ্রেকোর কাছে পৌঁছবার পথ আমাদের খোলা, রেসিনের পূর্ণ সাফল্যের চেয়েও সেক্সপীয়রের অসম্পূর্ণ সৃষ্টির আকর্ষণ আমাদের কাছে বেশী। অনেক কথা বলা হয়ে গিয়েছে এই সৌন্দর্য সম্বন্ধে। আরও দু-চার কথা আমিও যোগ করলাম সেই জন্য। মানুষের কান্ত প্রবৃত্তিকে যা সাড়া দেয়, তৃপ্তি দেয়, তাই হলো রূপ। কিন্তু কে চায় এই পূর্ণ তৃপ্তি। কোনো কিছুর বাহুল্য ভূঁড়ি-ভোজনের পরিতৃপ্তি দেয় শুধু মূর্খকে। তাই আমাদের স্বীকার করতে বাধা নেই, সৌন্দর্য জিনিসটা কিছু নয়, একটা বিরক্তিকর বস্তু মাত্র।

তবে সমালোচকরা এডওয়ার্ড ড্রিফিলড সম্বন্ধে যা কিছু লিখেছিলেন তার সব কিছু অবশ্যি কথার কথা মাত্র। যে বাস্তবতা তাঁর শিল্প-কর্মকে সজীব করেছিল সে-ই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন নয়। যে সৌন্দর্য তাঁর

রচনাকে চিনিয়েছিল তাও নয়। এমন কী সমুদ্রচারী নাবিকদের জীবন্ত প্রতিকৃতি রচনাতেও বুঝি নয়। শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি, ঝড় আর প্রশান্তি, লোনা জলে ভরা জলাভূমি, এসব কিছুর বর্ণনা বুঝি ব্যর্থ, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ত'ার দীর্ঘ জীবন। বার্দ্ধক্যের প্রতি শ্রদ্ধা মনুষ্য জাতির চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য এবং আমার মনে হয় এই গুণ আমাদের দেশে যতটা প্রকট ততটা যে অন্য দেশে নয় এটা স্বচ্ছন্দে বলা যায় বোধহয়। যে বিস্ময় বিমুগ্ধ প্রীতি নিয়ে অন্য কোনো জাতি বার্দ্ধক্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শণ করে সে যেন অনেকটা প্লেটোনিক, আসক্তিহীন কিন্তু আমাদেরটা আরও বাস্তব। যে কোনো বয়োবৃদ্ধ গায়িকার সংগীত নিঃশব্দে শ্রবণ করবার জন্য কভেন্ট গার্ডেনের আসনগুলি ভরে তুলবে কারা, এই ইংরেজ ছাড়া? যে স্থবির নর্তকের পা আর নাচের তালে উঠে না, তারও নাচ দেখবার জন্য পয়সা খরচ করবে এবং বেরিয়ে এসে একে অন্যকে মুগ্ধ চিত্তে বলবে—জানো, এর বয়েস ষাট পেরিয়ে গেছে। সেও তো এইই ংরেজরাই? কিন্তু রাজনীতিক বা লেখকদের তুলনায় তারা শিশু। সত্তর্ বছর বয়সে কোনো রাজনীতিক বা সাহিত্যিকের যেখানে কর্মজীবনের সূচনা, সেই বয়সে নিজের জীবনের পরিসমাপ্তি হবে জেনে কোনো গায়ক বা নৃত্য-শিল্পীর মন যদি বিষিয়ে না উঠে তাহলে তাদের খুবই অমায়িক বলে ধরে নেবে, এমনি আমার মনে হয় অনেক সময়। যিনি চল্লিশ বছর বয়েসের রাজনীতিক, তিন কুড়ি দশ বছর বয়সে তিনি রাষ্ট্রনায়ক। এই বয়সেই যখন তিনি কোনো কারণিক কোনো মালী অথবা পুলিশ কোর্টের বিচারপতি পদে থাকবার পক্ষে অতি বৃদ্ধ তিনি রাষ্ট্রশাসনের জন্য তখন পরিপক্ক। ভেবে বিস্মিত হবার কিছু নেই যে সেই আদিকাল থেকে বৃদ্ধরা যুবকদের বলে এসেছেন যে ত'াদের চেয়েও ত'ারা বুদ্ধিমান। এবং কথাটা যে কত অর্থহীন সেটা আবিষ্কার করতে করতেই যুবকের দলও বার্দ্ধক্যের সীমায় এসে পৌঁছে গেছে। প্রতারণাটুকুকে জিইয়ে রেখে তারাও লাভবান হয়ে এসেছে। তাছাড়া রাজনীতিকদের সংস্পর্শে এসে এ কথাটা আবিষ্কার করতে অসুবিধা হবে না, একটা জাতির শাসন পরিচালনার কাজে বিশেষ কোনো মানসিক ক্ষমতার প্রয়োজন করে না। কিন্তু যতই বয়স বাড়ে ততই কেন লেখকরা বেশি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে! এইটাই আমাকে বহুদিন থেকে অবাক করে রেখেছে।

একসময় আমি ভাবতাম বছর বিশেক ধরে লোকের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে এমনি ধরণের লেখা ছেড়ে দেবার পরও লেখকরা প্রশংসা পান। তার কারণ তাঁদের কাছ থেকে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতার আশঙ্কা থাকে না

বলেই তরুণদের দল তাঁদের গুণকীর্তন করতেও নিরাপদ মনে করে। এবং এও সর্বজনবিদিত যে যার বিরোধীতায় ভয় নেই তাকে প্রশংসা করা যাকে আমি ভয় করি তার পথে কাঁটা দেবার একটা প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু একথা বলার অর্থ মনুষ্য প্রকৃতিকে খুবই ছোটো করে দেখা। কাজেই এমনি একটা অতি সস্তা বিশ্বনিন্দুকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হবার একটুও সুযোগ দিতে রাজী নই আমি। তাই আরও পরিণত বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে সাধারণ মানুষের জীবন-পরিধি অতিক্রান্ত লেখকের জীবন সায়াহ্ন যে বিশ্বজন প্রশংসায় মুখর এবং আনন্দময় হয়ে উঠে তার কারণ এই ত্রিশ বছরের গণ্ডি পেরিয়ে আর কোন কিছুই পড়ে না কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা। যতই তাদের বয়স বাড়তে থাকে যৌবনে পড়া বইগুলিই যেন আপন জ্যোতিতে স্মৃতির আলিঙ্গনে আরো ভাস্বর হয়ে উঠে এবং এক একটি বছরের পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে নব নব প্রতিভার স্বীকৃতিতে রাঙিয়ে তোলে লেখককে। লেখককে অবশ্য এগিয়ে চলতে হবে, লোকের চোখে সদাজাগ্রত তাকে থাকতেই হবে। ভাবলে চলবে না দু একটা ভালো কিছু লিখলেই চলবে তাকে। ত্রিশ চল্লিশটা বাজে এবং অর্থহীন লেখা দিয়ে ভালো কৃতিকে দাঁড়াবার ভিত্তি গড়ে দিতেই হবে। কিন্তু সময়ের প্রয়োজন এতে। এমন কিছু সৃষ্টি তাকে করতে হবে যার গুণ পাঠককে মুগ্ধ না করলেও তার ওজন বিভ্রান্ত করবে।

যদি আমার মতে, পরমায়ুকেই প্রতিভা বলি, তাহলে আমাদের যুগে এডওয়ার্ড ডিফিলডের তুলনায় খুব কম লোকই এই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছে। যাট শালে যখন তিনি যুবক (কৃষ্টিবান লোকেরা একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছিল তাঁর সঙ্গে এবং তারা এগিয়েও গিয়েছিল তাদের পথে।) তখন সাহিত্যে তাঁর স্থানটুকু ছিল শুধু একটু সম্মানের পরিধি দিয়ে সীমিত। শ্রেষ্ঠ বিচারকেরা তাকে মর্যাদা দিয়েছিল, কিন্তু তাও অকুণ্ঠ চিত্তে নয়। যুবকের দল তামাশা করত তাঁকে নিয়ে। তাঁর প্রতিভা ছিল এ কথা স্বীকার করেছিল সবাই, কিন্তু তিনি যে ইংরেজী সাহিত্যের একটি জ্যোতিষ্ক এই কথাটাই মনে আসেনি কারো। তিনি তাঁর সপ্ততিতম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করলেন; কেমন একটা অসোয়াস্তির চঞ্চলতা স্পন্দিত হয়ে গেল সাহিত্য জগতের শিরায় শিরায়, যেমন চঞ্চল হয়ে উঠে সাগরের স্থির জল সুদূর পূর্ব সাগরের বুকে আসন্ন টাইফুনের আশঙ্কায় এবং স্পষ্ট হয়ে উঠল, এক প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক ছিলেন আমাদের ভেতর এতকাল, অথচ কেউ তো টের পায়নি এতদিন। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ডিফিলডের বইগুলির জন্য ভীষণ কাড়াকাড়ি পড়ে গেল, ব্লুমসবারি চেলসা এবং অন্যান্য

বহু জায়গায় যেখানেই লেখকদের জমায়েত হয়, সেসব জায়গায় তাঁর উপন্যাসগুলো সম্বন্ধে কত প্রশংসাসূচক প্রবন্ধ নিবন্ধ আলোচনা, কোনটা ছোটো হালকা, আবার কোনটা যেমনি সুদীর্ঘ তেমনি চিন্তাশীল এবং মনোজ্ঞ রচনার কত লেখনী ব্যস্ত হয়ে উঠল। সেসব রচনা পুনর্মুদ্রিত হতে লাগল, পুরোপুরি পুস্তকাকারে অথবা সঙ্কলন পুস্তিকায়, কোনোটার শিলিং দাম, কোনোটার তিন শিলিং ছয় পেন্স, আবার কোনোটার এক গিনি দাম। তাঁর রচনাশৈলীর বিশ্লেষণ হতে লাগল, জীবন দর্শনের বিচার ব্যাখ্যা চলতে লাগল. রচনা রীতির ব্যবচ্ছেদ হতে লাগল। পচাত্তর বৎসর বয়সে সবাই স্বীকার করল সত্যি প্রতিভা ছিল. এডওয়ার্ড ড্রিফিলডের। আশী বৎসর বয়সে তিনি হলেন ইংরেজী সাহিত্যের গ্রাণ্ড-ওলড মেন, দিকপাল। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর এই আসন অটল রইল।

আজকে আমরা চারদিক খুঁজে বেড়াই। বিষণ্ণ চিত্তে ভাবি তাঁর স্থান পূরণ করবার মতো কেউ তো নেই আর। কোনো কোনো সপ্ততি বর্ষ বর্ষের বৃদ্ধ হয়তো দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পাচ্ছেন, নিশ্চিন্তভাবে ভাবছেন হয়তো তাঁরা পারবেন সে অভাব পূরণ করতে। কিন্তু এটা স্পষ্ট কিসের যেন একটা অভাব আছে তাঁদের ভেতর।

যদিও আমার স্মৃতির এই আলেখ্য বর্ণনা করতে এতটা দীর্ঘ সময় লাগল. কিন্তু আমার মস্তিষ্কের কোষে কোষে এই স্মৃতি পরিক্রমায় লাগল মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। জট পাকিয়ে এগুলো এসে ভিড় করছিল আমার মাথায় কখনো একটি দুইটি ঘটনা, আবার পরক্ষণেই ঘটনার সঙ্গে সংযোগহীন কোনো কথাবার্তার টুকি-টাকি পাঠকের সুবিধার জন্যই সেগুলোকে আমি পরম্পরা বজায় রেখে সাজিয়ে দিয়েছি। তাছাড়া এ বিষয়ে আমার মনটাও ছিল স্বচ্ছ পরিষ্কার। যেটা আমাকে বিশেষ করে বিস্মিত করেছে সেটা এই যে, এই সুদীর্ঘ দিনের পরও প্রতিটা লোকের চেহারা স্পষ্টভাবে আমার মনে আসছে, এমন কি তারা যেসব কথাবার্তা বলত তার সারমর্মও স্পষ্ট হয়ে আছে আমার স্মৃতিতে, কিন্তু কী সব পোশাক পরিচ্ছদ তারা পরত সেইটাই শুধু অস্পষ্ট হয়ে ভাসছে। আমি জানি চল্লিশ বছর আগে তারা যেসব পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করত, বিশেষ করে মেয়েদের, সেগুলো আজকালকার পোশাক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। আর যদিও আমি সেগুলো সম্বন্ধে কিছু কিছু মনে করতে পারি তাও বহুদিন পরে দেখা সেকালের ছবির প্রতিলিপি থেকে, স্মৃতি থেকে নয়।

আমার এই অলস কল্পনায় তখনো আমি মশগুল হয়েছিলাম। হঠাৎ মনে হলো একখানা ট্যাকসি এসে দাঁড়াল আমার বাড়ির সামনে। কলিং বেলটাও

বেজে উঠল। অলরয় কিয়ারের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ আমি শুনতে পেলাম। সে বাটলারকে বলছিল তার এপয়েন্টমেন্ট আছে আমার সঙ্গে। সে ভেতরে এল, পরিপূর্ণ উচ্ছ্বসিত। বিলুপ্ত অতীতের ক্ষীণ সূত্র দিয়ে কল্পনার যে শিথিল জাল আমি বুনে চলছিলাম, তার আকস্মিক আবির্ভাবের এক আঘাতেই তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। মার্চ মাসের দুরন্ত ঝড়ের হাওয়ার মতো দুর্বার এক অতিবাস্তব বর্তমানকে নিয়েই সে আমার ঘরে ঢুকল।

—এই তো. একটু আগে নিজেকে প্রশ্ন করছিলাম। আমি বললাম,—এডওয়ার্ড ডিফিলডের পর সাহিত্য জগতে 'গ্রাণ্ড ওল্ড মেনের' আসন কে অলঙ্কৃত করবে, তক্ষুনি আপনি এলেন আমার প্রশ্নের মূর্তিমান জবাব নিয়ে।

একটা উৎফুল্ল হাসিতে সে ফেটে পড়ল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার দুটি চোখে কেমন একটা সন্দেহের দৃষ্টি ঝলক দিয়ে গেল।

—আমার মনে হয় না কেউ আছে। সে বলল।

—কেন, আপনি ?

—কী যে বলেন! আমার পঞ্চাশই পার হয়নি এখনো। আরো পঁচিশটি বছর আমার চাই, তবেই না। সে হেসে উঠল, কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি আমার দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ ভাবে আটক করে রাখল—কিন্তু আপনি আবার আমার পেছনে লাগলেন কবে থেকে, বলুন তো! বলেই হঠাৎ সে তার দৃষ্টি নামিয়ে নিল। অবশ্যি ভবিষ্যতের কথা কেউ না ভেবে পারে না। যাঁরা আজ গাছের ডগায় উঠে আছেন তাঁদের সবাই পনর-বিশ বছরের বেশি বড়ো নয় আমার চেয়ে। তাঁরাও চিরকাল বেঁচে থাকবেন না। তাঁদের অবর্তমানে কে আসবে সেখানে? অবশ্যি অলড্রুম আছেন; আমার চেয়ে অনেক ছোটো, কিন্তু খুব বেশি সুস্থ-সবল নয়, তাছাড়া আমার মনে হয় না নিজের সমন্ধে তিনি বিশেষ যত্নবান।

দুর্ঘটনা বাদ দিলেও কোনো বিশেষ প্রতিভার আকস্মিক আবির্ভাবকেও আমি এই দুর্ঘটনার ভেতর ধরে নিচ্ছি। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আগামী কুড়ি পঁচিশ বছরেও কেনই বা অবস্থা আমার অনুকূলে আসবে না। প্রশ্ন, শুধু ঠিক থাকা, এবং অপরের চেয়েও বেশি দিন বেঁচে থাকা।

আমার বাড়ীওয়ালীর একখানা আর্মচেয়ারে রয় তার বিপুল দেহখানাকে ডুবিয়ে দিলে। আমি হুইস্কি আর সোডা এগিয়ে দিলাম তাকে।

—থাক, ধন্যবাদ। ছটার আগে আমি কখনো এসব খাই না, সে বলল। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল—সত্যি বেশ সুন্দর আপনার ঘরখানা।

—সে আমি জানি। কিন্তু আমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ করতে আসার আপনার উদ্দেশ্যটা কী বলুন তো?

—মিসেস ড্রিফিলডের বাড়িতে নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে দুচারটা কথা বলব ভাবছিলাম। টেলিফোনে সব কথা বুঝিয়ে বলা খুব কঠিন। আসল কথা হচ্ছে আমি ড্রিফিলডের জীবনী লিখব ঠিক করেছি।

—ও, তাই বলুন। সেদিন তাহলে আমাকে বলেন নি কেন?

রয়ের প্রতি আমার মনটা একটু নরম হলো। কেবল একটুখানি সঙ্গলাভের জন্যই রয় সেদিন আমাকে লাঞ্চ খেতে ডাকেনি। আমার মনের ঐ সন্দেহটুকু যে নেহাত অমূলক ছিল না এবং আমিও যে তার প্রতি অবিচার করিনি এইটুকু ভেবে আমি খুশি হলাম।

—আমি কিন্তু পুরোপুরি মন ঠিক করিনি। কিন্তু মিসেস ড্রিফিলডের একান্ত ইচ্ছা আমি কাজটা হাতে নিই। তিনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন বলছেন। তাঁর হাতে যেসব মাল-মশলা আছে সবই তিনি আমাকে দেবেন। বহুদিন ধরে তিনি এগুলো সংগ্রহ করছিলেন। কাজটা খুব সহজ নয় এবং আমিও অবশ্য ঠিকভাবে না করে পারব না। কিন্তু যদি কাজটা আমার হাতে উৎরে যায় তাহলে আমিও যথেষ্ট উপকৃত হব। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঔপন্যাসিকের উপর পাঠকের শ্রদ্ধা বাড়ে, যদি তিনি কখনো সখনো দু-একটা সিরিয়স কিছু লিখতে পারেন। আমার লেখা সমালোচনা গ্রন্থগুলো অতি বাজে হয়েছিল। একটি কপর্দক এর মূল্য দেয়নি, কিন্তু কোনো দুঃখ নেই সে জন্য। এরা আমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, যে প্রতিষ্ঠা এদের ছাড়া সম্ভব হতো না।

—আমার মনে হয় এটা আপনার খুব ভালো পরিকল্পনা। গত ত্রিশ বছর ধরে ড্রিফিলডকে নিবিড় ভাবে জানবার সুযোগ অনেকের চেয়ে আপনারই হয়েছে।

—হ্যাঁ, তা হয়েছে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল তখন অবিশ্যি তিনি ষাট বছর পেরিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে লিখেছিলাম তাঁর বই আমার খুব ভালো লেগেছিল, তিনিও আমাকে যেতে লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রথম জীবনের কিছুই আমার জানা নেই। মিসেস ড্রিফিলড অনেক সময় তাঁকে দিয়ে সেসব কথা বলাতে চেষ্টা করতেন, যখন ড্রিফিলড কোনো কিছু বলতেন তিনি সেটা টুকে রাখতেন। তারপর ড্রিফিলড মাঝে মাঝে যেসব ডাইরি রাখতেন সেগুলো আছে। তাছাড়া তাঁর উপন্যাস গুলিতে অনেকখানি আত্মজীবনীর মশলা পাওয়া যায়। তবে এর অনেকগুলোতে খুঁতও রয়েছে। কী রকম বই আমি লিখতে চাই বলছি আপনাকে। বইটা হবে অনেকটা খুবই নিবিড় জীবনকাহিনী। সবকিছুর এমনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ থাকবে যা নাকি মানুষের মনকে মধুময় করে তোলে, এর

সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকবে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির সমালোচনা। খুব চিন্তাশীল হবে না বটে, কিন্তু যদিও সহানুভূতির ছাপ থাকবে তবু থাকবে সন্ধানী দৃষ্টি আর......খুবই সূক্ষ্ম। কাজেই করবার অনেক কিছু আছে. অথচ মিসেস ড্রিফিলড মনে করেন আমি নাকি পারব।

—আমারও বিশ্বাস আপনি পারবেন। আমি বললাম।

—কেনই বা পারব না তারও কোন কারণ দেখি না। রয় বলল—আমি নিজেও একজন সমালোচক, তার উপর একজন ঔপন্যাসিক। এটা পরিষ্কার কিছু কিছু সাহিত্য গুণ আমার আছে। কিন্তু কিছুই আমি করতে পারব না যদি যাঁদের পক্ষে সম্ভব তাঁরা আমাকে সাহায্য না করেন।

আমার প্রসঙ্গ কোথায় এইবার আমি বুঝতে পারলাম। আমার চোখ মুখের দৃষ্টি একেবারে শূণ্য করে দিতে চেষ্টা করলাম। রয় একটু ঝুঁকে বসল।

—আমি সেদিন আপনাকে প্রশ্ন করেছিলাম ড্রিফিলড সম্বন্ধে আপনি কিছু লিখছেন কিনা? আপনি বলেছিলেন লিখছেন না। এটাকেই আপনার পরিণত সিদ্ধান্ত বলে ধরে নিতে পারি কি?

—নিশ্চয় পারেন।

—তাহলে আপনার মাল মশলাগুলো আমাকে দিতে আপনার কোনো আপত্তি আছে কি?

—তবে শুনুন বন্ধু, কিছুই আমার নেই।

—না, না, আপনি বাজে কথা বলছেন। সকৌতুকে রয় বলল, ডাক্তার ছোট্ট ছেলেকে তার গলার ভেতরটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য যেমনি ভুলোয় ঠিক তেমনি ভাবে। যখন তিনি ব্লেকস্টেবলে থাকতেন তখন নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে হামেশা দেখা সাক্ষাৎ হতো।

—তখন আমি নিতান্ত বালক।

—কিন্তু ঐ রকম একটা অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে নিশ্চয় আপনি খুব সচেতন ছিলেন। তাছাড়া এডওয়ার্ড ড্রিফিলডের সঙ্গে অর্দ্ধঘণ্টা কাটিয়ে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে মুগ্ধ না হয়ে পারবে এমন তো কেউ নেই। ষোল বছর বয়সের একটি বালকের কাছেও বোধহয় এটা খুব পরিষ্কার ছিল, তাছাড়া ঐ বয়সের অনেক ছেলের চেয়ে বেশি কৌতুহলী এবং স্পর্শকাতর ছিলেন বোধহয় আপনি।

—জানি না তাঁর পরবর্তী জীবনের সম্মান এবং প্রতিষ্ঠার সহায়তা ছাড়া তাঁর ব্যক্তিত্ব কখনো অসাধারণ মনে হতো কিনা। আপনি কি মনে করেন ঐ মিঃ আর্টাকিনসের মতো, ঐ যে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট যিনি তাঁর লিভারের অসুস্থতার জন্য অতিরিক্ত জল পান করতেন, পশ্চিম ইংলণ্ডের কোনো

জায়গায় বায়ু পরিবর্তন করতে গিয়ে যাদের সঙ্গে পরিচয় হবে তাঁরাই আপনাকে অতি চরিত্রবান বলে মনে করে নেবে ?

—তবে এটুকু আমি মনে করতে পারি যে দিন কয়েকের ভেতর তারা অন্তত এইটুকু বুঝতে পারবে যে আমি একজন অতি সাধারণ মানুষ বা একজন মামুলি চারটার্ড একাউনটেন্ট নিশ্চয় নই। রয় বলল, মুখের কোণে এমন একটুখানি স্মিতহাসি ছিল যা তার ঐ কথাটার ভেতর থেকে আত্মগরিমার সুরটুকুকে ঢেকে দিয়েছিল।

—যাক্ গে, তবে আপনাকে এইটুকু বলতে পারি, সে যুগে ড্রিফিলডের যে জিনিসটা আমাকে বেশী সচেতন করত সেটা তাঁর নিকার-বোকার সুট। ওটা আমার বেশীরকম জাকজমক লাগত। অনেকদিন আমরা একসঙ্গে সাইকেল চালাতাম, এবং তাঁদের সঙ্গে মিলতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়ার ভাবনাটা সবসময় আমার অসোয়াস্তিকর লাগত।

—ভারি মজা লাগে এখন কথাটা শুনতে। তিনি তখন কিসব কথাবার্তা বলতেন ?

—কি জানি, মনে নেই ; তেমন কিছু না। স্থাপত্য শিল্পের প্রতি তাঁর বিশেষ রকম আগ্রহ দেখতাম, চাষবাসের কথাও তিনি বলতেন। কোনো ভালো সরাইখানা চোখে পড়লেই মিনিট কয়েক বসে একটু বিয়ার পান করবার জন্য তিনি অনুরোধ করতেন। তারপর বাড়িওয়ালার সঙ্গে ফসল বা কয়লা বা এমনি সব কিছুর দরদাম নিয়ে আলোচনা করতেন।

আমার স্মৃতি-চারণা চলতে লাগল। যদিও রয়-এর মুখের অভিব্যক্তি থেকে বুঝতে পারলাম, সে নিরাশ হলো। সে শুনছিল, কিন্তু কেমন একটা ক্লান্তি তার চোখে মুখে ফুটে উঠছিল। হঠাৎ আমার মনে হলো এমনি ক্লান্তি আসলেই যেন সে খিটমিটে হয়ে উঠে। কিন্তু যদিও আমাদের ঐ সুদীর্ঘ দ্বি-চক্রযান পরিক্রমাকালিন ড্রিফিলড এমন বিশেষ কিছু বলতেন কিনা আমার কিছুই মনে নেই, তবু সেসময়কার অনুভূতির কথা আমার বেশ স্পষ্ট মনে ছিল। ব্লেকস্টেবলে এমনি একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে, যদিও উহা সমুদ্রতীরবর্তী এবং সুদীর্ঘ বেলাভূমি ও পশ্চাৎ প্রান্তে কিছুটা জলাভূমি ছিল, তবু আধমাইলটাক ভেতরে ঢুকেই পাওয়া যেত কেন্ট এলাকার একখানা পরিপূর্ণ পল্লীঅঞ্চল। বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ আর বিরাট এম গাছের বীথিকার ভেতর দিয়ে চলে গেছে আঁকাবাঁকা পথগুলো। প্রাচুর্য আর মর্যাদায় যেন ভরপুর ! মাখন, ঘরে-তৈরি রুটি, ক্রিম আর টাটকা ডিম খেয়ে পুষ্ট কেন্ট অঞ্চলের পল্লী রমণীর মতোই যেন সজীব আর স্বাস্থ্যবতী। কখনো বা সেসব পথ অতি সঙ্কীর্ণ গলি মাত্র। দুই পাশে হথর্ণ গাছের ঘন ঝোপঝাড়, তার

উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ কাঁচ এম গাছের সারি! আবার তারই ফাঁকে ফাঁকে উপরে তাকালে দেখা যায় শুধু এক এক ফালি আকাশ। মিঠে হাওয়ার ভেতর দিয়ে চলতে চলতে একটা অনুভূতি মনকে পেয়ে বসবে। বুঝি পৃথিবীটা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে সেখানে। বুঝি জীবন বেঁচে থাকবে অনন্তকাল। যদিও সাইকেলের পাদানি ঘুরবে তীব্র বেগে তবুও কেমন এক মিঠে অলস অনুভূতি বুঝি শিথিল করে আনবে সব ইন্দ্রিয়কে। কেউ কোনো কথা না বললেই যেন ভালো লাগবে। তারপর দলের কেউ যদি অকস্মাৎ দ্বিচক্রযানের গতি বাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যায় দলকে পেছনে ফেলে, এক নিতান্ত কৌতুক বলেই উপভোগ করবে সবাই। ফেটে পড়বে হাসির আনন্দে, সঙ্গে সঙ্গে গতিও বাড়বে অন্য সবারও। তারপর চলবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ একে অন্যকে। সবাই হেসে উঠবে নিজেদের রসিকতায়। কখনো দু একখানা কুটির চোখে পড়বে পথের ধারে, কুটিরের সামনে তেমনি ছোটো ছোটো এক একটি বাগান, হলি-হকস আর টাইগার লিলি ফুটে আছে বাগানগুলি। পথ ছাড়িয়ে একটু দূরেই দেখা যাবে প্রশস্ত গোলাবাড়ি ঘেরা খামার বাড়ি। আবার কোথাও পড়বে হপের বিস্তীর্ণ মাঠ। পাকা ফলগুলি ঝুলে আছে মালার মতো। সরাইখানাগুলিও তেমনি আন্তরিক তেমন সাদাসিধে। কুটিরগুলির চেয়েও বৈশিষ্ট্য কিছু নেই, সামনের বাগানে দেখা যাবে ফুটে আছে অজস্র 'হনিসাকল'। সরাইখানার নামগুলিও আবার তেমনি মামুলি, তেমনি পরিচিত, 'জলি সেলর 'মেরী প্লাউমার্ণ' 'দি ক্রাউন এণ্ড এঙ্কার এবং 'দি রেড লায়ন'।

অবশ্য এসব কিছুর মূল্য নেই রয়-এর কাছে। সে আমাকে বাধা দিল।

—সাহিত্য সম্বন্ধে কখনো কি তিনি কিছু বলতেন না? সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল।

—মনে পড়ে না! তিনি ও ধরনের লোক ছিলেন না। আমার ধারনা তাঁর লেখা সমন্ধে তিনি ভাবতেন, কিন্তু কখনো কিছু উল্লেখ করতেন না। তিনি কিউরেটকে বই ধার দিতেন। শীতকালে খ্রীষ্টমাসের ছুটির সময় প্রায় প্রত্যেক দিন তাঁর বাড়িতে আমি চা খেতে যেতাম। কোনো কোনো দিন কিউরেট এবং তিনি বই সম্বন্ধে আলোচনা করতেন, কিন্তু আমরা তাঁদের ঐ আলোচনা থামিয়ে দিতাম।

—তিনি যেসব কথা বলতেন তার কিছুই কি আপনি মনে করতে পারেন না?

—মাত্র একটি প্রসঙ্গ আমার মনে আছে। আমার মনে আছে কারণ যে বই সম্বন্ধে তিনি বলছিলেন সেগুলো আমি কোনোদিন পড়িনি। কাজেই তাঁর কথা শুনেই আমার পড়বার আগ্রহ বেড়েছিল। তিনি বলেছিলেন সেক্সপীয়র

জীবন সায়াহ্নে যখন স্ট্যাটফোর্ড-অন-এভনে গিয়ে অবসর যাপন করছিলেন তখন যদি কখনও বা তাঁর নাটকগুলো সম্বন্ধে ভাবতেন, তবে যে দুটোর কথা তাঁর বিশেষ করে মনে পড়ত সে দুটো হলো. মেসার্স ফর মেসার্স এবং ট্রয়লাস ও ক্রেসিডা।

—কথাটা বেশ হৃদয়গ্রাহী বলে মনে হচ্ছে, না। আচ্ছা সেক্সপীয়র ছাড়া আরও আধুনিক কারও সম্বন্ধে তিনি কিছু বলতেন না?

—তা সে সময় কিছু বলতেন বলে আমার মনে পড়ে না; কিন্তু কয়েক বছর আগে একদিন লাঞ্চ খেতে গিয়ে ড্রিফিলডকে বলতে শুনেছিলাম যে ইংরেজদের পল্লীভবনে চায়ের আসরের টুকিটাকির কথা বলতে গিয়ে হেনরি জেমস পৃথিবীর ইতিহাসের একটা অবিস্মরণীয় ঘটনাকে কোনো মূল্য দেননি।
ঐ বৃদ্ধকে সেই সময় একটা ইতালীয় শব্দ ব্যবহার করতে শুনে আমি একটু অবাক হয়েছিলাম, একটু মজাও পেয়েছিলাম এই জন্যে যে কী মাথামুণ্ডু তিনি বলছিলেন সেদিনকার আসরে উপস্থিত এক বিপুল দেহা ডাচেস ছাড়া সেটা বুঝবার মতো আর কেউ ছিলেন না। তিনি বলছিলেন "বেচারা হেনরি, অনন্তকাল ধরে সে একটা রাজকীয় উদ্যানের চারদিকে কেবল ঘুরে মরছে বেড়াটা এত বেশী উঁচু যে উঁকি দিয়েও সে দেখতে পারবে না একটিবার। তাছাড়া ওদের চায়ের আসরও এত দূরে যে কাউন্টেসের কোনো কথাই আসবে না তার কানে।"
আমার কাহিনী বেশ একটু আগ্রহ নিয়েই রয় শুনতে লাগল। চিন্তান্বীতভাবে সে তার মাথাটাও হঠাৎ নাড়তে লাগল।

—এটাকে বোধহয় আমি কাজে লাগাতে পারব না। তাহলে হেনরি জেমসের দল ইস্টক বর্ষণের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর······কিন্তু ঐসব সান্ধ্য আসরে আপনি কি করতেন?

—আমরা হুইস্ট খেলতাম। আর ড্রিফিলড রিভিউ লিখবার জন্য বই পড়তেন। কখনও গান গাইতেন।

—এটা খুব কাজের কথা। বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গে ঝুঁকে পড়ে রয় বলল— তিনি কী ধরণের গান গাইতেন আপনাদের মনে আছে?

—পরিষ্কার মনে আছে। 'অল থ্রু স্টিকিং টু এ সোলজার' এবং 'কাম হিয়ার দি বুজ ইজ চীয়র, এই দুটি তাঁর অতি প্রিয় গান ছিল।

—ও!

আমি লক্ষ্য করলাম এবারও রয় নিরাশ হয়েছে।

—কেন? তিনি 'সুমান' গাইবেন এই আশা আপনি করেছিলেন বোধহয়? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—কেন করব না তাও বুঝি না। সুন্দর একটা মশলা পেতাম। তবে সাগর সঙ্গীত, পল্লীগীতি ইত্যাদি গ্রামের লোকেরা যেসব গান গেয়ে থাকে—অন্ধ বাজিয়ের হাতে একতারা আর পল্লীর কৃষক-পুরুষ কৃষক-পত্নীর হাত ধরে নাঁচতে নাচতে যা সব গায়, তিনিও এসব গাইতেন এই আশাই আমি করতাম। ওথেকে বেশ একটা সুন্দর কিছু আমি রূপ দিতে পারতাম, কিন্তু এডওয়ার্ড ড্রিফিলডের মুখে ঐ রকম বল-রুম সঙ্গীত আমি ভাবতেও পারি না। কেননা যখনই কারো ছবি আপনি আঁকবেন তাঁর আসল রূপকে প্রকাশ করতেই হবে আপনাকে। সঙ্গতিহীন কিছু ঢুকিয়ে দিলেই এলোমেলো হয়ে যাবে সবকিছু।

—আপনি তো জানেন, এর কিছুদিন পরই তিনি ডুব মেরেছিলেন। অনেককে ডুবিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রায় একটা পুরো মিনিট রয় চুপ করে রইল এবং খুবই চিন্তান্বিত ভাব নিয়ে কার্পেটের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল।

হ্যাঁ, আমি শুনেছি এমনি একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল। মিসেস ড্রিফিলড বলে ছিলেন। এও শুনেছি ফার্নে কোর্টের বাড়িটা কিনে ঐ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করবার আগেই তিনি ঐসব মিটিয়ে ফেলেছিলেন। তবে আমার মনে হয় না তাঁর সাহিত্যিক জীবনের গতি-প্রকৃতির ইতিহাস লিখতে গিয়ে এমনি সব ছোটো-খাটো ঘটনার আদৌ কোনো গুরুত্ব আছে। আসলে এই ঘটনা ঘটেছিল প্রায় চল্লিশ বছর আগে। আপনি তো জানেন, কয়েকটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল এই বৃদ্ধের। অমনি একটা ক্ষুদ্র কেলেঙ্কারির পর ঐ ব্লেকস্টেবলের আশেপাশে কোথাও বাস করবার জন্য স্থান বেছে নেওয়া অনেকের কাছেই খুব বিস্ময়কর লাগবে, বিশেষ করে জীবনের প্রতিষ্ঠা এবং সম্মান অর্জন করবার পর যেস্থান নিজের অতি ক্ষুদ্র পরিবেশে জন্মের স্মৃতিবিজড়িত। কিন্তু তিনি এসব কিছু মনে করতেন না। মনে হতো সবটাকেই একটা বিরাট কৌতুক বলে তিনি মেনে নিতেন। যাঁরা তাঁর সঙ্গে লাঞ্চ খেতে আসতেন তাঁদের সবাইকে তিনি এ ঘটনার কথা বলতেন। মিসেস ড্রিফিলড অবশ্য এতে খুব বিরত বোধ করতেন। এমিকে আরো ভালো ভাবে যদি আপনি জানতেন আমি খুশি হতাম। তিনি একজন অপূর্ব মহিলা। অবিশ্যি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অনেক আগেই ড্রিফিলড তাঁর সেরা বইগুলো রচনা করেছিলেন, কিন্তু আমি মনে করি না এ কথাটা কেউ অস্বীকার করবে যে, জীবনের শেষ পঁচিশটি বৎসর যে প্রভূত প্রতিভা-শালী ব্যক্তিটির সঙ্গে পৃথিবীর লোকের পরিচয় ছিল তার রূপায়নের মূলে ছিলেন ঐ একটি মহিলা। আমার কাছে তাঁর কিছুই গোপন ছিল না।

কিন্তু তাঁর এই কর্তব্যটুকু পালন করা খুব সহজ ছিল না।

বৃদ্ধ ড্রিফিলডের কতগুলো বিদঘুটে অভ্যাস ছিল, এবং তাঁকে দিয়ে শোভন আচরণ করাতে গিয়ে মিসেস ড্রিফিলডকে অনেক বুদ্ধি খরচ করতে হতো। কোনো কোনো বিষয়ে বৃদ্ধের ভারি একগুয়েমি স্বভাব ছিল এবং আমার মনে হয় আরো কম চরিত্রবল বিশিষ্টা মহিলা হয়তো তাঁকে নিয়ে হতাশ হতেন। এই যেমন ধরুন না, তাঁর একটা বদ্-অভ্যাস ছিল। যেটাকে ছাড়াতে গিয়ে বেচারা এমিকে ভীষণ বেগ পেতে হয়েছিল। মাংস বা সবজি যাই হোক না, খাওয়া শেষ করে এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে খাবার প্লেটটা মুছে নিয়ে সেই রুটির টুকরোটা খেয়ে ফেলা ড্রিফিলডের একটা অভ্যাস ছিল।

—আপনি জানেন এর কী অর্থ? আমি বললাম—এর অর্থ এই, দীর্ঘকাল তাঁকে এত অভাবে কাটাতে হয়েছিল যে এক কণা খাদ্যও তিনি নষ্ট করতে পারতেন না।

—বেশ তা হতে পারে। কিন্তু তাঁর মতো একজন প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকের পক্ষে নিশ্চয়ই এটা একটা খুব ভালো অভ্যাস নয়। তারপর তিনি ঠিক নেশা করতেন না বটে, কিন্তু ব্লেকস্টেবলের বিয়ার এত কিনে খেতেন এবং পাবলিক বার-এ গিয়ে বিয়ার খেতে ভালোবাসতেন। অবশ্যি এতে কোনো দোষ ছিল না, কিন্তু খুব জানাজানি হয়ে যেত। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে যখন নেশাখোরের ভিড় জমত সেখানে। কার সঙ্গে কথা বলছেন এ তিনি মনেই করতেন না কখনো। তিনি যেন বুঝতেন না বলে মনে হতো যে, তাঁর একটা বিশেষ সম্মান আছে, যেটাকে রক্ষা করা একান্ত দরকার। আপনি নিশ্চয় অস্বীকার করবেন না যে ব্যাপারটা আরো বিসদৃশ ঠেকে যখন এঁরাই আবার বিশিষ্ট লোকদের তাঁদেরই বাড়িতে খেতে ডাকেন। (যেমন এডমণ্ড গচ, বা লর্ড কার্জন) এবং পরে পাবলিক হাউসে গিয়ে প্ল্যাম্যার রুটিওয়ালা সেনেটারি ইনসপেকটরদের কাছেই বলে বেড়ান কেমন লাগল ঐসব লোকদের। তবে এসব অবশ্যি যুক্তি দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব। কেউ হয়তো বলবে স্থানীয় রঙ পরিবেশ আর টাইপ চরিত্রের খোঁজেই তাকে মিশতে হতো ঐসব পরিবেশের সঙ্গে। কিন্তু তাঁর এমন কতগুলো অভ্যাস ছিল, যেগুলোকে আয়ত্তে আনা খুবই কঠিন হতো। আপনি হয়তো জানেন না, মিসেস ড্রিফিলড বহু সাধ্য সাধনা ও কষ্ট করে ড্রিফিলডকে স্নান করাতে পারতেন। তিনি যে যুগে, জন্মেছিলেন সেসময় বেশি স্নান করা লোকে অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস বলে মনে করত। তাছাড়া, আমার মনে হয় তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়স হওয়ার আগ পর্যন্ত এমন কোনো বাড়িতে তিনি বাস করেননি যেখানে স্নানঘর থাকত।

—তিনি বলতেন সপ্তাহে একবারের বেশি কোনোদিন তিনি স্নান করতেন না। কাজেই জীবনভোর এই অভ্যাস পরিত্যাগ করবার কোনো কারণ আছে বলে তিনি মনে করতেন না। তারপর এমি তাঁকে নিচের জামা রোজ বদলাতে বলতেন, কিন্তু এতেও তিনি আপত্তি করতেন। তিনি বলতেন, সপ্তাহ ধরে একই ভেস্ট এবং ড্রয়ার তিনি বরাবর পরে এসেছেন, কাজেই ঘন ঘন বদলানো অর্থহীন। তাছাড়া, বারবার কাঁচতে গেলে ছিঁড়ে যাবে তাড়াতাড়ি। কিন্তু মিসেস ড্রিফিলড তাঁকে দিয়ে প্রতিদিন স্নান করাবার অভ্যাস করাতে সবরকম ফন্দির আশ্রয় নিতেন। বাথ সল্ট, বিভিন্ন রকম সুগন্ধি, সব কিছু দিয়ে চেষ্টা করতেন, কিন্তু জানেন, কিছুতেই ড্রিফিলকে রাজী করান যেত না এবং পরপর যতই বয়স বাড়তে লাগল সপ্তাহে একদিনও আর স্নান করতে চাইতেন না! তারপর মিসেস ড্রিফিলডের মুখেই শুনেছি জীবনের শেষ তিনটি বছর তিনি নাকি আদৌ স্নান করতেন না। অবশ্যি এসব কথা কেবল আপনার আমার ভেতরই। আমি আপনাকে এসব বলছি শুধু এইটুকু বোঝাবার জন্য যে, এই জীবনী লিখতে গিয়ে আমাকে কতখানি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আমি এই কথাটা বুঝি না লোকে কেমন করে অস্বীকার করবে যে টাকা পয়সার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত বিবেক -হীনতার পরিচয় দিতেন, এবং সমাজে তাঁর চেয়ে নিম্নস্তরের মানুষের সঙ্গে মিশবার একটা অদ্ভুত প্রবণতা ছিল তাঁর ভেতর, অত্যন্ত আনন্দ পেতেন এতে, তাছাড়া তাঁর কতকগুলো ব্যক্তিগত অভ্যাসও ছিল ভারি অশোভন। তবে আমার মনে হয় না তাঁর চরিত্রের এই দিকটা খুব বেশী প্রকট ছিল সবার কাছে। যা অসত্য এমন কিছু আমি বলতে চাই না। তবে আমার বিশ্বাস তাঁর চরিত্রের এমন কতকগুলো গুণ ছিল যা নাকি অবলা রয়ে গেছে।

—আপনার কি মনে হয় না তাঁর জীবনের সবকিছু পুঙ্খনাপুঙ্খ বললেই জিনিষটা আরো সুন্দর হবে? সে সম্ভব হবে না। এমি ড্রিফিলড আর নতুন করে আমাকে কিছু বলবেন না। তিনি আমাকে জীবনী রচনা করতে বলেছেন। কারণ আমার বিচার বুদ্ধির উপর তাঁর অশেষ আস্থা। কাজেই আমাকেও ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করতেই হবে।

—ভদ্রলোক এবং লেখক দুটো একসঙ্গে হওয়া কিন্তু খুবই কঠিন।

—আমি কিন্তু কোনো কারণ দেখি না। তাছাড়া, সমালোচক কীরকম জীব সে আপনি জানেন। যদি সত্যি কথা বলেন তারা বলবে আপনি সিনিক, এই সিনিক আখ্যা পাওয়া লেখকের পক্ষে খুব গৌরবের কিছু নয়! অবশ্যি এ আমি অস্বীকার করি না যে বিবেককে বর্জন করতে পারলে নিশ্চয় একটা হৈচৈ

সৃষ্টি করে তুলতে পারতো। রূপের প্রতি লোকটির মোহ তার কর্তব্যের প্রতি অবহেলা, তার সুন্দর রচনাশৈলী, জল আর সাবানের প্রতি বিরূপ মনোভাব, তার আদর্শবাদ এবং কুখ্যাত সারইখানায় গিয়ে মদ্যপান, এসব কিছু বললে খুব মজার হবে জিনিষটা, কিন্তু সত্যি বলতে কি, কোন লাভ হবে কি ? সবাই বলবে আমি লিটন স্ট্রেচিকে অনুকরণ করেছি। না সে হয় না। একটু সূক্ষ্ম, একটু বুদ্ধির ছাপ, এমনি কিছু—আপনি তো ভালোই জানেন কিসের প্রয়োজন—অমনি কিছু করতে পারলেই বোধহয় ভালো হবে আমার পক্ষে। আমার মনে হয় বই লিখতে শুরু করবার আগেই বইয়ের রূপটিকে চোখে আনা দরকার। কতকটা ভেন ডাইকের আঁকা প্রতিকৃতির মতো। এই ধরুন, কিছুটা পরিবেশ কিছুটা গাম্ভীর্য, সবার উপর একটুখানি আভিজাত্যের ছাপ। আপনি বুঝতেই পারছেন বোধহয় আমি কী বলছি ? সর্বসাকুল্যে প্রায় আশি হাজারের মতো শব্দ।

সৌন্দর্যানুভূতির কল্পনায় কিছুক্ষণ মোহাবিষ্ট হয়ে রইল সে। তার মানস চোখে একটা বইয়ের প্রতিকৃতি সে দেখতে পেল। রয়াল অক্টাভো সাইজ, হাতে নিতেও বেশ হালকা, সুন্দর কাগজে স্পষ্ট সুন্দর বড়ো বড়ো হরফে এবং চওড়া মারজিন রেখে ছাপা, এবং আমার মনে হয় এও সে দেখল, কালো নরম কাপড় দিয়ে বাঁধানো তার উপর সোনালী অক্ষরে কারুকার্য করা। কিন্তু একটু আগে আমি যেমন বলছিলাম মানুষ বলেই হয়তো অলরয় কিয়ার সৌন্দর্যানুভূতির আনন্দ চেপে রাখতে পারল না বেশিক্ষণ। আমার দিকে তাকিয়ে একটু নিরস হাসি হাসল সে।

—কিন্তু প্রথম নম্বর মিসেস ড্রিফিলডকে নিয়ে আমি কী করব ?

—সর্ষের মধ্যে ভুত, তাই না ? আমি বললাম।

—তাঁর প্রসঙ্গ সত্যি ভারি বিশ্রী ঠেকে আমার কাছে। ড্রিফিলডের সঙ্গে বহুকাল তিনি বিবাহিত জীবন কাটিয়ে ছিলেন। এ বিষয়ে এমির মত খুবই স্পষ্ট, কিন্তু তাঁর মতকে কী দিয়ে আমি মোকাবিলা করব তাই ভেবে পাচ্ছি না। জানেন, তাঁর ধারণা রোজ ড্রিফিলডের একটা কুৎসিত প্রভাব ছিল স্বামীর উপর, তাঁকে নৈতিক দৈহিক এবং আর্থিক ধ্বংশের পথে ঠেলে দেবার জন্য যা কিছু সম্ভব সবই তিনি করেছিলেন। সব দিক দিয়ে তাঁর চেয়ে অনেক ছোটো ছিলেন তিনি। অন্তত মনীষা এবং আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে তো বটেই। এবং তাঁর ভিতর জীবনী শক্তির প্রাচুর্য আর অসীম শক্তি ছিল বলেই ধ্বংসের মুখ থেকেও তিনি বেঁচে আসতে পেরেছিলেন। তাঁদের ঐ বিয়েটা সত্যি খুব দুর্ভাগ্যজনক ছিল। এটা সত্যি তিনি মারা গেছেন আজ এক যুগ এবং পুরণো কলঙ্কের কাহিনী ঘেটে

প্রকাশ্যে তার প্রচার করতে যাওয়াটা খুবই দুঃখের বিষয়। তবু ঘটনাটা এই থেকে যায় যে ডি্রফিলড যে সময় রোজি ডি্রফিলডের সঙ্গে বাস করতেন তখনই তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর শেষ জীবনের রচনাগুলি যতই আমার ভালো লাগুক, অবশ্য তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমার চেয়ে সচেতন আর কেউ আছে কিনা জানিনা এবং সেগুলোর ভেতর এমন একটা সংযম ও ক্লাসিক-সুলভ গাম্ভীর্য বর্তমান যে প্রশংসা না করে উপায় নেই। তবু আমি স্বীকার করব, যে সজীবতা, যে তীক্ষ্ণতা এবং জীবনের যে সৌরভ আর উদ্দামতা তাঁর প্রথম জীবনের সাহিত্য-কর্মকে স্পন্দিত করেছিল, তারই নিশ্চিত এবং স্পষ্ট অভাব এইগুলোতে। আমি নিশ্চিত অনুভব করি তাঁর প্রথমা স্ত্রীর জীবন্ত প্রভাব ছড়িয়ে আছে তাঁর সৃষ্টকর্মে, এ কিছুতেই আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না।

—এ সম্বন্ধে আপনি কী করবেন মনে করছেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—দেখুন, তাঁর জীবনের এই দিকটাকে বিশেষ সংযম এবং সতর্কতা নিয়ে আলোচনা করা যাবে না। যাতে কারো স্পর্শ প্রবনাতে আঘাত না দেয়, অথচ পুরুযোচিত স্পষ্টবাদিতার অভাব থাকে না, এ আমি বুঝতে পারি না; আমি কী বলতে চাইছি আপনি বুঝতে পারছেন হয়তো, তাহলেই জিনিষটা হৃদয়গ্রাহী হবে বোধহয়।

—বিষয়টা বড়ো বেশি ভারি ভারি শোনাচ্ছে।

—আমার যা মনে হয়, শুধু 'টি'-র মাথা কাটা আর 'আই'-এর মাথায় বিন্দু বসানোই নয়। আসল রূপটুকু ফুটিয়ে তোলাই প্রশ্ন। যতটুকু আমি না বলে পারব না, তার বেশি আমি বলব না। তবে পাঠকের অনুধাবনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন বলতেই হবে আমাকে। আপনি তো জানেন, বিষয়বস্তু যতই হীন হোক না কেন, তার অপ্রিয়তাকেও কাটিয়ে তোলা যায় শুধু একটু মর্যাদার ছোঁয়াচ দিয়ে। কিন্তু সব মালমশলা হাতে না আসলে কিছুই আমি করতে পারব না।

—যদি কিছু না থাকে আপনি তৈরি করতে পারবেন না নিশ্চয়ই।

রয় অতি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে নিজেকে প্রকাশ করছিল, সার্থক বক্তার একটি রূপ ব্যক্ত হয়ে উঠছিল। নিজের মনে মনে আমি কামনা করছিলাম, আমিও যদি ঠিক এমনি বেগ এবং নির্ভুলভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারতাম, শব্দের অভাব হবে না, বাক্যের পর বাক্যের প্রবাহ বয়ে আসবে অপ্রতিহত ভাবে, এবং যে আগ্রহী এবং কৌতুহলী অদৃশ্য শ্রোতার সম্মুখে রয়-এর এমনি ভাষণ চলছিল: নিজেকে তাদেরই একজন বলে পরিচয় দিতে এতটা অক্ষম মনে না করতাম। কিন্তু এরপর রয় একটু থামল। তার মুখে

একটা কমনীয়তা যেন ফুটে উঠল। অতি উত্তেজনায় যা রাঙিয়ে উঠেছিল, দিনের উত্তাপে ঘেমে উঠেছিল, যে চোখ দুটি সর্বগ্রাসী উজ্জ্বলতা নিয়ে আমাকে স্থির-বিদ্ধ করে রেখেছিল তাও যেন ধীর ধীরে নরম হয়ে আসল। সে দৃষ্টি যেন ফিক্ করে হেসে ফেলল।

—এইখানেই আমার প্রয়োজন আপনাকে। খুশির ভাব নিয়ে বলল সে।

যখন কিছু বলবার নেই তখন আদৌ কোনো কথা না বলা এবং মন্তব্যের কী উত্তর ঠিক করতে না পারলে নিজের জিবকে সংযত রাখা সবক্ষেত্রে একেই আমি জীবনের সেরা প্লান বলে প্রমাণ পেয়েছি। আমি নীরব রইলাম এবং রয় এর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রইলাম—ব্রেকস্টেবলে তাঁর জীবন যাত্রা সম্বন্ধে অনেকের চেয়ে বেশি বোধহয় আপনি জানেন।

—সে আমি জানি না। ব্রেকস্টেবলে এমন বহু লোক আছে যারা সে যুগে আমি যতটুকু জানতাম তারাও ততটুকু জানত।

—হতে পারে, তবে তারা এমন কিছু গণ্য-মান্য লোক নয় নিশ্চয়ই, এবং এ নিয়ে তারা মাথাও ঘামায় না আমার বিশ্বাস।

—ও, এইবার বুঝতে পারছি। আপনি মনে করছেন হাটে হাঁড়িটা ভাঙবার একমাত্র যোগ্য লোক আমি, তাই না ?

—তা কতকটা বলতে পারেন। অবিশ্যি আপনি যদি ব্যাপারটাকে এমনিভাবে নেওয়াই সমীচিন মনে করেন।

বুঝতে পারলাম ঠিক হাস্য-কৌতুকের দিকে ঝুঁকতে সে রাজী নয়। আমি বিরক্ত বোধ করিনি। কারণ আমার ঠাট্টা তামাসা বুঝতে পারে না এমন লোক অজানা নেই আমার। আমি অনেক সময় ভাবি, যে-রসিক লোক নিজের কৌতুকে হাসতে পারে আপন মনে সেই বুঝি খাঁটি শিল্পী।

—তারপর লণ্ডনেও অনেকবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বোধহয় আপনার ?

—হ্যাঁ।

—লোয়ার বেলগ্রেভিয়ার কাছাকাছি কোথাও যখন এপার্টমেণ্ট নিয়ে থাকতেন সেই সময়, কেমন ?

—হ্যাঁ, পিমলিকোতে আবাসিক ছিলাম।

রয় একটু শুষ্ক হাসি হাসল।

—লণ্ডনের যে এলাকায় থাকতেন তার নামাকরণ নিয়ে ঝগড়া করে লাভ নেই। আপনার সঙ্গে খুবই অন্তরঙ্গতা ছিল সেই সময়।

—অনেকটা

—কতদিন তা ছিল ?

—প্রায় বছর দুই।

—তখন আপনার বয়স কত ছিল ?
—কুড়ি।
—দেখুন, এইবার আমাকে একটা অনুগ্রহ করতে অনুরোধ করব আপনাকে। খুব বেশি কিছু করতে হবে না। অথচ আমার কাছে এর মূল্য হবে অপার। ড্রিফিলড সম্বন্ধে আপনার যা কিছু মনে আছে সেগুলো যতদূর সম্ভব লিখে দেবেন এই আমার প্রার্থনা আপনার কাছে। তাছাড়া ব্লেকস্টেবলে এবং লণ্ডনে তাঁর স্ত্রী এবং অন্যান্য আত্মীয়-পরিজন সম্বন্ধে যা আপনার মনে আছে সব কিছু।
—ঐ দেখ, এযে আপনি অনেক কিছু চাইছেন। আমার হাতে যে এখন প্রচুর কাজ।
—বেশী সময় আমি চাইব না আপনার কাছে। এই একটু খসড়া মতন টুকে দিলেই আমার চলবে। লেখার স্টাইল বা অন্য কিছু সম্বন্ধে ভাবতে হবে না আপনাকে। সে ব্যবস্থা আমি করে নেব। আমি চাই কেবল ঘটনার উল্লেখ। আসলে ওসব কেবল আপনি জানেন, আর কেউ জানে না। দেখুন, আমি বাহুল্য বা এমনি কিছু বলতে চাই না, কিন্তু ড্রিফিলড একজন প্রতিভাধর লোক ছিলেন। তাঁর স্মৃতির খাতিরে এবং ইংরেজী সাহিত্যের স্বার্থের খাতিরে আপনি যা জানেন তা বলা নিশ্চয় একটা কর্তব্য আপনার। আমি আপনাকে অনুরোধ করতাম না, কিন্তু সেদিন আপনি নিজেই বললেন আপনি কিছু লিখতে চান না ওঁর সম্বন্ধে। যে মাল-মশলা-গুলো আপনি কাজে লাগাবেন না, সেগুলো নিয়ে বসে থাকা এক রকম গর্হিত নীতি বলেই মনে হবে না কি ?
এমনি করেই রয় একই সঙ্গে আমার কর্তব্যবুদ্ধি, আমার সহনশীলতা, আমার সদাশয়তা আর সততার কাছে তার আবেদন জানান।
—কিন্তু মিসেস ড্রিফিলড আমাকে ফার্নে কোর্টে গিয়ে কদিন কাটিয়ে আসতে অনুরোধ করছেন কেন বলুন তো ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম ?
—দেখুন, বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। দিন কয়েক কাটিয়ে আসবার পক্ষে খুবই সুন্দর পরিবেশ বাড়িটার। আদর আপ্যায়নে তিনি সিদ্ধহস্ত, তাছাড়া এসময় পল্লী অঞ্চল অপূর্ব লাগবে দেখবেন। তাঁর ধারণা আপনি যদি স্মৃতিকথা লিখতে রাজী হন তাহলে তার উপযোগী পরিবেশ আপনি পাবেন সেখানে। আমি অবিশ্যি তাঁকে বলেছিলাম, আমার পক্ষে কোনো কথা দেওয়া সম্ভব নয় কিন্তু এটা ঠিক ব্লেকস্টেবলের অতি কাছে থেকে যেসব কথা কোনদিন হয়তো মনেও আসত না, আপনি ভুলে যেতেন সেসব কথাও আপনার স্মৃতিতে এসে ভিড় করবে! তারপর, তাঁরই

বাড়িতে বসে তাঁরই বই এবং অন্যান্য সব কিছুর সংস্পর্শে এসে বিস্মৃত অতীত হয়তো অতি বাস্তবরূপে প্রকাশ পাবে। সবাই আমরা তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারব, আপনি তো জানেন এমনি ধারা আলোচনার উত্তেজনার ভেতর ভুলে যাওয়া অনেক কিছুই ফিরে আসে স্মৃতিতে। অত্যন্ত চতুর মহিলা এই মিসেস ড্রিফিলড! বহু বছর ড্রিফিলডের মুখের অনেক কথা টুকে রাখা তাঁর একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া এ ও সম্ভব আলোচনার ভেতর এমন কথাও হয়তো আপনি বলে ফেলবেন লিখতে বসে যেসব হয়তো লিখতেন না কখনো, আর সেই সুযোগে তিনিও সেগুলো টুকে রাখতে পারবেন। তারপর আমরা টেনিস খেলতে পারব, সাঁতার কাটতে পারব।

—কারো বাড়িতে গিয়ে থাকা আমি বিশেষ পছন্দ করি না। আমি বললাম। বেলা নটায় ঘুম থেকে উঠে যা আমার ভালো লাগে না এমনি প্রাতরাশ খেতে বাধ্য হওয়ার কথাটাও আমি বরদাস্ত করতে পারি না। হেঁটে বেড়ানো আমার ভালো লাগে না। আর অন্যের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোও আমার স্বভাবের বাইরে।

—তিনি বড়ো নিঃসঙ্গ বোধ করেন আজকাল। এতে তাঁর উপর একটু দয়াও দেখানো হবে, তারপর আমার উপর তো বটেই।

আমি একটু ভাবতে লাগলাম।

—তবে শুনুন, আমার কথা বলছি। আমি ব্লেকস্টেবলে যাব, কিন্তু আমি যাব আমার নিজের মতো। 'বিয়ার-এণ্ড কি'তে আমি উঠব, আপনি গেলে পর আমি গিয়ে দেখা করব মিসেস ড্রিফিলডের সঙ্গে। আপনারা ড্রিফিলড সম্বন্ধে যত খুশি এবং যা ইচ্ছে আলোচনা করবেন, কিন্তু যখন আমার ভালো লাগবে না তখন আমার উঠে আসবার স্বাধীনতা থাকবে।

রয় একটু হাসল ভালো মানুষের মতো।

—বেশ, তাই হবে। তারপর আমাদের কাজে লাগে এমন কিছু যা আপনার মনে পরবে তা আপনি লিখে যাবেন তো ?

—চেষ্টা করব।

—কবে যাবেন আপনি ? আমি যাব শুক্রবার দিন।

—আমিও আপনার সঙ্গে যেতে পারি যদি কথা দেন ট্রেনে বসে কোন কথা বলবেন না আমার সঙ্গে।

—বেশ। পাঁচটা দশ মিনিটের গাড়িটাই ভালো ট্রেন। আমি কি এসে আপনাকে তুলে নিয়ে যাব ?

—ভিক্টোরিয়ায় নিজেই আমি যেতে পারব। প্লাটফরমে আপনার সঙ্গে

দেখা হবে।

জানি না আমার মত বদলাবার আশঙ্কা রয় করেছিল কিনা, কিন্তু সে যাবার জন্য তক্ষুনি উঠে পড়ল এবং খুব আন্তরিকতার সঙ্গে আমার করমর্দন করে বেরিয়ে গেল। আমার টেনিস র‍্যাকেট আর স্নানের পোশাকটা যেন কোনো-মতেই ভুলে না যাই, সেটাও সে সানুনয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল।

বারো

রয়কে আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি সেই ভাবনাই আবার আমার মনকে নিয়ে গেল লণ্ডন শহরের সেই কয়টি বৎসরে। তেমন কিছু করবার ছিল না সেদিন বিকেলে, তাই ইচ্ছে হলো হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসি আমার পুরনো বাড়িওয়ালীর সঙ্গে। সেণ্ট লিউক মেডিকেল স্কুলের সেক্রেটারী মারফতই মিসেস হাডসনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল। সেদিন গ্রামের একটি ছেলে প্রথম এসেছিল শহরে। আমি থাকবার জায়গা খুঁজছিলাম। ভিনসেণ্ট স্কোয়ারে মিসেস হাডসনের একখানা বাড়ি ছিল। আমি পাঁচ বছর ছিলাম সেই বাড়িতে একতলায় দুখানা ঘর নিয়ে। আর উপর তলায় ড্রয়িং রুমের দিকটায় থাকতেন ওয়েস্ট মিনিস্টার স্কুলের এক মাস্টার। সপ্তাহে আমি এক পাউণ্ড ঘর ভাড়া দিতাম, এবং ঐ মাস্টার দিতেন পঁচিশ শিলিং। বেশ কর্মঠ এবং হৈ-হুল্লোড়ে মহিলা ছিলেন ঐ মিসেস হাডসন। মুখখানি ছিল বেশ টলটলে, বিরাট বড়ো টিকোল নাক, কালো চোখ দুটি এত উজ্জ্বল যা আমি আগে দেখিনি! মাথা-ভরতি বেশ কালো কালো চুল ছিল মহিলার। প্রতিদিন বিকেলবেলা এবং প্রত্যেক রবিবার চুলগুলি গুটিয়ে এনে কপালের উপর খোপার মতো করে সাজিয়ে রাখতেন, জারসি লিলির ফটোগ্রাফে যেমন দেখতে পাওয়া যায়। মহিলার অন্তঃকরণ ছিল সোনার মতো, (যদিও তখনো আমি কিছু বুঝতাম না, কারণ ছেলেবেলায় কারো দয়া পাওয়া স্বাভাবিক পাওনা বলেই মনে করে থাকে সবাই) তারপর তিনি রাঁধতেন অতি চমৎকার। তাঁর মতো অমলেট কেউ তৈরি করতে পারত কিনা সন্দেহ। রোজ ভোরবেলা ঠিক সময়মতো উঠে বসবার ঘরে আগুণ ধরিয়ে দিতেন। যাতে ব্রেকফাস্ট খেতে বসে ঠাণ্ডায় কেউ কষ্ট না পায়; আপনার স্নানের আওয়াজ শুনতে না পেলে (স্নানের জল আগে থেকেই ঘরের ভেতর এনে উঠিয়ে রাখতেন, ঠাণ্ডা ভাবটা কেটে যাওয়ার জন্য) তিনি চেঁচামেচি শুরু করতেন, "ঐ দেখ, এখনো ওদের উঠবার নামটি নেই, আজকেও আবার ওর লেকচারে যেতে দেরি হবে"। তার পর

টুক টুক করে উপরে উঠে দরজায় টোকা মারতেন, আপনিও তাঁর কর্কশ কণ্ঠ স্পষ্ট শুনতে পেতেন "এখনো যদি তোমার ঘুম না ভাঙে ব্রেকফাস্ট খাবার সময় পাবে না যে। ওঠো শিগ্‌গির, দেখবে চমৎকার খাবার করেছি আজকে।' সারা দিন ভোর তিনি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, কাজের ফাঁকে ফাঁকে কখনো গান গাইতেন। সব সময় প্রফুল্ল এবং হাস্য-মুখরা থাকতেন। তাঁর স্বামী বয়সে তাঁর চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন। ভালো ভালো পরিবারের বাটলারের কাজ করতেন দাড়ি-গোঁফ রাখতেন, নিরঙ্কুশ ভদ্র ব্যবহার জানতেন; পার্শ্ববর্তী কোনো চার্চের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং সবাই বেশ সম্মান করত তাঁকে। খাবার টেবিলে পরিবেশনের কাজ করতেন; জুতো বুরুশ করতেন, ধোয়া-মোছার কাজও তাঁকে দিয়ে বাদ যেত না। মিসেস হাডসনের একমাত্র বিশ্রাম ছিল, যখন ডিনারের পর একবার তিনি উপরে উঠে আসতেন।

আবাসিকদের সঙ্গে বসে কিছু সময় গল্পগুজব করতেন। আজকে ভাবি তাঁর মুখের কথাগুলো টুকে রাখবার শুভবুদ্ধি যদি সেদিন হতো আমার (এমি ডিফিল্ড তাঁর হনাম ধন্য স্বামীর কথাগুলো যেমন টুকে রাখতেন), কারণ মিসেস হাডসন ককনি রসিকতায় একজন সেরা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর অদ্ভুত উপস্থিত বুদ্ধি ছিল যা নাকি কখনও তাঁকে বিফল করত না। কথাবার্তার ভেতর একটা সুন্দর স্টাইল এবং পূর্ণ শব্দ ভাণ্ডারের অধিকারিনী ছিলেন। কোনো সকৌতুক তুলনা অথবা স্পষ্ট অর্থবোধক শব্দ যোজনা কিছুই তাঁকে বিফল করত না। উচিত-অনুচিত বোধের একটা ছাঁচ বলব তাঁকে, তাঁর বাড়িতে কোনো মেয়েছেলেকে কখনো আসতে দিতেন না। কে জানে মনে মনে এদের কী মতলব, সবসময় খালি পুরুষ, পুরুষ আর পুরুষ তাদের নিয়েই বিকেলের চা খাওয়া দরজা খুলে গরম জলের ব্যবস্থা করে দিয়ে যাওয়া এমনি আরো কত কি? তাঁর কথাবার্তায়ও, সেকালে যাকে বলত আয়েসি ভাব তারও কোনো অভাব থাকত না। মেরি লয়েড সম্বন্ধে তিনি যা বলতেন তাঁর বেলাতেও খাটত কথাটা। ওর যেটা আমার খুব বেশী ভালো লাগে সেটা ওর প্রাণ খুলে হাসাবার ক্ষমতা। সীমানার কাছাকাছি গিয়ে হাজির হতো কিন্তু বেড়া ডিঙিয়ে যেত না কভু। মিসেস হাডসন নিজের রসিকতা নিজেই উপভোগ করতেন এবং আমার মনে হয় স্বপ্রনোদিত হয়েই তিনি তাঁর আবাসিকদের সঙ্গে কথা বলতেন। কারণ তাঁর স্বামী ছিলেন বেশি রকম গম্ভীর মানুষ (তা আর নাই বা হবে কেন বল, তিনি বলতেন চার্চের সঙ্গে ওর যোগাযোগ, বিয়েতে থাকতে হয়, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এমনি আরো কী) ঠাট্টা তামাশা ভালো লাগত না। 'হাডসনকে সব সময়

আমি কী বলি জানো, বলি হাসো যতদিন পার, যেদিন মরে মাটির তলায় যাবে সেদিন তো আর হাসতে পারবে না।

মিসেস হাডসনের রসিকতা সব কিছু মিলিয়ে প্রকাশ পেত, মিস বুচার, যিনি ১০নং বাড়িটায় ঘর ভাড়া দিতেন, আর মিসেস হাডসনের ভেতর অবিরত ঝগড়ার কাহিনী একটা কৌতুক কাব্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, দিনের পর দিন বছরের পর বছর।

—বড্ডো বদ মেয়েটা। কিন্তু জান ? আমার ভীষণ কষ্ট হবে যদি ভগবান ওকে ডেকে নিয়ে যান। তবে ওকে নিয়ে যে তাঁর কী কাজে লাগবে তাও আমি বুঝি না। ওর বয়সকালে আমার সঙ্গে কত হাসি তামাসা করত সেকি আর বলব তোমাকে।

মিসেস হাডসনের দাঁত খারাপ ছিল, দাঁতগুলি তুলে ফেলবেন কিনা আর তার বদলে বাঁধানো দাঁত লাগাবেন কিনা এ প্রশ্ন নিয়ে বছরের পর বছর কত রকম উদ্ভট আলোচনা তিনি করতেন।

—কিন্তু, এই তো কাল রাত্রেই যখন আমি হাডসনকে বলছিলাম সে জবাব দিয়েছিল, তুলে ফেলে দাও আপদ চুকে যাক। এর পর কী আর আমি বলব বল।

গত দুই তিন বৎসর যাবত মিসেন হাডসনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ নেই। শেষবার আমি গিয়েছিলাম তাঁর কাছ থেকে একটা চিরকুট পেয়ে, তাঁর বাড়িতে গিয়ে এক পেয়ালা চা খেতে আমন্ত্রণ ছিল ঐ চিরকুটে। তিনি বলেছিলেন, হাডসনের মৃত্যুর তিন মাস পূর্ণ হবে আসছে শনিবার দিন। জানো মৃত্যুর সময় ওর উনাশি বছর পূর্ণ হয়েছিল। জর্জ এবং হেস্টার তাদের শ্রদ্ধা পাঠিয়েছে। হাডসনের সঙ্গে তাঁর বিয়ের সন্তান জর্জ। প্রায় মধ্যবয়সী হয়ে গেছে এতদিনে, উলউইচ আরসেনেলে কাজ করত, কুড়ি বছর ধরে তার মা কেবল বলত একদিন না একদিন ছেলে বউ নিয়ে আসবেই এ বাড়িতে। তাঁর বাড়িতে আমার অবস্থানের শেষ দিকটায় ঐ হেস্টার মেয়েটিকে ঘর সংসারের সবরকম কাজে সাহায্য করবার জন্য তিনি নিযুক্ত করেছিলেন এবং এখনো মিসেস হাডসন হেস্টার-এর নাম উল্লেখ করতে গিয়েই বলেন, আমার ঐ মেয়েটি! মিসেস হাডসনের বয়স হয়তো ত্রিশের উপর ছিল যখন তাঁর বাড়িতে আমি ঘরভাড়া নিয়েছিলাম, আর সেও তো আজ পয়ত্রিশ বছর আগে। তবু গ্রীন পার্ক অওস দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলতে চলতে তিনি জীবিত নাও থাকতে পারেন এ কথাটা আমার মনে আসছিল না। পার্কের সুসজ্জিত জলাশয়ের ধারে পেলিকানগুলির অবস্থিতি যেমন খুবই বাস্তব-সত্যি, আমার জীবনের যৌবন স্মৃতির সঙ্গে তার যোগসূত্রও ঠিক তেমনি সত্যি।

হাঁটতে হাঁটতে দোর-গড়ায় পৌঁছাতেই হেস্টার এসে দরজা খুলে দিল। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কোঠায় গিয়ে পৌঁছেছে। বেশ মোটাসোটা দেখলাম, কিন্তু তার চোখমুখের সেই আগেকার লাজুক-লাজুক হাসি-হাসি ভাবটা কাটেনি। নিচের তলার সামনের ঘরখানার ভেতর যখন আমাকে নিয়ে গেল, গিয়ে দেখলাম মিসেস হাডসন জর্জের এক জোড়া মোজা রিপু করছিলেন, চোখের চশমা খুলে আমাকে দেখবার জন্য তাকালেন।

—আরে মিঃ আসেনডেন না? তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে ভাবতেই পারি নি। এস্টার, জলটা ফুটেছে তো? বেশ ভালো এক পেয়ালা চা হোক, কী বল?

প্রথম পরিচয়ের সময় তাঁকে যেমন দেখেছিলাম, তার চেয়েও কিছুটা মোটা মনে হলো মিসেস হাডসনকে এবং তাঁর চাল চলনও বেশ ভারি ভারি লাগল; কিন্তু মাথায় এক গাছাও সাদা চুল চোখে পড়ল না এবং তাঁর চোখ দুটি, বোতামের মতো কালো চিকচিকে, কৌতুকে জ্বল জ্বল করছিল। মেরুণ রঙের চামড়ায় মোড়া আধা ভাঙা আর্ম চেয়ারে আমি বসলাম।

—আপনি কেমন আছেন, মিসেস হাডসন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—তা, এমন কিছু নালিশ নেই আমার, তবে আগের মতো আর ততটা জোর নেই এই যা দুঃখ। তিনি জবাব দিলেন। তুমি যখন ছিলে তখন যেমন কাজকর্ম করতে পারতাম এখন আর পারি না ততটা। এখন কাউকে ডিনার খেতে দিই না, কেবল ব্রেকফাস্ট।

—আপনার সবগুলো ঘরে ভাড়াটে আছে?

—হ্যাঁ, তা আছে, তোমাদের শুভেচ্ছায়।

জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির জন্য আমাদের সময়কার চেয়েও ঘর ভাড়া কিছুটা বেশী পাচ্ছিলেন এবং আমার মনে হলো তাঁর গরিবানা মতে তিনি ভালোই কাটাচ্ছিলেন। তবে আধুনিককালে মানুষের খাকতি আবার একটু বেশীরকম।

—বললে বিশ্বাস করবে না, প্রথম আমাকে বাথরুম করে দিতে হলো, তারপর বিজলীর ব্যবস্থা করলাম, তবু কারও মন উঠে না। শেষে একটা টেলিফোন নিতে হলো। এরপর যে আবার কি চাইবে কে জানে।

—মিঃ জর্জ বলছেন মিসেস হাডসনের এবার অবসর নেবার সময়। চা দিতে দিতে হেস্টার বলল।

—তোমার নিজের কাজে মন দাও দিকিনি বাছা। একটু রাগতভাবে মিসেস হাডসন বললেন। আমি অবসর নেব একেবারে কবরের তলায় গিয়ে। কেবল জর্জ আর হেস্টারকে নিয়ে একা একা দিন কাটাব, কথা বলবার একটা লোকও থাকবে না, ভাব তো অবস্থাটা একবার।

—মিঃ জর্জ বলেন গ্রামে গিয়ে একখানা বাড়ি নিয়ে এইবার তাঁর বিশ্রাম নেওয়া উচিত। ধমক খেয়ে বিচলিত না হয়ে হেস্টার আবার বলল।

—গ্রামের গল্প আর করো না বাছা আমার কাছে। গত বছর, বুঝলে, গরমের সময় ডাক্তার আমাকে যেতে বলেছিল। আমার কথা বিশ্বাস কর, প্রায় মরেই গিয়েছিলাম আর কি! কি সব হট্টগোল, বা-ব-বা। সব সময় পাখীর কিচির মিচির, মোরগের ডাক আর গোরুর চিৎকার। আমি টিকতে পারলাম না, বুঝলে? আমার মতো এমনি নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিয়ে ঐসব হট্টগোলের ভেতর কি দিন কাটান যায়, তুমি বল?

কয়েকখানা বাড়ির পরই ভকসাল ব্রিজ রোড। রাস্তায় ট্রামের ঘড় ঘড় আর ঘণ্টার ঝনঝন আওয়াজ চলছেই অনবরত। মোটরযানগুলি ছুটছে বাড়ি-ঘর কাঁপিয়ে আর ট্যাক্সির হর্নেরও বিরাম নেই। এগুলো মিসেস হাডসন সহ্য করছেন, কারণ এগুলোর ভেতর লণ্ডনের প্রাণস্পন্দন তিনি অনুভব করতেন। এগুলো তাঁর স্নায়ুকে প্রশান্ত করে, মায়ের হাতের চাপড়ানো যেমন শান্ত করে অস্থির শিশুকে।

যে নোংরা অথচ শান্তিময় পরিবেশ ভরা ছোট্ট পারলার খনিতে মিসেস হাডসন জীবনের এতগুলো দিন কাটিয়ে দিয়েছেন, সেই ঘরখানার চারদিকে আমি চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগলাম। কেবলই আমি ভাবছিলাম, কিছু আমি করতে পারি কিনা তাঁর জন্যে। লক্ষ্য করে দেখলাম একখানা গ্রামোফোনও আছে তাঁর ঘরে। এই জিনিসটা দেওয়ার কথাই শুধু হয়তো আমি ভাবতে পারতাম।

—আপনার কিছু চাই কি, মিসেস হাডসন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

তাঁর গোল গোল চোখ দুটি দিয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

—কী জানি, আজ যখন তুমি জিজ্ঞেস করছ তাহলে বলছি—আমার শরীরটা ভালো থাকুক, আরও অন্তত বছর পাঁচিশ বাঁচতে পারি যেন, এছাড়া আর কী-ই-বা চাইবার আছে বল?

আমার ভেতর কোনো ভাবপ্রবণতা আছে বলে আমি মনে করি না, কিন্তু তাঁর উত্তরটা অপ্রত্যাশিত হলেও প্রাসঙ্গিক, শুনে গলার ভেতর যেন কী একটা আটকে গেল মনে হলো।

যাবার আগে যে ঘরগুলোতে আমি পাঁচ বছর কাটিয়ে গিয়েছিলাম সেগুলো একবার দেখতে চাইলাম।

—হেস্টার, ছুটে একবার যাও তো উপরে, দেখে এসো মিঃ গ্রেহাম আছেন কিনা। না থাকলেও, ঘরগুলো দেখলে তিনি কিছু মনে করবেন না।

হেস্টার ছুটতে ছুটতে উপরে উঠে গেল, একটু পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে নেমে

এসে জানাল মিঃ গ্রেহাম বেরিয়ে গেছেন। মিসেস হাডসন চললেন আমার সঙ্গে। সে সময়কার সরু সরু লোহার খাটিয়াগুলি তখনও আছে দেখলাম যেগুলোতে আমি ঘুমোতাম আর কত স্বপ্ন দেখতাম। সেই ড্রয়ার, সেই ওয়াশিং স্ট্যাণ্ড তখনও আছে। কিন্তু বসবার ঘরটায় একজন খেলোয়াড়ের আন্তরিকতার পরিচয় লক্ষ্য করলাম। দেওয়ালে ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং নৌকা-বাইচ প্রতিযোগীদের ফটো ঝুলান। ঘরের এক কোণে গলফ খেলার স্টিকগুলি দেয়ালে ঠেস দেওয়া আছে। চিমনির কাছে পাইপ এবং তামাক-এর কৌটো চোখে পড়ল। আমাদের সে যুগে 'আর্ট ফর আর্ট সেক' এই নীতিতেই আমরা বিশ্বাস করতাম এবং তারই প্রমাণ স্বরূপ চিমনির কাছটা মুর দেশীয় চিত্র শোভিত রাগ দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখতাম। জানলায় আর্ট-সার্জের সবুজ পর্দা থাকত এবং দেয়ালে পেরুজিনো, ভ্যানডাইক বা হোবেমার আঁকা ছবির প্রতিকৃতি টাঙিয়ে রাখতাম।

—তুমি খুব আর্ট ভালো বাসতে, তাই না? মিসেস হাডসন মন্তব্য করলেন, একটু কটাক্ষ ছিল।

—হ্যাঁ, খুব। বিড় বিড় করে জবাব দিলাম।

ঐ ঘরটিতে যখন থাকতাম তারপর যে বছরগুলো কেটে গেছে এবং এই ক' বছর আমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে সেসব কথা ভাবতে ভাবতে মনের ভেতর কেমন যেন একটা মোচড় দিয়ে গেল। ঐ একই টেবিলে বসে আমিও মন ভরে ব্রেকফাস্ট করতাম, ডিনার খেতাম, ডাক্তারী বই পড়তাম, এবং ঐখানে বসেই আমার প্রথম উপন্যাস লিখেছিলাম। ঐ আর্ম চেয়ারটিতে বসেই প্রথম আমি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং স্টেনচেল, এলিজাবেথ যুগের নাটক আর রুশিয় উপন্যাস, গিবন, বসওয়েল, ভলতেয়ার এবং রুশোর বই পড়েছিলাম। তারপর কে জানে কে এগুলো ব্যবহার করেছে। ডাক্তারী ছাত্র, আর্টিকেল ক্লার্ক, তরুন ছেলেরা যারা প্রথম শহরে এসেছিল ঠাঁই খুঁজতে, উপনিবেশের চাকরি থেকে অবসর প্রাপ্ত কোন বয়স্ক লোক, অথবা যে তার ঘর হারিয়েছে, হয়তো বা এমনি কেউ। ঘরখানা দেখেই মিসেস হাডসনের কথায়, কেমন যেন হয়ে গেলাম। কত আশা, ভবিষ্যতের কত রঙিন, স্বপ্ন, যৌবনের কত দুরন্ত কামনা মনে বাসা বেঁধেছিল এখানে; কত অনুতাপ নৈরাশ্য, ক্লান্তি আর আত্মসমর্পণ; কত মানুষ কত কি অনুভব করেছে, মানব মনের দুর্বার আবেগের কত কি অপ্রতিরোধ্য বন্যা বয়ে গেছে এই ঘরটিতে! কেমন যেন একটা নিজস্ব অদ্ভুত বিভ্রান্তিরকর দুঃসহ-কষ্টকর মূর্তি ধারণ করেছে ঘরখানা। জানিনা কেন হঠাৎ সেই একটি মেয়ের কথা আমার মনে পড়ে গেল, চুপ করবার ইঙ্গিত করে ঠোঁটের উপর

আঙ্গুল রেখে মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়েছিল, পেছন দিকে তাকাতে তাকাতে আর একটি হাতে সে যেন ইশারায় ডাকছিল কাকে। অস্পষ্টভাবে আমি যা অনুভব করেছিলাম মিসেস হাডসনের মনেও যেন তা স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল কারণ তিনি হেসে ফেললেন এবং তাঁর স্বভাবগত ভঙ্গিতে নিজের নাক রগড়াতে লাগলেন।

—সত্যি, মানুষ কী অদ্ভুত মজার! তিনি বললেন—যেসব ভদ্রলোক আমার বাড়িতে ছিলেন তাঁদের কথা যখন আমি ভাবি সত্যি বলব কি, তুমি বিশ্বাস করবে না এদের অনেকের সমন্ধে আমি যে সব কথা জানি সে যদি আমি বলি তোমাকে। অনেক সময় শুয়ে শুয়ে আমি এদের কথা ভাবি আর নিজের মনে হাসি। জানো, এমনি করে মাঝে মাঝে যদি একটু হাসতেও না পার সংসারটা অসহনীয় হয়ে উঠবে তাহলে। কিন্তু হায় ভগবান, আমার দৌড় ঐ পর্যন্তই।

তের

মিসেস হাডসনের বাড়িতে প্রায় দু'বছর কেটে যাবার পর আবার দেখা হলো ড্রিফিলডদের সঙ্গে। তখন বেশ একটা নিয়ম মাফিক আমার দিন কাটছিল। সারাটা দিন হাসপাতালে কাটত। তারপর সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ হেঁটে হেঁটে ভিনসেণ্ট স্কোয়ারে ফিরে আসতাম। লেমবেথ ব্রিজের কাছ থেকে একখানা স্টার কিনে আনতাম। ডিনার খাওয়ার আগে পর্যন্ত বসে বসে কাগজখানা পড়তাম। তারপর দু'একটা ঘণ্টা সিরিয়াস কিছু পড়তাম, নিজের মনের বনিয়াদকে গড়ে তুলবার জন্য। কারণ স্বভাবত আমি বিশেষ উৎসাহী আগ্রহী এবং পরিশ্রমী যুবক ছিলাম। তারপর শুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত উপন্যাস বা নাটক লিখতাম। জানিনা কেন সেদিন, জুন মাসের শেষের দিকে, হাসপাতালে থেকে একটু সকাল সকাল বেরিয়ে ভকসাল ব্রিজ রোড ধরে হেঁটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলাম। ঠাসাঠাসি কোলাহলের জন্য এ রাস্তাটাকে আমার ভালো লাগত। এমন একটা উৎকট উচ্ছলতা ছিল যা নাকি সুখময় উত্তেজনায় মনকে ভরে তুলত। সব সময় মনে হতো বুঝি বা কোনো রকম এডভেঞ্চারের সাক্ষাত মিলতে পারে যে কোন মুহূর্তে। দিবাস্বপ্নের ঘোরে বিভোর হয়ে সেদিন পথ চলছিলাম। হঠাৎ আমার নাম শুনে চমকে উঠলাম। দাঁড়িয়ে পড়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে দেখলাম মিসেস ড্রিফিলড দাঁড়িয়ে আছেন আমার সম্মুখে। তিনি মুচকি মুচকি হাসছিলেন আমার দিকে তাকিয়ে।

—আমায় চিনতে পারছ? তিনি বললেন।

—হ্যাঁ। মিসেস ডিফিলড।

তখন আমার বয়স হলেও আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম ষোল বছর বয়সে যেমন লজ্জায় লাল হয়ে উঠতাম তেমনি ভীষণ লাল হয়ে উঠলাম। কেমন যেন বিব্রত বোধ করছিলাম। দোকানের বাকি পরিশোধ না করে ব্লেকস্টেবল থেকে পালিয়ে আসার জন্য ভিক্টোরিয়া যুগের সততাবোধ পরিপুষ্ট মন নিয়ে সেদিন ডিফিলডদের ব্যবহারে আমি খুবই ব্যথিত হয়েছিলাম। আমার কাছে অত্যন্ত বিশ্রী লেগেছিল। যে লজ্জা তাঁদের পাওয়া উচিত সেই লজ্জা আমি গভীরভাবে অনুভব করেছিলাম এবং দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম যে লোক তাঁদের কীর্তি কাহিনীর সবকিছু জানে তার সঙ্গেই তিনি আবার কথা বলতে পারলেন কেমন করে। আমি আগে থেকে দেখলে হয়তো মুখ ঘুরিয়ে নিতাম, হয়তো ভাবতাম আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার লজ্জা থেকে এড়িয়ে চলতে চাইবেন নিশ্চয়, কিন্তু তিনি তাঁর হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে এবং খুবই আনন্দের সঙ্গে চাপ দিলেন আমার হাতে।

—ব্লেকস্টেবলের একটি পরিচিত মুখ আবার দেখতে পেয়ে ভারি খুশী হলাম। তিনি বললেন—তুমি জানো বোধহয়, ভীষণ তাড়াহুড়োর ভেতর আমরা চলে এসেছিলাম।

তিনি হাসলেন, আমিও হাসলাম। কিন্তু তাঁর হাসিতে খুশীর ভাব ছিল শিশুর সরলতা ছিল। কিন্তু আমারটা ছিল, আমি বেশ অনুভব করলাম, যেন কষ্টপ্রসূত

—শুনেছি আমাদের চলে আসবার কথা যখন প্রকাশ হয়েছিল তখন নাকি খুব হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল এ খবর টেডের কানে গেলে সে তার হাসি চাপতে পারবে না। তোমার কাকা কী বলেছিলেন?

আমি তাঁর কথার আসল সুর ধরতে পারলাম।' তাঁর রহস্য বুঝতে পারিনি এ আমি তাঁকে কিছুতেই বুঝতে দিলাম না।

—সে আর কী, তাঁকে তো আপনি চেনেন। তিনি অত্যন্ত সেকেলে।

—হ্যাঁ, ঐটাই ব্লেকস্টেবলের দোষ। তাঁদের ঘুম ভাঙিয়ে দিতে হয়। তিনি একটুখানি প্রীতিভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন—তোমাকে যখ দেখেছিলাম তার চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেছ তুমি। তাই তো, তোমার দাড়ি-গোঁফও গজিয়েছে দেখছি।

—তা বটে। আমি বললাম, জিবটাকে যতদূর সম্ভব একটা মোচড় দিয়ে সে আজ এক যুগ হবে।

—সময় কেমন বয়ে যায়, তাই না? বছর চারেক আগে তোমাকে ছোটো ছেলেটি দেখেছিলাম, আর আজকে একজন পুরোদস্তুর জোয়ান পুরুষ।

—তাই তো হবে। বেশ একটু উত্তপ্ত হয়ে আমি জবাব দিলম—প্রায় একুশ বছর বয়স হতে চলেছে আমার!

আমি মিসেস ড্রিফিলডের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। পাখির পালক দেওয়া ছোটো একটা টুপি ছিল তাঁর মাথায়, এবং ফিকে বাদামী রঙের জামা গায়ে, পুরো হাতা, জামার ঝুল বেশ লম্বা। বেশ স্মার্ট লাগল তাঁকে। তাঁর মুখখানা সুন্দর বলেই আমার সব সময় ধারণা ছিল, কিন্তু আজকেই আমি লক্ষ্য করলাম তিনি প্রকৃত সুন্দরী। আমার যা মনে আছে তার চেয়েও যেন নীল তাঁর চোখ দুটি, আর তাঁর গায়ের চামড়া আইভরির মতো সাদা মসৃণ।

—জানো, আমরা খুব কাছেই থাকি। তিনি বললেন।

—আমিও।

—আমরা লিম্পাস রোডে আছি, প্রায় ব্লেকস্টেবল ছেড়ে আসবার পর থেকেই।

—আমি ভিনসেন্ট স্কোয়ারে, প্রায় দুবছর হলো।

—আমি জানতাম তুমি লণ্ডনে আছ। জর্জ কেম্প আমাকে বলেছিল। প্রায়ই ভাবতাম তুমি কোথায় আছ। এসো না আমার সঙ্গে? টেড খুব খুশী হবে তোমাকে দেখলে।

—আপত্তি নেই। আমি বললাম।

চলতে চলতে তিনি বললেন, ড্রিফিলড এখন একটা সাপ্তাহিক পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক। তাঁর শেষ বইখানা আগেরগুলোর চেয়েও নাকি ভালো হয়েছে এবং পরবর্তী বইয়ের জন্য বেশ মোটা রকম রয়েলটি আগাম পাওয়ার আশা করছেন। ব্লেকস্টেবলের অনেক খবর তিনি জানেন দেখলাম। আবার মনে পড়ল, তাঁদের পলায়নে লর্ড জর্জের হাত ছিল এ সন্দেহ সবাই করেছিল। সে বোধহয় মাঝে মাঝে তাঁদের চিঠি লিখত। চলতে চলতে আমি লক্ষ্য করছিলাম, অনেকেই ফিরে ফিরে দেখছিল মিসেস ড্রিফিলডকে! আমার সে সময় মনে হয়েছিল হয়তো এরাও তাঁকে নিশ্চয় সুন্দরী বলে মনে করছে। বেশ একটা গর্বিতভাব নিয়ে আমি পথ চলতে লাগলাম।

লিমপাস রোড বেশ সুদীর্ঘ প্রশস্ত এবং সোজা একটা রাস্তা। ভকসাল ব্রিজ রোডের ঠিক পাশাপাশি সমান্তরাল চলে গেছে। রাস্তার ধারে সবগুলি বাড়ি ঠিক একই রকমের, চুন-বালির আস্তর, কেমন ঘিঞ্জি মতন রঙ করা, বড়ো বড়ো পোর্‌টিকো আছে সবগুলো বাড়িতেই। লণ্ডন শহরের বিশিষ্ট লোকদের বাস করবার জন্যই বুঝি এই বাড়িগুলি তৈরি হয়েছিল, কিন্তু রাস্তাটা বুঝি ধরণীর ধূলিতে পথ হারিয়ে ফেলেছিল এবং যাদের আশায় ছিল তারাও বুঝি আর আসেনি কোনোদিন। এর ক্ষয়প্রাপ্ত আভিজাত্যের এমন একটা রঙ ছিল, যেমনি গোপন তেমনি হেলায় অবলুপ্ত, যা তাদের কথাই মনে

করিয়ে দিত যাদের সুদিন ছিল, কিন্তু আজ তারাই শুধু স্মরণ করে যৌবনের সামাজিক হৃত গৌরবের কথা। ফ্যাকাশে লাল রঙে রঙ করা একটা বাড়িতে ড্রিফিলডরা থাকতেন এবং মিসেস ড্রিফিলড একটা সঙ্কীর্ণ অন্ধকারে হলঘরে আমাকে ঢুকিয়ে দিয়ে একটা দরজা খুললেন আমাকে বললেন —ভেতরে যাও। আমি টেডকে খবর দিচ্ছি তুমি এসেছ।

তিনি হলঘরের ভেতর দিয়ে চলে গেলেন, আমি বসবার ঘরে প্রবেশ করলাম। ড্রিফিলডরা একতলাটা ভাড়া নিয়েছিলেন, বাড়িওয়ালী দোতলায় থাকতেন। যে ঘরটায় আমি ঢুকলাম সে ঘরটা দেখে মনে হলো যেন নিলেম বাজারের মালপত্র ঝেঁটিয়ে এনে জড় করা হয়েছে। ভারি ভারি ভেলভেটের পর্দা দেখলাম, হলদে রঙের ডেমাস্ক দিয়ে মোড়া একটা সোফা সুইটও ছিল ; ঘরের মাঝখানে একটা বিরাট টেবিল। সোনালী কেবিনেটগুলি প্রচুর জিনিষপত্র দিয়ে বোঝাই, চিনামাটির বাসন, আইভরির মূর্তি, কাঠ খোদাই আর ভারতীয় কাঁসার জিনিষ। দেয়ালের গায় ঝুলছে পাহাড়ী হরিণ আর এমনি সব কিছুর গোটা কয়েক তেল রঙা ছবি। একটু পরেই মিসেস ড্রিফিলড তাঁর স্বামীকে নিয়ে এলেন. তিনি আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন আমাকে। তিনি আলপাকা কোট এবং ট্রাউজার পরেছিলেন। দাড়ি কামিয়ে ফেলেছিলেন দেখলাম. কিন্তু গোঁফ আর ছোটো এক গোছা দাড়ি ছিল থুতনিতে। তিনি যে কত বেঁটে সেইদিনই আমি লক্ষ্য করলাম। কিন্তু আগের চেয়েও বেশ একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম তাঁর ভেতর। চেহারার কী একটা বিজাতীয় কিছু ফুটে উঠেছিল এবং আমি ভাবলাম বিশিষ্ট লেখকদের চেহারায় এমনি একটা কিছু থাকে বুঝি।

—তারপর আমাদের এই নতুন ডেরাটা কেমন লাগছে তোমার ? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। বেশ একটু বড়োলো কী ভাব আছে, কী বল ? আমার মনে হয় লোকের মনে আস্থা আসে এ থেকে।

বেশ একটু তৃপ্তির ভাব নিয়ে একটিবার চোখ বুলিয়ে নিলেন চারদিকে।

—টেডের আড্ডা ঐ পেছন দিকটায়, যেখানে বসে ও লিখতে পারে। তারপর আমাদের একটা ডাইনিং রুমও আছে এই বাড়িতে। মিসেস ড্রিফিলড বললেন—আমাদের এই মিস কাউলি অনেকদিন এক সম্ভ্রান্ত মহিলার সহকারিণী ছিলেন, মৃত্যুর সময় ঐ মহিলা তাঁর সব ফার্নিচার ইত্যাদি মিস কাউলিকে দিয়ে গিয়েছিলেন। তুমি দেখতে পারছ বোধহয়, সবগুলো বেশ ভালো ভালো জিনিস, কেমন না ? বিশিষ্ট লোকের জিনিস সন্দেহ নেই, তাও বুঝতে পারছ…বোধহয় ?

—বাড়িটা দেখা মাত্রই রোজি এর প্রেমে পড়ে গিয়েছিল !

—তুমিও তো টেড।

—এতকাল বিশ্রী অবস্থার ভেতর আমরা দিন কাটিয়েছি কাজেই বিলাসিতার ভেতর এসে একটু বদল হয়েছে। মাদাম দ্য পাম্পাদোর, এমনি সব কিছু। যখন চলে এলাম, আবার আসবার জন্য সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। প্রতি শনিবার তাঁরা বাড়ি থাকেন বোঝা গেল এবং এও আমি বুঝলাম যেসব লোকের সান্নিধ্য পেলে আমি খুব খুশী হব এমনি সব লোকেরও আনাগোনা হয়ে থাকে এ বাড়িতে।

চোদ্দ

আমি গিয়েছিলাম। আনন্দ পেয়েছিলাম। আবার গিয়েছিলাম। যখন হেমন্ত এলো এবং আমি সেণ্ট লিউক হাসপাতালে শীতকালীন সেসনে যোগ দেবার জন্য লণ্ডনে ফিরে এলাম, তখন প্রতি শনিবার তাঁদের বাড়িতে যাওয়া আসার একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেল। শিল্প এবং সাহিত্যের দুনিয়ার সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয় হলো। আমার আবাস গৃহের নিভৃতে আমি লেখা নিয়ে মত্ত ছিলাম এ আমি গোপন রাখলাম: আমার মতো আরো যাঁরা লিখছেন তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমার মন উত্তেজনায় ভরে উঠল এবং মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি তাঁদের কথাবার্তা শুনে যেতে লাগলাম। ঐসব পার্টিতে নানা রকমের লোক আসত। সে সময় উইক-এণ্ড যাওয়ার রেওয়াজ প্রায় দূর হয়ে গিয়েছিল। গলফ খেলা একরকম বিদ্রুপের বিষয় হয়ে উঠেছিল এবং অনেক লোকেরই শনিবার সন্ধ্যায় কিছু করবার থাকত না। আমার মনে পড়ে না কোনোরকম বিশিষ্ট লোক সেখানে আসত কিনা; তবু ড্রিফিলডদের বাড়িতে যেসব চিত্রকর লেখক এবং সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল তাদের ভেতর এমন একটি লোকের কথাও আমার স্মৃতিতে আসে না—যার সুনাম প্রতিপত্তি স্থায়ী হয়েছিল। তা সত্বেও প্রভাব পরিবেশ, এবং কৃষ্টি ও মনীষার ছোঁয়াচ ছিল এ আমি স্বীকার করব। কত লোকের সঙ্গেই তো পরিচয় হয়েছিল, তরুণ অভিনেতা যারা অভিনয়ে অংশ পাবার জন্য খুঁজে মরছিল, মধ্যবয়সী কত গায়ক যারা ইংরেজ জাতটা সঙ্গীতের সমজদার নয় বলে দুঃখ করত, কত সুরকার যাদের প্রতিভা ড্রিফিলড বাড়িতে পিয়ানোর রিডে প্রকাশ পেয়েই মিলিয়ে যেত. আর তারা চুপি চুপি নালিশ করত গ্রাণ্ড কনসার্ট ছাড়া আর কোথায় বা তারা এ প্রতিভার পরিচয় দিত! কত কবি যারা শত অনুরোধের পর তাদের সদ্য লেখা কবিতা পড়ে শুনাত. আবার কত চিত্রকর ডাকের আশায় যারা দিন গুনত কখনও সখনও দুটি একটি বিশেষ লোক এসে জৌলুস বাড়াত; খুবই কদাচিত, কারণ সে যুগে তখনও অভিজাত সম্প্রদায় ততটা বোহেমিয়ান হয়ে উঠেনি।

এবং কখনও যদি গুণ-সম্পন্ন কোনো ব্যক্তিবিশেষ শিল্পী সহবাসে আসত সেও শুধু হয়তো কোনো বিবাহ বিচ্ছেদ অথবা তাসের আড্ডায় গোলযোগ হেতু স্বীয় সমাজে মনান্তরের জন্যই।

সেদিন বদলে গেছে। বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের সবচেয়ে বড়ো অবদান হিসেবে আমরা পেয়েছি সমাজের সর্বস্তরে, বিশেষ করে অভিজাত এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভেতর, লেখার অভ্যাসের সম্প্রসারণ। হোরেস ওয়াল-পোল এক সময় Catalogue of the Royal and Noble Authors, লিখেছিলেন ; এ ধরণের রচনা আজকাল বিশ্বকোষের রূপ নিত। যে কোনো রকমের উপাধি, অতি সাধারণ সৌজন্যসূচক হলেও, অতি সাধারণ -কেও সাহিত্যিক বলে প্রসিদ্ধি দিতে পারে এবং নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে সাহিত্য জগতের সবচেয়ে সেরা পাসপোর্ট সামাজিক পদমর্যাদার।

বাস্তবিক আমি অনেক সময় চিন্তা করেছি যে হাউস-অব-লর্ডসকে খুব শীঘ্র উঠিয়ে দেবার প্রস্তাব যখন একদিন উঠবেই, তখন সাহিত্য সেবার ব্যবসাটা আইন করে লর্ডস-এর সভ্যদের অথবা তাদের পুত্র পরিজনদের ভেতর সীমাবদ্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারলে বোধহয় মন্দ হবে না। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার বিনিময়ে এমনি ভাবেই হয়তো ইংরেজ জাতি তাদের পিয়ারদের শোভন ক্ষতিপূরণ দিতে পারবে। জনস্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষার্থে কোরাস গার্ল, রেসের ঘোড়ার পেছনে যারা সর্বস্বান্ত হয়েছে তাদের ভরণ পোষণেরও একটা সুব্যবস্থা হবে এতে, এবং বাকি যারা প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শাসন ছাড়া অন্য কাজে অকেজো হয়ে পড়েছে তাদেরও একটা স্পেশিয়েলাইজেশনের যুগ এবং আমার এই পরিকল্পনা যদি কার্যকরী-করা হয় তবে এটা স্পষ্ট যে ইংরেজী সাহিত্যের স্বার্থ এবং গৌরব রক্ষা করতে হলে এর বিভিন্ন বিভাগকে অভিজাত সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তরের ভেতর বাঁটোয়ারা করে না দিয়ে উপায় নেই। কাজেই আমি প্রস্তাব করব সাহিত্যের মামুলী শাখাগুলি পিয়ারেজের নিম্নস্তরে সীমাবদ্ধ থাকলেই চলবে এবং বেরণ ও ভাইকাউন্টরা নাটক এবং জার্নালিজম নিয়ে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের ব্যাপৃত রাখতে পারেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রে থাকবে আর্লদের একচ্ছত্র অধিকার। এই কঠিন কলা-চর্চার ক্ষেত্রে এর মধ্যেই তাঁরা পারদর্শিতা দেখাতে শুরু করেছেন এবং তাঁদের সংখ্যাও এত বেশি যে চাহিদার সঙ্গে পূর্ণ সমতা তাঁরা রাখতে পারবেন। মারকুইসদের হাতে সাহিত্যের ঐ বিশিষ্ট শাখাটিকে নিরাপদে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে যেটাকে বলা হয়, আমি অবশ্য এখনও বুঝতে পারি না কেন বলা হয়, belles lettres অর্থাৎ রম্য রচনা। অর্থকরী হিসেবে এটা অবশ্য বিশেষ লাভজনক নয়, তবে এর একটা বিশেষ

মর্যাদা আছে যার এই রোমাণ্টিক নামটা গ্রহীতার পক্ষে উপযুক্ত বটে। কাব্য সাহিত্যের মুকুটমণি। কাব্য নিজেই তার উদ্দেশ্য, নিজেই তার লক্ষ্য। মানব মনের অতীন্দ্রিয় কর্ম। রূপের অভিব্যক্তি। গদ্যের রচয়িতার পথ ছেড়ে পাশ কেটে দাঁড়াবে কবির কাছে, কাজেই কাব্য রচনার ক্ষেত্র ছেড়ে দিতে হবে ডিউকদের জন্য, এবং আমার মতে যত রকম কঠোরতা সম্ভব সবকিছু দিয়ে রক্ষা করতে হবে তাঁদের স্বার্থকে, কারণ সেরা চারু শিল্প সেরা মানুষ ছাড়া অন্য কারো এক্তিয়ারে যাবে এ অসহ্য। এবং যেহেতু এক্ষেত্রেও স্পেশিয়েলাইজেশান অবশ্য গ্রাহ্য বস্তু, আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি কাব্যের রাজত্বকেও ডিউকরা ভাগাভাগি করে নেবেন নিজেদের মধ্যে, আলেকজাণ্ডারের উত্তরাধিকারীদের মতো, যেটা যার উত্তরাধিকার এবং পুরুষানুক্রমিক প্রভাব প্রভাবান্বিত করবে যাকে, তাই আমি দেখছি ম্যানচেস্টারের ডিউকরা লিখছেন নীতিশিক্ষা আর নৈতিক চরিত্র নিয়ে, ওয়েস্টমিনিস্টারের ডিউকরা উত্তেজকধর্মী কাব্য-গাথা লিখছেন কর্তব্য আর সাম্রাজ্যের দায়ীত্ব সম্বন্ধে। তারপর আমি কল্পনা করছি প্রোপারসিয়ানের ধরণে প্রেমের কবিতা আর এলেজি হয়তো লিখতে চাইবেন ডিভনসায়ারের ডিউকরা, আর মার্লবারোর ডিউক হয়তো নিশ্চয় সন্তুষ্ট থাকবেন পারিবারিক শান্তি, যুদ্ধের সৈন্য সংগ্রহ বা এমনি কিছু বিষয় নিয়ে।

কিন্তু যদি বলেন এতো কঠিন কাজ এবং মনে করিয়ে দেন যে শুধু দৃপ্তই তো নয় কাব্যলক্ষ্মীর পছন্দ, কখনও তো আসে তারই পদক্ষেপে ক্ষিপ্রচঞ্চলতা; যে জ্ঞানী পুরুষ বলেছিলেন যে, সঙ্গীত রচনায় যখন সুযোগ আসে তখন তিনি নাই-বা জানতেন কে করল দেশের আইন রচনা, তাঁরই কথা স্মরণ করে যদি জিজ্ঞাসা করেন আমাকে, ডিউকদের দিয়ে অবশ্যি হবে না ভেবে, কে তুলবে তারযন্ত্রে সংগীতের এই মূর্চ্ছনা, যার জন্য সদা কাঁদে পুরুষের চঞ্চল অন্তর —আমি বলব (আমি হয়তো ভাবতাম কীই-বা হবে এ ছাড়া) আর কেউ নয় ডাচেসরা। আমি বুঝতে পারি সে যুগ হয়েছে বাসি, যখন রোমনগর কামাতুর কৃষক টোরকোয়াতে তোমের পদাবলী শুনাত তার প্রিয়াকে আর মিসেস হামফ্রি ওয়ার্ড শিশু আরনলডকে ঘুম পাড়াতেন ইউপাসের গান গেয়ে। কিন্তু এ যুগ চায় আরও কিছু নতুন আরও কিছু বৈচিত্র্য। কাজেই আমি বলব গৃহস্থালী নিপুণা ডাচেসরা শুধু লিখবেন প্রার্থনা সঙ্গীত আর ঘুম পাড়ানির গান। আর যারা একটু বাহির মুখো, তাঁরাই রচনা করবেন গীতি-নাট্যের সঙ্গীত, হাস্যকৌতুক পত্রিকার রসাত্মক কাব্য আর খৃষ্টমাস কার্ডের উপদেশাবলী। এমনি করেই তাঁরা তাঁদের ঠাঁই কায়েম করে রাখবেন ব্রিটিশ জাতির অন্তরে। যে ঠাঁইটুকু এতকাল তাঁরা পেয়ে এসেছেন জন্মগত

উত্তরাধিকারের সগৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য।

শনিবারের এমনি সব আসরে এসে অবাক হয়ে আবিষ্কার করলাম যে এডওয়ার্ড ড্রিফিলড একজন বিশিষ্ট লোক। এতদিনে প্রায় কুড়িখানা বই তিনি লিখে ফেলেছিলেন এবং যদিও এ থেকে তিনি খুব বেশী কিছু উপার্জন করতে পারেন নি তবু তিনি প্রচুর প্রতিপত্তি এবং সুনাম অর্জন করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ সমালোচকরা প্রশংসা বর্ষণ করেছিলেন। এবং বন্ধু-বান্ধব যাঁরা তাঁর বাড়িতে আসতেন তাঁরাও একবাক্যে বিশ্বাস করতেন যে একদিন তিনি সবার স্বীকৃতি পাবেন। তাঁরা সে অঞ্চলের জনসাধারণকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন কারণ তাদের ভেতরকার ঐ এক বিখ্যাত লেখকের পরিচয় তারা জানত না। এবং যেহেতু একজনকে উঁচুতে তুলবার সহজ পথ অপরকে ঠেলে ফেলে দেওয়া, সেই জন্য সমসাময়িক যে সমস্ত ঔপন্যাসিকরা তাঁর রচনাকে ম্লান করে দিয়েছিলেন তাঁদেরও তাঁরা বিদ্রূপ করতেন, অবহেলা দেখাতেন। পরে যতটুকু পেয়েছিলাম বাস্তবিক ততটুকু পরিচয় যদি সে সময় তদানিন্তন সাহিত্যিক মহলের সঙ্গে আমার থাকত, তাহলে মিসেস বারটন ট্রেফোর্ডের ঘন ঘন যাতায়াত থেকে নিশ্চয় আমি বুঝতে পারতাম যে, সময় অতি দূরে নয় যখন লম্বা দৌড়ের প্রতিযোগীর মতো হঠাৎ সব বাধাকে পেছনে ফেলে এডওয়ার্ড ড্রিফিলড নিশ্চিত সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবেন। আমি স্বীকার করি যখন প্রথম পরিচয় হয়েছিল তখন এই মহিলাকে আমি কোনো মূল্য দেই নি। তাঁর গ্রামের একজন প্রতিবেশী যুবক বলে ড্রিফিলড আমার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং আমি ডাক্তারী পড়ছি এও বলেছিলেন। মহিলা প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর একটুখানি হাসি হেসেছিলেন। বিড় বিড় করে টম সয়ার সম্বন্ধে অতি মিহি সুরে কি যেন বলেছিলেন এবং আমার দেওয়া রুটি আর মাখন গ্রহণ করে গৃহকর্তাকে নিয়ে আবার মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছিলাম তাঁর আবির্ভাবে বেশ একটা প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সবার ভেতর এবং আলোচনার উত্তেজনা আর উচ্ছ্বাসও যেন হঠাৎ থেমে গিয়েছিল। যখন খুব উঁচু গলায় আমি মহিলার পরিচয় জানতে চাইলাম, আমার এমনি অজ্ঞতায় সবাই কেমন অবাক হলো; ইনি নাকি তৈরী করেছেন অমুক আর অমুককে। প্রায় আধ ঘণ্টা পর তিনি উঠলেন যাদের যাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হলো সবার সঙ্গেই করমর্দন করলেন এবং বেশ একটা মিষ্টি রেশ পেছনে রেখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ড্রিফিলড দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে তাঁকে হ্যানসমে উঠিয়ে দিলেন।

মিসেস বারটন ট্রেফোর্ড তখন প্রায় পঞ্চাশ বছরের মহিলা। বেশ ছোটো খাটো দেখতে, কিন্তু গড়নটা ছিল কেমন একটু ভারি ভারি। সেজন্য শরীরের

অনুপাতে তাঁর মাথাটা বেশ বড়ো লাগত; মাথায় বেশ ধবধবে সাদা চুল, মিলোর ভেনাসের মতো করে সেগুলো বাঁধা এবং সবাই বিশ্বাস করত যৌবনে তিনি সুন্দরী বলে খুব খ্যাতি ছিল। বেশ রুচিসম্মত কালো রঙের সিল্কের জামা তিনি পরে এসেছিলেন, গলায় পুঁতি আর শঙ্খের মালা ঝুন ঝুন করছিল। শোনা যায় খুব অল্প বয়সে নাকি তাঁর বিয়ে হয়েছিল। তিনি সেই বিয়েতে নাকি সুখী হননি। কিন্তু ইদানিং বারটন টেলফর্ডের সঙ্গে আবার সম্প্রীতি ফিরে এসেছিল। ভদ্রলোক স্বরাষ্ট্র বিভাগের কর্মচারী, প্রাগৈতিহাসিক মানুষ সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। মিসেস টেলফর্ডকে দেখলে একটা অদ্ভুত ধারণা হবে যে তাঁর শরীরে বুঝি একটিও হাড় নেই এবং তাঁর কাঁধে চিমটি কাটলেও বুঝি দুই আঙুল মিলে যাবে। (তাঁর নারীত্বের প্রতি সম্মান এবং চেহারায় একটা প্রশান্ত মর্যাদার জন্য অবশ্য এ কাজ আমাকে দিয়ে কখনো সম্ভব হতো না) তাঁর হাত হাতে নিলে মনে হবে একটা অদ্ভুত নরম কিছু তুলে নিয়েছেন। তাঁর মুখের, গড়নটা বড়ো হলেও, কেমন একটা সরলতা যেন ফুটে থাকত সবসময়। যখন তিনি বসতেন মনে হতো যেন তাঁর মেরুদণ্ড নেই এবং দামী কুশনের মতোই বুঝি তুলতুলে শরীরটা।

তাঁর সব কিছু ছিল কেমন নরম তুলতুলে। তাঁর গলা, তাঁর মুচকি হাসি, খোলা হাসি, ছোট্ট ফ্যাকাসে চোখ দুটি—সবই বুঝি ফুলের মতো নরম। তাঁর ব্যবহারও যেন গ্রীষ্মের বৃষ্টির মতো কোমল। স্বভাবের এই অপূর্ব মনভুলানো বৈশিষ্ট্যের জন্যই এমনি অদ্ভুত বন্ধুত্ব সম্ভব হতো তাঁর সঙ্গে। যেটুকু খ্যাতি তিনি অর্জন করেছিলেন তাও এর জন্যই। বছর দুই আগে যাঁর মৃত্যুতে সারা ইংরেজ ভাষাভাষী অঞ্চল শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। সেই খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা সারা দুনিয়া জানত। তাঁকে লেখা অগুন্তি চিঠিগুলিও সবাই পড়েছে। মৃত্যুর কিছুকাল পরই এগুলো ছাপাবার জন্য অনেকেই তাঁকে অনুরোধ করেছিল। চিঠির প্রতি ছত্রে ছত্রে তাঁর অনিন্দ্য-রূপের প্রশংসা এবং তাঁর বিচার শক্তির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ পেত; তাঁর কাছে পাওয়া উৎসাহ, বেদনা, বিচক্ষণতা এবং তাঁর রুচির কাছে ঐ ঔপন্যাসিক কতটুকু ঋণী ছিলেন তিনি প্রায়ই তা প্রকাশ করতে পারতেন না। যদি তাঁর রচনায় আবেগ বিক্ষুব্ধ মনের কোনো কোনো প্রকাশকে বারটন টেলফর্ড অবিমিশ্র মন নিয়ে পড়তেন না বলে কেউ কেউ মনে করত তাতে তাঁর রচনার মানবিক আবেদন প্রমাণ হতো। কিন্তু মিঃ বারটন টেলফর্ড মানুষের এইসব রুচিহীন সংস্কারের ঊর্দ্ধে ছিলেন (তাঁর দুর্ভাগ্য, যদি একে তাই বলি, এটাই যে মানব

ইতিহাসের সেরা ব্যক্তিরা দার্শনিক মনোবৃত্তি নিয়েই জীবনকে সহ্য করে নিয়েছেন) এবং তাঁর প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান আর নিওলেথিক এক্স সম্বন্ধে গবেষণা পরিত্যাগ করে নিজেই মৃত ঔপন্যাসিকের একটা জীবনী রচনা করতে স্বীকার করেছিলেন, প্রমাণ করবার জন্য যে ঐ ঔপন্যাসিকের প্রতিভা বিকাশে তাঁর স্ত্রীর প্রভাব কত গভীরভাবে পড়েছিল।

কিন্তু যে বন্ধুর জন্য জীবনভোর তিনি এত করেছিলেন তাঁর অস্তিত্ব ভাবীকালের সম্পদে পর্যবসিত হয়ে গেলেও মিসেস বারটন ট্রেফর্ডের সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ আর শিল্পের প্রতি তীব্র অনুরাগ নিঃশেষ হয়ে গেল না। একজন বড়ো পাঠক বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। ক্ষুদ্রতম কিছুও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারত না, এবং যে কোনো নবীন লেখকের কিঞ্চিততম শক্তির পরিচয় পেলেই ব্যক্তিগত পরিচয়ের গণ্ডির ভেতর তাকে টেনে নিতেন। তাঁর খ্যাতি, বিশেষ করে 'জীবনী' প্রকাশিত হবার পর, এতটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তিনি নিশ্চিত জানতেন তাঁর দেওয়া করুণাকে কেউ উপেক্ষা করতে পারবে না। এটা অবিসংবাদিত যে তাঁর বন্ধুত্ব স্থাপন করবার প্রতিভা আপন পথ খুঁজে নিত। যখনই কোনো লেখা পড়তে পড়তে তাঁর ভালো লাগত, মিঃ বারটন ট্রেফর্ড (নিজেও অবশ্যি কম সমঝদার ছিলেন না) তখনই সেই লেখককে আন্তরিকতা জানিয়ে চিঠি লিখতেন এবং লাঞ্চ খেতে আমন্ত্রণ করতেন। লাঞ্চ খাওয়ার পর তাঁকে আবার স্বরাষ্ট্র দপ্তরে ফিরে যেতে হতো, মিসেস ট্রেফর্ড-এর সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ করে দিয়ে মিঃ ট্রেফর্ড নিজে সরে পড়তেন। অনেকেই আসত এমনি। সবাই কিছু না কিছু পেত কিন্তু ঐটুকুই যথেষ্ট ছিল না, মিসেস বারটন ট্রেফর্ডের একটা প্রবণতা ছিল, এবং এই প্রবণতার উপর তাঁর আস্থা ছিল, এই প্রবণতাই তাঁকে ধৈর্যশীলা করত।

তাঁর এত বেশী সতর্কতাবোধ ছিল যে, জেসপার গিবনের কাছে প্রায় তাঁকে হার মানতে হয়েছিল। অতীত ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখকদের রাতারাতি বড়ো হবার অনেক স্বাক্ষরই চোখে পড়ে, কিন্তু আমাদের এই অতি সতর্কতার যুগে সে উদাহরণ অতি বিরল। সমালোচকেরা আগে দেখতে চায় বিড়াল লাফাবে কোন দিকে, এবং বিড়াল ছানা কিনে অনাবশ্যক অনিশ্চয়তার পরীক্ষা দিতে হয়েছে জনসাধারণকে। কিন্তু জেসপার গিবনের বেলায় ওটা প্রায় একেবারে নির্ভেজাল সত্য যে, এক লাফে তিনি খ্যাতির উঁচু ডালে উঠে বসেছিলেন। আজ সবাই তাঁকে ভুলে গেলেও, যেসব সমালোচকেরা তাঁরই প্রশংসায় মুখর হতো, সংবাদপত্র দপ্তরের মোহাফেজখানায় তারই স্বাক্ষরের প্রহরা সত্ত্বেও নিজের কথা হজম করে ফেলবার চেষ্টা করলেও

তাঁর প্রথম কবিতার বই যে আলোড়ন এনেছিল সত্যি তা আজও অবিশ্বাস্য অচিন্তনীয়। দেশের সেরা সেরা সংবাদপত্রগুলি যে কোনো প্রাইজ ফাইটের রিপোর্ট ছাপতে যতটুকু স্থান দিত তার চেয়েও বেশী জায়গা দিয়েছিল তাঁর রচনার রিভিউ প্রকাশ করবার জন্য। অতি প্রভাবশালী সমালোচকদের ভেতর তাঁকে অভিনন্দন জানাবার ব্যাপার নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। তাঁকে তুলনা করেছিল মিলটনের সঙ্গে, তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দের সঙ্গীত মাধুর্যের জন্য। সাহিত্যের ইন্দ্রাসনে আসীন যারা, তাদের কাছে অসহনীয়হয়ে উঠেছিল, তাদেরই মস্তকে ভাঙবার লগুড় হিসাবে তাঁকে ব্যবহার করে তাঁরি নাম করে কতবারদমাদম প্রহার চালিয়েছিল লর্ড টেনিসনের শুষ্ক নিতম্বে, আর চটাপট চাটি লাগিয়েছিল রবার্ট ব্রাউনিং-এর টাক মাথায়। জেরিকোর প্রাচীরের মতো হুড়মুড় করে জনসাধারণ ভেঙে পড়েছিল। সংস্করণের পর সংস্করণ কাটতে লাগল এবং জেসপার গিবনের সুদৃশ্য বইগুলি শোভা পেতে লাগল মে-ফেয়ারের কাউন-টেসদের বিশ্রাম কক্ষে, ল্যাণ্ডস এণ্ড থেকে শুরু করে জন অব গ্রোটস-এর প্রতিটি ভিকারেজের ড্রয়িংরুমে, আর গ্লাসগো, এবারডিন আর বেলফাস্টের সওদাগরদের বাড়ির সুদৃশ্য পারলারে। যখন কথাটা ছড়িয়ে পড়ল যে মহারাণী ভিক্টোরিয়া একখানা বিশেষ করে বাঁধানো বই প্রকাশকদের হাত দিয়ে গ্রহণ করে তার পরিবর্তে একখানা Leaves from a journal in the Highland উপহার দিয়েছিলেন লেখককে নয় প্রকাশককে) তখন দেশজুড়ে উচ্ছ্বাসের আর সীমা রইল না।

এসব কিছু যেন ঘটে গিয়েছিল চক্ষের নিমেষে। গ্রীস দেশের সাত সাতটি নগর একদিন মহাকবি হোমারকে জন্ম দেবার গৌরব নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছিল। আর যদিও জেসপার গিবনের জন্মস্থান সুপরিচিত ছিল সবার কাছে (ওয়ালসাল) তবু দ্বিগুণ সাতটি নগর তাঁকে আবিষ্কার করবার সম্মান দাবি করেছিল। সাহিত্যের খ্যাতনামা বিশিষ্ট বিচারকেরা, যাঁরা গত কুড়িটি বৎসর ধরে সাপ্তাহিকের পাতায় পাতায় পরস্পর প্রশংসা গান গাইতে গাইতে মুখর ছিলেন, তাঁদের কলহ এমনি তিক্ততায় এসে দাঁড়িয়েছিল যে এথেনিয়ামের অঙ্গণে একদিন কেটে ফেললেন একজন আর একজনকে। তাঁকে তাঁর প্রাপ্য স্বীকৃতি দিতে বাইরের দুনিয়া পিছিয়ে ছিল না। দোয়েজার ডাচেসরা, কেবিনেট মন্ত্রীর, স্ত্রীরা বিধবা বিশপ পত্নীরাও লাঞ্চ খেতে বা চায়ের আসরে নিমন্ত্রণ করতেন জেসপার গিবনকে। শোনা যায় হেরিসন এইনওয়ার্থ নাকি প্রথম ইংরেজ সাহিত্য-সাধক, যিনি ইংরাজ সমাজে সম-অধিকার নিয়ে মিশতে পেরেছিলেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস জেসপার গিবনই হয়তো প্রথম কবি যিনি ইংরেজ সমাজের যে কোনো রকম 'এট-হোম' পার্টির নিমন্ত্রণ

চিঠিতে নিজের নাম খোদাই করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কাজেই মিসেস বারটন ট্রেফর্ডের পক্ষে শুধু নিচের তলায় ঘুরে বেড়াবার প্রশ্নই আসে না। প্রকাশ্যে তাঁর বিচরণ ছিল। জানি না কী বিরাট কৌশল, কতটুকু বুদ্ধির ইন্দ্রজাল, কতটুকু কোমলতা, কতটুকু গভীর সমবেদনা আবার কতটুকু ভীষণ তিরস্কার তিনি কাজে লাগাতেন, তবে এইটুকু মাত্র আমি আন্দাজ করতে পারি এবং প্রশংসাও করতে পারি যে, তিনি জেসপার গিবনকে মহত্বের আসনে উন্নিত করেছিলেন। অল্পদিনের ভেতরই গিবন তাঁর কোমল হাতের মুঠোয় এসে গিয়েছিলেন। তিনি সুধন্যা। ঠিক ঠিক লোকের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য তিনি গিবনকে লাঞ্চ খেতে ডাকতেন, তাঁর বাড়িতে 'এট হোম' পার্টিতে ইংলণ্ডের বিশিষ্ট লোকদের সম্মুখে গিবন তাঁর কবিতা পড়বার সুযোগ পেতেন। খ্যাতনামা অভিনেতাদের সঙ্গে তাকে তিনি পরিচয় করিয়ে দিতেন। তাদের কাছে নাটক লিখে দেবার অনুজ্ঞা গিবন পেতেন; শুধু যথাস্থানে যাতে তাঁর কবিতাগুলো প্রকাশিত হয় সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখতেন। প্রকাশকদের সঙ্গে অতি সহজে গিবনের হয়ে মিসেস ট্রেফর্ড চুক্তি করতেন। কেবিনেট মন্ত্রীরাও যাতে হিমসিম খেয়ে যেত, কেবল তাঁর অনুমোদিত লোকের আমন্ত্রণ যাতে গিবন গ্রহণ করেন সেদিকে তাঁর নজর থাকত। এমন কি যে স্ত্রীর সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে দশ বছর জীবন কাটিয়েছিলেন তার কাছ থেকেও গিবনকে বিচ্ছিন্ন করে আনতে তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন সত্যিকার কবি আর শিল্পীকে সংসারের বন্ধন নিয়ে আটকে থাকলে চলবে কেন। তারপর যেদিন আঘাত এল সেদিন ইচ্ছে করলেই তিনি বলতে পারতেন, মানুষের পক্ষে যতটুকু সম্ভব সবই তিনি করেছিলেন তাঁর জন্যে।

কারণ, সত্যি সে আঘাত এসেছিল একদিন। জেসপার গিবনের আরো একখানা কবিতার বই প্রকাশিত হলো, প্রথমটির চেয়ে ভালো হলো না, মন্দও নয়; অনেকটা প্রায় প্রথমটির মতোই। শ্রদ্ধার সঙ্গে লোকে এটিকে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সমালোচকরা অকুণ্ঠ হতে পারল না। কেউ বা কলমের খোঁচা দিতেও পরাঙ্মুখ হলো না। বইটা ব্যর্থ হলো। তেমন কাটতি হলো না। জেসপার গিবন একটু হাতটান দিলেন। টাকা খরচ করবার অভ্যাস তাঁর কোনোদিন ছিল না। সেসব বিলাসিতার ভেতর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেসবে তিনি অনভ্যস্ত ছিলেন। হয়তো গৃহের শান্তি এবং স্ত্রীর অতি সাধারণ সাহচর্য তাঁর মন চাইত; দুবার একবার মিসেস বারটন ট্রেফর্ডের বাড়িতে ডিনারে এমন অবস্থায় আসতেন; যারা মিসেস ট্রেফর্ডের চেয়েও কম সংসার অভিজ্ঞ ও তাঁর চেয়েও মনের সরলতা কম। তারা হয়তো

গিবনকে সংসারের প্রতি উদাসিন মনে করত। মিসেস ট্রেফর্ড তাঁর অতিথিদের চুপি চুপি বুঝিয়ে দিতেন হয়তো কবির মন সুস্থ নেই। তার তৃতীয় বইটিও একেবারে ব্যর্থ হলো। সমালোচকেরা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল গিবনকে। মাটিতে ফেলে মাড়িয়ে গেল এডওয়ার্ড ডিফিলডের একখানা প্রিয় গানের কলি ধরে বলতে গেলে বলতে হয় তাঁরা তাঁকে ঘরময় হিঁচড়ে বেড়ালো, তারপর লাফিয়ে পড়ল তাঁর মুখের উপর মনেমনে তারা বিরক্ত হলো এই ভেবে যে, একজন অতি মামুলি পদ্যকর্তাকে তারা আখ্যা দিয়েছিল মরণজয়ী কবি বলে। তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো তাদের ভুলের মাশুল দিতেই হবে তাঁকে। তারপর একদিন পিকাডেলিতে মাতলামি করার অপরাধে জেসপার গিবন পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হলেন। মিসেস বারটন টেফর্ডকেই ভাইন স্ট্রীট থানায় যেতে হয়েছিল গভীর রাতে, জামিনে খালাস করে আনবার জন্য।

সে সময় মিসেস বারটন টেফর্ডের ব্যবহার একেবারে নিখুঁত ছিল। তিনি কখানো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন না। একটিও কড়া কথা কোনো সময় মুখ দিয়ে বেরুত না। যে লোকটির জন্য তিনি এত করেছিলেন সেই যখন তাকে এমনি করে বিপর্যস্ত করল তখন তাঁর মন তিক্ততায় ভরে উঠল। তবু তিনি তেমনি কোমল, তেমনি নম্র এবং তেমনি সংবেদনশীল রইলেন। তিনি এমনি ধরণের নারী, যার উপলব্ধি ছিল। তিনি তাঁকে পরিত্যাগ করলেন, কিন্তু উত্তপ্ত ইট বা গরম আলুর মতো নয়। তিনি তাঁকে পরিত্যাগ করলেন সহৃদয়তা এবং শোভনতার সঙ্গে। তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ করতে বাধ্য হয়ে যে অশ্রু-বিন্দু সত্যি তাঁকে ফেলতে হয়েছিল তারি মতো নিঃশব্দে; এমনি বিচক্ষণতা এবং বুদ্ধির সঙ্গে তাকে পরিত্যাগ করেছিলেন যে জেসপার গিবন আদৌ বুঝতে পারেননি বোধহয়। কিন্তু এবিষয়ে আদৌ কোনো সন্দেহ ছিল না। তাঁর বিরুদ্ধে তিনি কিছুই বলতেন না, এমন কি তাঁর সম্বন্ধে আলোচনাও তিনি করতেন না, তাঁর কথা কেউ উচ্চারণ করলে একটা বিষণ্ণ হাসির রেখা হয়তো তার ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠত। তিনি শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতেন। কিন্তু তার সেই হাসিতে থাকত একটা অদ্ভুত 'ক্যু দ্য গ্রেস' দীর্ঘ নিঃশ্বাসের গভীর অতলে তিনি ডুবে যেতেন।

কিন্তু মিসেস বারটন ট্রেফর্ডের সাহিত্যের প্রতি প্রেম এমনি গভীর এবং আন্তরিক ছিল যে এ ধরণের বাধা বিচলিত বা নিরাশ করতে পারেনি তাঁকে। কিন্তু তাঁর নৈরাশ্য যতই গভীর হোক না কেন, তাঁর প্রকৃতিতে নিস্পৃহতাও এমনি ছিল যে বিচক্ষণতা, সমবেদনা, উপলব্ধি বোধ প্রভৃতি তাঁর চরিত্রের

মহৎ গুণগুলি নিষ্ফল থাকেনি কোনোদিন। সাহিত্যের আসরে তিনি আবার ঘোরাফেরা করতে লাগলেন। আবার এখানে ওখানে সাহিত্যের আসরে তাঁর গতিবিধি শুরু হলো, সঙ্গীতের আসর, এট-হোম প্রভৃতিতে আবার যেতে লাগলেন। আগের মতোই তেমনি হাস্যমুখরা তেমনি সুমধুরা সুশোভনা, কিন্তু তিনি রইলেন সদা জাগ্রত, সচেতন শুধু বিজয়ীর পেছনে দাঁড়াবেন এই দৃঢ় সঙ্কল্প (যদি খুব চাঁছা-ছোলা ভাবে আমি কথাটা ব্যবহার করি) তাঁর চোখে মুখে। ঠিক এমনি সময় তাঁর পরিচয় হলো এডওয়ার্ড ডিফিলডের সঙ্গে এবং তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে সন্তোষজনক মত পোষণ করতে লাগলেন। এটা সত্যি ডিফিলড তখন কাঁচা বয়সের ছিলেন না, কিন্তু জেসপার গিবনের মতো নিঃশেষে মিলিয়ে যাবার সম্ভাবনা আদৌ তখন ছিল না তাঁর ভেতর। তিনি ডিফিলডকে বন্ধুত্ব দিতে চাইলেন। ডিফিলড মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না যখন মিসেস টেফর্ড তাঁকে বললেন যে, এমনি সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তাঁকে আবদ্ধ হয়ে থাকা একটা অমার্জনীয় অপরাধ। ডিফিলড খুব খুশী হলেন এবং একটু গর্ব অনুভব করলেন। নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে অপরের মুখে স্তুতিবাদ সত্যি খুব আনন্দের জিনিষ। মিসেস টেফর্ড ডিফিলডকে বললেন তাঁর স্বামী কোয়াটারলি রিভুইয়ে একটা প্রবন্ধ লিখবার কথা ভাবছেন তাঁর সম্বন্ধে। যাদের দিয়ে কাজ হবে এমনি লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার সুযোগ দিতে লাঞ্চে ডাকতে লাগলেন ডিফিলডকে। সমপর্যায়ের লোকদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ নেবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তার কাছে। কোনো কোনোদিন চেলসা বাঁধের দিকে বেড়াতে যেতেন ডিফিলডকে নিয়ে। মৃত কবিদের কথা নিয়ে আলোচনা করতেন, প্রেম এবং বন্ধুত্ব সম্বন্ধে কথা বলতেন এবং পথের ধারে যেকোনো দোকানে বসে চা খেতেন। মিসেস বারটন টেফর্ড যেদিন শনিবারের সন্ধ্যায় লিম্পাস ষ্ট্রীটে আসতেন সেদিন মনে হতো যেন বিবাহের যাত্রায় রওনা হয়েছেন কোনো রাজরাণী।

মিসেস ডিফিলডের সঙ্গেও তাঁর ব্যবহার ছিল একেবারে নিখুঁত নির্দোষ। বেশ অমায়িক, অথচ করুণা বিতরণ প্রয়াসী ছিল না। তাদের বাড়িতে তাঁকে আসবার সুযোগ দিয়েছেন বলে মিসেস ডিফিলডকে সব সময় তিনি ধন্যবাদ জানাতেন। তাঁর চেহারার জন্য তাঁকে প্রশংসা করতেন। যদি তিনি মিসেস ডিফিলডের সামনে ডিফিলডের প্রশংসা করতেন এবং তাঁর কথার ভেতর একটুখানি ঈর্ষার সুর রেখে বলতেন, এমনি একটি বিশিষ্ট লোকের সাহচর্য পাওয়ার তিনি ভাগ্যবতী, তবে সেটা নিতান্ত আন্তরিক মমত্ববোধ থেকেই বলতেন, অপর স্ত্রীলোকের মুখে স্বামীর প্রশংসা

শোনার চেয়ে আর কিছুতেই সাহিত্যিকের স্ত্রী বেশী তুষ্ট হয় না, এ কথাটা জানতেন বলে নয়। মিসেস ড্রিফিলডের সঙ্গে সাধারণ বিষয় নিয়ে তিনি আলাপ আলোচনা করতেন। যেসব বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল, যেমন রান্না, চাকর-বাকরের কথা, ড্রিফিলডের স্বাস্থ্য, এ সম্বন্ধে তাঁর কতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত এমনি সবকিছু। মিসেস বারটন ট্রেফর্ড মিসেস ড্রিফিলডের সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করতেন যেটা একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ একটি প্রাক্তন বার-মেডের প্রতি একজন স্কচ ভদ্রমহিলার পক্ষেই সম্ভব। তিনি বেশ আন্তরিকতা প্রকাশ করতেন, দিলদরিয়া ভাব দেখাতেন, এবং তাকে সদা স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবার জন্য অটুট সঙ্কল্পের ভাব প্রকাশ করতেন।

খুব আশ্চর্য যে রোজি তাঁকে মোটেই সহ্য করতে পারত না। বাস্তবিক আমি দেখলাম একমাত্র এই মিসেস বারটন ট্রেফর্ডকেই সে পছন্দ করত না। আজকালকার নব্যা তরুণীরাও 'বিচেস-' বা ব্লাডি শব্দগুলো কথায় কথায় ব্যবহার করে, কিন্তু সেকালে বার-মেড্‌দের মুখেও এগুলো শোনা যেত না। রোজিকেও আমি এমন কোনো কথা বলতে শুনতাম না যাতে নাকি আমার কাকীমা কখনো রাগ করতেন। যদি কেউ কখনো শ্লীলতার পরিপন্থী কোনো গল্প বলত, দেখতাম তার চুলের গোড়া পর্যন্ত লাল হয়ে উঠত। কিন্তু সে এই মিসেস বারটন ট্রেফর্ডকে 'ওলড কোট' বলে উল্লেখ করত। তাঁর প্রতি একটুখানি ভদ্রতার সীমা রেখে ব্যবহার করতে তাকে বাধ্য করতে অতি ঘনিষ্ঠ লোকের অনুরোধও হার মানত।

—বোকামি করো না, রোজি। তারা তাকে বলত। সবাই রোজি বলেই তাকে ডাকত এবং আমিও যদি একটু সলজ্জভাব নিয়ে ইদানিং তাই বলতে শুরু করেছিলাম। তিনি ইচ্ছে করলে ড্রিফিলডকেও তৈরি করতে পারেন। কাজেই ওঁর বাধ্য হয়ে চলাই উচিত। কলকাঠি ওঁর হাতেই।

যদিও ড্রিফিলডদের অতিথিদের মধ্যে অধিকাংশ খুব কদাচিত আসত, কেউ হয়তো একটা বাদ দিয়ে অপর শনিবার অথবা অন্য কেউ হয়তো তৃতীয় শনিবার, কিন্তু একটা বিশেষ ছোট্ট দল ছিল, যার মধ্যে আমিও একজন। যারা প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আসত। আমরা হাতের-পাঁচ থাকতাম, আসতাম সবার আগে আগে এবং থাকতাম শেষ পর্যন্ত। এদের মধ্যে অতি বিশ্বস্ত ছিল কোয়েনটিন ফোর্ড, হ্যারি রেটফোর্ড আর লায়োনেল হিলিয়র।

বেশ ছোট্ট মানুষটি ছিল এই কোয়েনটিন ফোর্ড। বেশ সুন্দর চেহারা বা

নাকি পরবর্তীকালে মুভি ছবিতে বেশ প্রশংসা পেয়েছিল। বেশ খাড়া নাক এবং সুন্দর এক জোড়া চোখ, ভালো করে ছাঁটা মাথা ভর্তি বাদামী, চুল এক জোড়া কালো মিশমিশে গোঁফ। সে যদি আরো দু এক ইঞ্চি মাথায় লম্বা হতো তাহলে মেলোড্রামার ভিলেনের পার্টে বেশ মানাত। ভালো ভালো সম্পর্ক ছিল বলেও তাঁর বেশ সুনাম ছিল। তার অর্থ-প্রাচুর্যও ছিল বেশ। আর্টের চর্চা তার একমাত্র পেশা। প্রতিটা উদ্বোধনী রজনীতে অথবা ব্যক্তিগত প্রদর্শনীতে সে নিশ্চয় উপস্থিত থাকত। অপেশাধারী কাঠিন্য ছিল তার ভেতর, সমসাময়িক লোকদের সৃষ্টকর্মের প্রতি ভদ্রভাবে হলেও বেশ তির্যক ঘৃণা প্রকাশ করতেও সে কুণ্ঠা বোধ করত না। আমি আবিষ্কার করেছিলাম, সে ড্রিফিলডদের বাড়িতে আসত এডওয়ার্ডের প্রতিভার আকর্ষণে নয়, রোজির রূপের আকর্ষণে।

আজকে সেসব দিনের কথা ভাবতে গিয়ে আমার মনের এইটুক বিস্ময়কে আমি কিছুতেই দমন করতে পারছি না যে, যা অতি স্পষ্ট ছিল সেও আমাকে বলে দেওয়া হয়েছিল। যখন রোজিকে আমি প্রথম দেখেছিলাম তখন সে সুন্দরী কি আর কিছু এমনি প্রশ্ন কখনো আমার মনেও আসেনি এবং পাঁচ বৎসর পরে আবার যখন দেখলাম সেদিনই প্রথম দেখলাম যে সে সত্যি সুন্দরী। আমার মনে আগ্রহ জেগেছিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে আমি বেশী ভাবিনি। আমি এটাকে প্রকৃতির সাধারণ রীতি বলে মেনে নিয়েছিলাম। যেমন আমি মনে করতাম উত্তর সাগরের অথবা টেরকানবারি কেথেড্রালের মিনারের অপর পারেই সূর্য অস্ত যায়। যখন কারো মুখে শুনলাম রোজি সুন্দরী! শুনে আমার চমক ভেঙেছিল এবং রোজির সুন্দর দুটি চোখ নিয়ে যখন কেউ এডওয়ার্ডকে ভাগ্যবান বলে প্রশংসা করত এবং একটি মুহূর্তের জন্য তার চোখের দৃষ্টি রোজির মুখের উপর একটা স্নেহ প্রলেপ দিয়ে আসত, আমার দৃষ্টিও তখন ফিরে তাকাত সেইদিকে। লায়োনেল হিলিয়র ছিল একজন চিত্রকর। তার ছবির জন্য সে রোজিকে সিটিং দেবার জন্য অনুরোধ করত। তার ছবি আঁকার গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে যখন রোজির ভেতর কী দেখেছিল সেই কথা সে প্রকাশ করত, বোকার মতো তাকিয়ে তাকিয়ে আমি তার কথা শুনতাম। আমি হতভম্ব এবং বিভ্রান্ত হয়ে যেতাম। সে যুগের এক বিখ্যাত অভিজাত ফটোগ্রাফারের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল হ্যারি রেটফোর্ড-এর এবং বিশেষ চুক্তি করে সে রোজিকে ছবি তোলাবার জন্য নিয়ে যেত। পরের অথবা তারও পরের শনিবার ছবির প্লেট নিয়ে সে হাজির হতো এবং সবাই আমরা সেগুলো দেখতাম। এর আগে সান্ধ্য পোশাকে আমি রোজিকে কখনো দেখিনি। সেদিন

সাদা সাটিনের জামা পরণে ছিল রোজির, লম্বা চুল এবং ফাঁপান আস্তিন, বেশ নিচু কাটের জামা। সেদিন রোজি বিশেষ ধরণের চুল বেঁধেছিল। জঙ্গ লেনের ধারে যে তরুণীকে আমি প্রথম দেখেছিলাম এ যেন সে নয়, আর কেউ। কিন্তু লায়োনেল হিলিয়র বেশ অধৈর্যভাব দেখিয়ে ছবিগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

—অতি বাজে! সে বললে। ফটোতে রোজির কতটুকু ধরা পড়বে? ওর গায়ের রঙ ওর আসল জিনিষ। রোজির দিকে ফিরে তাকাল সে। আচ্ছা রোজি, তুমি মানো তো তোমার গাঁয়ের রঙই তোমার বয়সের বড়ো যাদু?

কোনো জবাব না দিয়ে রোজি ফিরে তাকায় তার দিকে। কিন্তু তার টসটসে রাঙা ঠোঁট দুটির উপর শিশুসুলভ এক ফালি দুষ্টু হাসির ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে।

—এই যাদুমন্ত্রটা যদি একবার ধরতে পারি, লায়োনেল হিলিয়র বলল— তাহলেই দেখবে, কত বড়ো বড়ো ষ্টক ব্রোকারের বউরা আমার কাছে হাঁটু গেড়ে পড়বে তোমার ছবির মতো একখানা ছবি এঁকে দেবার জন্য।

আমি জানতে পেরেছিলাম রোজি তার ছবির জন্য সিটিং দিচ্ছিল; এর আগে আমি কখনো চিত্রকরের স্টুডিওতে যাইনি এবং ওগুলো রোমান্সের সদর দরজা বলেই আমার ধারণা ছিল। ছবিটা দেখে আসতে আপত্তি আছে কিনা একদিন জানতে চাইলাম। হিলিয়র বললে এখনো কাউকে সে ছবিটা দেখতে দিতে চায় না। সে সময় হিলিয়রের বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ চেহারাতেও ছিল বেশ একটা জৌলুস। ভেন ডাইকের পোর্ট্রেটের মতো দেখতে, কোনো বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ না থাকলেও খুশীর ভাব ছিল বেশ। তাকে মাঝামাঝির চেয়ে একটু লম্বা মনে হতো; দোহারা গড়ন; কালো চুলের সুন্দর বাবড়ি ছিল মাথায়; বেশ লম্বা গোঁফ ছুঁচলো দাঁড়ি। চওড়া পাড়ের আলখাল্লা এবং স্পেন দেশীয় কেপ্-কোট পরতে সে ভালোবাসত। অনেক-দিন সে প্যারিসে ছিল, বহু শিল্পীর প্রশংসায় সে মুখর হয়ে উঠত। যেমন মনে, সিস্‌লে, রেনোয়ে প্রভৃতি যাদের নামও আমরা শুনিনি কোনোদিন, আবার স্যার ফেড্‌রিক লেটন বা মিঃ আলমা-টাডেমা বা মিঃ জি, এফ, ওয়াটস প্রভৃতির নাম করতেও সে ঘৃণায় নাক সিঁটকিয়ে উঠত, অথচ যাদের প্রশংসায় আমাদের মন ভরে উঠত। এরপর আমি কতবার অবাক হয়ে ভেবেছি কোথায় হারিয়ে গেল সে! বেশ কিছুদিন লণ্ডনে কাটাল, একটা কিছু করবে। কিছু হলো না বোধহয়। তারপর ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে হাজির হলো ফ্লোরেন্সে। লোকে বলত একটা ছবি আঁকার স্কুল খুলেছিল; কিন্তু বছর কয়েক পর, হঠাৎ একবার আকস্মিক ভাবে সেই শহরে গিয়ে আমি তার

খোঁজ করেছিলাম। কেউ তার কথা বলতে পারল না। হয়তো তার প্রতিভা ছিল, কেননা রোজি ডিফিলডের যে ছবিটা সে এঁকেছিল, আমার এখনো বেশ মনে আছে সে-টার কথা। কি জানি কোথায় গেল সেই ছবিটা! ছবিটা কি নষ্ট হয়ে গেছে? নাকি কেউ লুকিয়ে ফেলেছে, চেলসার কোনো দোকানের গুদোম ঘরের দেয়ালে মুখ আড়াল দিয়ে? কোনো ছোট শহরের আর্ট গ্যালারিতেও যদি ছবিখানা স্থান পেত আমি খুব খুশী হতাম।

তারপর একদিন যখন ছবিটা দেখবার অনুমতি পেলাম সেটার সদ্ব্যবহার করতে একটুও কার্পণ্য করলাম না। হিলিয়রের স্টুডিও ছিল ফুলহাম রোডে, কতকগুলো দোকানের পেছন দিককার গুটি কয়েক স্টুডিওর মধ্যে। একটা, একটা অন্ধকার দুর্গন্ধ ছড়ানো সরু পথ দিয়ে যেতে হতো। সেদিনটা ছিল মার্চ মাসের এক রবিবারের বিকেল, বেশ সুন্দর নীলাভ দিনটা, ফাঁকা রাস্তা ধরে ভিনসেন্ট স্কোয়ার থেকে হেঁটে হেঁটেই আমি গিয়েছিলাম। হিলিয়র তার স্টুডিওতেই থাকত। একটা বড়ো ডিভান ছিল, ঐতেই সে ঘুমতো। পেছন দিকে একটা ছোট্ট খুপড়ি মতো ঘরে সে তার সকালবেলার খাবার নিজের হাতে তৈরি করত। বুরুশগুলি পরিষ্কার করত, মনে হলো হয়তো স্নানও করত সেই ঘরটিতে।

গিয়ে দেখলাম যে পোশাকে সিটিং দিয়েছিল সেই পোশাকই তখনো রোজির পরনে। তারা দুজন চা খাচ্ছিল। হিলিয়র উঠে এসে দরজা খুলে দিল। আমার হাত ধরে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গেল কেনভাসটার কাছে।

—ঐ দেখুন, সে বলল।

রোজির পুরো অবয়বের ছবি সে এঁকেছিল, লাইফ-সাইজ থেকে হয়তো একটুখানি ছোটো। সাদা রঙের সিল্কের সান্ধ্য-পোশাক পরা। আকাদেমিতে যেসব পোর্ট্রেট দেখে আমি অভ্যস্থ সে ধরণের ছবি এটি ছিল না। কী বলব ঠিক বুঝতে পারলাম না, কাজেই যে কথাটা প্রথম মুখে এল সেইটাই আমি বললাম।

—কবে শেষ হবে?

—শেষ হয়ে গেছে। সে জবাব দিল।

আমি ভীষণ লাল হয়ে উঠলাম। বিশ্রী বোকা মনে হলো নিজেকে। তখনো আমি সেই টেকনিকটুকু আয়ত্ব করতে পারিনি। যে টেকনিকের জন্য আধুনিক শিল্পীদের শিল্পকর্ম খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারি বলে এখন আমার একটা গর্ব আছে। এখন হলে এমেচার শিল্প-রসিকদের জন্য বেশ একটা মনোজ্ঞ পরিচিতি পত্র রচনা করে দিতে পারতাম। যা নিয়ে খুব সহজে তারা তাদের প্রিয় শিল্পীদের রচনাকে মনোমতভাবে এবং তাদের শিল্প প্রতিভার

বিভিন্ন অনুভূতিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারতো। ঐতো যেমন ধরুন, 'অদ্ভুত তো!' উক্তিটা কঠিন এবং বাস্তবপন্থী শিল্পীর শক্তিকে স্বীকৃতি বুঝায়। তারপর 'কী ভীষণ সিনসিয়র' কথাটা, কোনো অলডারমেন-এর বিধবা পত্নীর একখানা রঙীন ফটো দেখে আপনার মনে যে বিব্রতভাব আসবে, তাকেই স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবে, একটুখানি অতি ক্ষীণ শিস-ধ্বনি, পোস্ট-ইমপ্রেশনিস্টদের প্রতি আপনার প্রশংস মনোভাবকেই স্পষ্ট করে তুলবে, 'ভীষণ মজাদার' কিউবিস্টদের প্রতি আপনার মনোভাবকে প্রকাশ করবে, শুধু একটুখানি 'ওহো' ধ্বনি বলবে আপনার মনকে জয় করে নিয়েছে, আর 'আহা' ধ্বনি আসবে যে অভিভূত হয়ে পড়েছে তারই কাছ থেকে।

—কী ভীষণ মিল! শুধু এই কথাটুকু অতি কুণ্ঠিতভাবে আমি বলতে পারলাম।

—আপনার খুব ভালো লাগবে না। হিলিয়র বলল!

—না, সত্যি খুব সুন্দর হয়েছে। চটপট আমি উত্তর দিলাম, নিজের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে। ছবিটা আকাদেমিতে পাঠাবেন কি?

—বলেন কি, নিশ্চয়ই না। গ্রোসভেনরে পাঠাতে পারি হয়তো।

আমি ছবি থেকে রোজির মুখের দিকে এবং রোজির মুখ থেকে ছবিটার দিকে চোখ ফেরাতে লাগলাম।

—আবার পোজ নিয়ে বসো, রোজি। হিলিয়র বললে! এবং তোমাকে দেখতে দাও ওকে।

মডেল স্ট্যাণ্ডের ওপর গিয়ে রোজি দাঁড়াল। আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালাম তার দিকে, তারপর ছবিটার দিকে। কি বলব, কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগল আমার মনে। যেন কেউ একটা ধারালো ছুরি ধীরে ধীরে বসিয়ে দিয়েছে সেখানটায়, তবু খুব কষ্ট দিল না সেই অনুভূতিটা, একটুখানি বেদনা-করুণ, তবু যেন মনোগ্রাহ্য। তারপর হঠাৎ যেন আমার হাঁটু দুটি ভেঙে আসল। কিন্তু আজ আমি ঠিক বলতে পারি না তার রক্ত মাংসের শরীর নিয়েই রোজি আমার স্মৃতিতে বেঁচে আছে আজও নাকি তার ঐ ছবিটা! কারণ, যখনই আমি তার কথা ভাবি তখন কোর্তা এবং পায়জামা পরা প্রথম দেখা ঐ মেয়েটির কথা মনে পড়ে না। সেকালে এবং বহুকাল পরেও যেসব পোশাকে আমি তাকে দেখেছি তাতে ও নয়, কিন্তু হিলিয়রের আঁকা সাদা সিল্কের পোশাক পরা, মাথার চুলে কালো মখমলের ফিতায় ফুল বাঁধা, এবং যে ভঙিতে দাঁড়িয়ে সে ছবিটি আঁকিয়েছিল শুধু তার সেই রূপটাই ভেসে উঠে আমার চোখের সামনে।

আমি কখনো ঠিক জানতাম না রোজির বয়স কত, কিন্তু যতগুলি বছর আমি

পেরিয়ে এসেছি সেগুলির হিসেব নিলে এই এসে দাঁড়ায় যে হয়তো তখন তার বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ। কিন্তু কখনো তাকে সেরকম মনে হতো না। মুখে রেখার কোনো চিহ্ন ছিল না, গায়ের চামড়া শিশুর চামড়ার মতো কোমল মসৃণ। দেহের গড়ন খুব ভালো ছিল বলব না। সে যুগের মহিলা-দের যেসব ছবি দোকানে বিক্রির জন্য পাওয়া যেত সেইসব ছবিতে স্পষ্ট অভিজাতসুলভ বৈশিষ্ট্যের কোনোটাই তার ছিল না। এক কথায় গড়নটা মনে হতো কেমন ভোঁতা ভোঁতা। তার ছোটো নাকটা ছিল বেশ একটু মোটা মতন। চোখ দুটো কেমন ছোটো ছোটো, মুখটা বিরাট বড়ো। কিন্তু তার চোখে কর্ন-ফ্লাওয়ারের নীল আভা চমক দিয়ে যেত। লাল আর টসটসে ঠোঁটের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোতেও যেন হাসির রেখা ফুটে উঠত। তার হাসি ছিল মনমাতানো, অতি আন্তরিক, এত মিষ্টি হাসি আমি দেখিনি কখনো। সব সময় কেমন একটা স্বভাবগত গাম্ভীর্য ফুটে উঠত তার চোখে-মুখে, কিন্তু যখন সে হাসত সারা মুখে সেই রেশ ছড়িয়ে পড়ে ঐ গাম্ভীর্যটাই যেন তাকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলত। যেন কোনো রঙ্ ছিল না তার মুখাবয়বে; কেমন যেন একটা ফ্যাকাসে-বাদামী রঙ, শুধু চোখের নিচটায় একটু ফিকে নীল রঙের ছোপ। চুলগুলো ফিকে সোণালী রঙ, সেকালিন ফ্যাশন মতো মাথার উপর বেশ উঁচু করে খোপার মতো তুলে রাখত।

—ছবি আঁকার মতো চেহারা বটে রোজির। হিলিয়র বলল, একবার রোজির দিকে তাকিয়ে আবার তার আঁকা ছবিটার দিকে। দেখছেন না, ও যেন কেবল সোনায় সোনায় ভরা! সবই বুঝি সোনা! ওর মুখ আর চুল, তবু সোনালী আবেগ ও জাগায় না কখনো, কেবল যেন রূপোলী হিমেল।

বুঝলাম কী বলতে চাইছে। রোজির রূপে আলো ফুটত, কিন্তু বড়ো ফিকে। চাঁদের আলোর মতো, সূর্যের আলো নয়। যদিও বা সূর্যের আলো, তবু সে যেন উষার শুভ্র কুয়াশায় ঢাকা। হিলিয়র তার ক্যানভাসের ঠিক মাঝখানটায় রেখেছিল রোজিকে, রোজি দাঁড়িয়ে ছিল। হাত দুটো ঝুলছিল দুই পাশে। হাতের তেলো খোলা সামনের দিকে। মাথাটা যেন হেলে পড়েছে একটু পেছনের দিকে। তার বুক আর গলার রূপে যেন আরো একটু আমেজ বিহ্বলতা দিয়েছে এই ভঙ্গি। সে যেন দাঁড়িয়েছিল কোনো এক অভি-নেত্রীর মতো অপ্রত্যাশিত মুগ্ধ উল্লাসে বিভ্রান্ত-মনা, কিন্তু এমন একটা কৌমার্যের আভরণ ঘিরে ছিল তাকে, বসন্তের প্রাণ-ছোঁয়া আমেজ দেওয়া, যে ঐ উপমাও বুঝি একটা ব্যর্থ প্রয়াস। এই শিল্প রুচিহীন প্রাণীটি কোনোদিন আসেনি গ্রিজ-পেইন্টের সংস্পর্শে, পাদ-প্রদীপের সামনে। সে

যেন দাঁড়িয়েছিল প্রেমাভিসার-প্রমত্তা কুমারীর মতো বিলিয়ে দিতে নিজেকে। প্রকৃতির অভিলাসকে চরিতার্থ করতে। প্রেমিকের অক্লেশ বন্ধনে ধরা দিতে। সে জন্মেছিল সেই যুগে যখন দেহের কোনো একটি বিশেষ অঙ্গরেখার সবল প্রাচুর্যের সাহসিক প্রদর্শনী কাউকে সচকিত করত না কখনো। সে ছিল ক্ষীণাঙ্গী, কিন্তু তার স্তনযুগলে ছিল প্রাচুর্যের আহ্বান আর নিতম্বে ছিল দেহৈশ্বর্যের হাতছানি। পরে মিসেস বারটন ট্রেফর্ড যখন ছবিখানা দেখে-ছিলেন তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, ছবিটা কোরবাণির গো-সাবকের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল তাঁকে।

পনেরো

এডওয়ার্ড ড্রিফিলড রাত্রে লিখতেন, তখন রোজির কিছু করবার থাকত না। সে সময়টায় কোনো একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারলে সে খুশি হতো। সে বিলাসিতা খুব পছন্দ করত আর কোয়েনটিন ফোর্ডেরও প্রাচুর্যের অভাব ছিল না। সেভয় অথবা কেটনার-এ ডিনার খাবার জন্য ক্যাবে করে সে রোজিকে নিয়ে যেত। রোজিও তার সেরা সেরা পোশাক পরে বেরোত ফোর্ডকে খুশি করবার জন্য। তারপর হ্যারি রেট-ফোর্ড—যদিও তার কিছুই ছিল না, তবু দেখাতে চাইত যেন কতো বড়ো-লোক—সেও। হ্যানসমে দাঁড়িয়ে রোজিকে নিয়ে যেত। রোমানোতে ডিনার খাওয়াতে অথবা সোহো অঞ্চলে নাম করে উঠেছে এমনি কোনো একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁয় রেটফোর্ড একজন অভিনেতা। তবে বেশ চালাক, কিন্তু কিছুতে টিকে থাকতে পারত না। তাই অনেক সময়ই তার কোনো কাজ থাকত না। তখন তার বয়স প্রায় তিরিশের কাছাকাছি। বেশ একটু কুৎসিত মুখের চেহারা ছিল মানুষটার। থেমে থেমে কথা বলত। তাই তার নিজের কথাতেই বেশ নাকি মজা লাগত তাকে। জীবনের প্রতি তার এমনি একটা তাচ্ছিল্যভাব, লণ্ডনের সেরা দরজি দিয়ে তৈরি দাম না দেওয়া পোশাক পরবার অত্যুগ্র আগ্রহ, জেতবার আশা নেই ঘোড়ার পেছনে পাঁচ শিলিং দান ফেলা, আবার কোনো একটা দান জিতে টাকাগুলিকে খোলাম-কুচির মতো ছড়িয়ে দেবার দিল-দরিয়া ভাব—এ সবই ভালো লাগত রোজির। রেট ফোর্ডের বৈশিষ্ট্য সে আমুদে, দেমাকি আর বিবেকহীন। রোজির কাছে শুনেছিলাম একবার রেট ফোর্ড ঘড়ি বাঁধা দিয়ে তাকে ডিনার খাইয়েছিল। তারপর একদিন যে অভিনেতা-ম্যানেজার থিয়েটারে দুটো আসন ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, তারই কাছ থেকে দু পাউণ্ড ধার নিয়ে তাকেই তাদের সঙ্গে ডিনার খেতে নিয়ে গিয়েছিল থিয়েটার দেখার পর।

কিন্তু লায়োনেল হিলিয়রের সঙ্গে তার স্টুডিওতে খেতেও রোজি সমভাবে ভালোবাসত; সেখানে গিয়ে দুজনে মিলে চপ তৈরী করে খেত। সারাটা সন্ধ্যা কাটিয়ে দিত গল্পগুজব করতে করতে। তবে রোজি খুব কদাচিত আমার সঙ্গে ডিনার খেতে যেত। ভিনসেণ্ট স্কোয়ারে রোজি ড্রিফিলডের সঙ্গে ডিনার সারবার পর আমি গিয়ে তাকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসতাম এবং দুজনে মিলে বাসে করে মিউজিক হলে যেতাম। এখানে সেখানে অনেক জায়গায় আমরা যেতাম। কখনো পেভিলিয়নে অথবা টিভলিতে আবার কোনো সময় মেট্রোপলিটনে যদি কোনো বিশেষ রকম কিছু থাকত, কিন্তু কেনটারবারি ছিল আমার প্রিয় গন্তব্যস্থল। যেমনি সস্তা তেমনি প্রদর্শনীও ভালো থাকত। দু গ্লাস বিয়ারের অর্ডার দিতাম এবং বসে বসে আমি আমার পাইপ টানতাম। অন্ধকার বিরাট ধোঁয়াটে ঘরটার চারদিকে চোখ বুলোতে রোজির খুব ভালো লাগত। সারা দক্ষিণ লণ্ডনের বাসিন্দারা এখানে এসে ভিড় করত।

—কেনটারবারিতে আসতে আমার বড্ড ভালো লাগে। রোজি বলত। কেমন ঘরোয়া ঘরোয়া……

—একদিন আমি আবিষ্কার করলাম রোজি পড়াশুনো পছন্দ করে। সে ইতিহাস ভালোবাসে, তবে একটু বিশেষ রকমের ইতিহাস। রাণী এবং রাজপুরুষের উপপত্নীদের জীবন কাহিনীতেই তার লোভ ছিল, শিশুসুলভ বিস্ময় নিয়ে ঐসব অদ্ভুত কাহিনী আমার কাছে সে বর্ণনা করত। রাজা অষ্টম হেনরীর ছয়জন উপপত্নীর সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং মিসেস ফিজহারবার্ট অথবা লেডি হেমিলটন সম্বন্ধে এমন কিছু তথ্য ছিল না যা সে জানত না। আর তার জানবার ক্ষুধাও ছিল অপরিসীম, লুসারজিয়া বোরজিয়া থেকে শুরু করে স্পেনের ফিলিপ-এর পত্নীদের কাছ পর্যন্ত সে ধাওয়া করত, তারপর ফরাসী রাজপরিবারের অগুন্তি উপ-পত্নীদের নামের ফিরিস্তি। তাদের প্রতিটিকে সে জানত। তাদের প্রতিটা কথা তার জানা ছিল, আগনেস ঘোরেল থেকে আরম্ভ করে মাদাম দ্যু ব্যারি পর্যন্ত।

—বাস্তব ও সত্য ঘটনা সম্বন্ধে পড়তে ভালো লাগে। সে বলত—উপন্যাস পড়তে তেমন আগ্রহ পাই না।

ব্লেকস্টেবলের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে রোজি পছন্দ করত এবং আমি ভাবতাম ঐ জায়গার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল বলেই সে আমার সঙ্গে বাইরে বেরোতে চাইত। সেখানকার সব খবর সে জানত বলেই আমার মনে হতো।

—প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একবার করে সেখানে যাই মাকে দেখতে। সে বলত—

শুধু রাত্তিরটুকু থাকি।

—কোথায়? ব্রেকস্টেবলে? আমি একটু অবাক হয়েছিলাম।

—না, ব্রেকস্টেবলে নয়। রোজি একটু মুচকি হেসে জবাব দিত। ওখানে যেতে কখনো ইচ্ছে করবে এ আমি কল্পনাও করি না। আমি হেভারসামে যাই। মা ওখানে আসে, আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য। যেখানে আমি কাজ করতাম ঐ হোটেলেই উঠি!

রোজি কথা বলতে জানত না। অনেক দিন রাত্তিরটা যখন ভালো থাকত, দু জনেই আমরা সন্ধ্যা বেলাটা মিউজিক হলে কাটিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতাম। পথ চলতে চলতে সে কখনও একটি কথাও বলত না। কিন্তু তার এই নীরবতা ছিল খুবই নিবিড়। আমার ভালো লাগত। আপনার কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে যে চিন্তায় সে বিভোর থাকত সেই চিন্তা থেকে আপনি বাদ পড়তেন না। সবকিছুতে যেন জড়িয়ে থাকত আপনার উপস্থিতি।

একদিন আমি রোজির বিষয় আলোচনা করছিলাম লায়োনেল হিলিয়রের সঙ্গে। তাকে বলছিলাম, এইটাই আমি কিছুতে বুঝতে পারছিলাম না ব্রেকস্টেবলের মতো ছোট্ট পল্লী-শহরের সেই মিষ্টি দেখতে তরুণীটি কেমন করে আজ অনিন্দ্য রূপসী বলে সবার কাছে স্বীকৃতি পেল।

মাত্র একটি কথায় আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারব, লায়োনেল হিলিয়র বলল—যখন আপনি প্রথম দেখেছিলেন তখন সবে তার উঠতি বয়স। বেশ ফুটফুটে তাজা সুন্দর লাগত। কিন্তু তাকে রূপসী বানিয়েছি আমি।

মনে নেই কী জবাব দিয়েছিলাম, তবে কথাটা খুব শ্রুতিমধুর লাগেনি, এইটুকু মনে আছে।

—বেশ। এতেই প্রমাণ পাওয়া যায় নারীর রূপ সম্বন্ধে কিছুই আপনি জানেন না। কেউ কোনদিন রোজির কথা ভাবতো না, যদি না আমি তাকে নতুন রূপে দেখতাম। সূর্যের আলো পেলে যেমনি রূপোর রূপ জাগে, এও ঠিক তেমনি। আমি যতদিন না তার ছবি এঁকেছিলাম ততদিন কেউ জানত না তার মাথার চুল কত সুন্দর!

—তাহলে তার গ্রীবা, তার স্তন এবং তার চলার ভঙি, তার দেহের অস্থি, এগুলিও কি আপনি তৈরি করেছিলেন? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—হ্যাঁ, বটেই তো! ঠিক তাই আমি করেছিলাম। একটু বিরক্তির সুরেই সে জবাব দিল।

যখন হিলিয়র রোজির সামনে তার বিষয়ে আলোচনা করত তখন একটা হাসি হাসি গাম্ভির্য নিয়ে রোজি কথাগুলো শুনত। তার ফ্যাকাসে গাল দুটো কোনো কোনো সময় লাল হয়ে উঠত। আমার ধারণা যেদিন তার রূপের

কথা হিলিয়র রোজিকে প্রথম বলেছিল সেদিন কথাটা চাটুকারিতা বলেই হয়তো রোজি ধরে নিয়েছিল, কিন্তু একদিন যখন আবিষ্কার করল যে সত্যি তা নয়, এবং হিলিয়র তার দেহের রূপালী সোনার রঙ তুলিতে ফুটিয়ে তুলল সেদিন বিশেষ কোনো প্রভাব দেখা গেল না রোজির মনের উপর। সে শুধু একটুখানি আমোদ পেয়েছিল, খুশি হয়েছিল, একটু অবাক হয়েছিল, কিন্তু এতে তার মাথা গুলিয়ে যায় নি। হিলিয়রকে পাগল বলে সে ঠাউরে নিয়েছিল। অনেক সময় আমি ভাবতাম কোনো কিছু কি ছিল তাদের দুজনার ভেতর? রোজির কথা ব্রেকস্টেবলে আমি যা শুনেছিলাম এবং ভিকারেজের বাগানে যা নিজের চোখে দেখেছিলাম কোনোদিন তা আমি ভুলতে পারি নি। কোয়েন্টিন ফোর্ড এবং হ্যারি রেটফোর্ডের কথাও ভাবতাম। রোজির সংস্পর্শে তাদের দুজনকেই আমি লক্ষ্য করতাম। ঠিক ঘনিষ্ঠতা ছিল না ওদের। একটুখানি বন্ধুত্ব মাত্র। প্রকাশ্য ভাবে এবং যে কোনো লোকের সামনেই রোজি এদের সঙ্গে তার এপয়েনমেণ্ট করত, এবং যখনি সে তাদের দিকে তাকাত তার সেই দৃষ্টিতে থাকত দুষ্টুমিভরা শিশুর সরল হাসির রেশ। যে হাসির ভেতর আমি সেদিন রোজির ঐ এক রহস্যময় রূপের সন্ধান পেয়েছিলাম। অনেক সময় যখন মিউজিক হলে আমরা দুজন পাশাপাশি বসে থাকতাম, আমি মাঝে মাঝে তার মুখের দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। আমি তাকে ভালবাসতাম তা নয়, তবে তার অতি কাছটিতে নীরবে বসে থাকা, মাঝে মাঝে চুলের ফিকে সোনালী রঙ, দেহের চামড়ার ফ্যাকাসে সোনালী রঙের দিকে তাকিয়ে থাকবার যে মদির শিহরণ তা আমি প্রাণভরে উপভোগ করতাম। তবে লায়োনেল হিলিয়র ঠিক কথাই বলেছিল, রোজির দেহের ঐ যে সোনালী বরণ এ যেন মনকে চাঁদের আলোর মাদকতায় ভরে তুলত। মেঘমুক্ত আকাশ থেকে যেমন ধীরে ধীরে সরে যায় দিনের আলো তেমনি এক নিদাঘ সন্ধ্যায় প্রশান্ত পবিত্রতা যেন ঘিরে থাকে রোজিকে। তার ঐ বিরাট নিঃসাড়তার ভেতরেও যেন প্রাণহীনতা কিছু থাকত না, কেণ্ট উপকূলে অগাস্ট মাসের সূর্যের আলোর নিচে যেমনি প্রশান্ত সমুদ্রের জল স্থির ঘুমিয়ে থাকে সেও যেন তেমনি প্রাণবন্ত। কোনো এক ইতালিয় সুরকারের সৃষ্ট সোনাটার কথা সে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিত, যার সুরের স্পন্দনে থাকত ছন্দ, সেই সুরের ঝঙ্কারের অনুরণন বুঝি স্তব্ধ করে দিত নিঃশ্বাসের মৃদু স্পন্দনকেও। অনেক সময় তার উপর আমার চোখের দৃষ্টিকে অনুভব করে সে ফিরে তাকাত এবং কয়েকটি মুহূর্তের জন্য পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত আমার মুখের দিকে। কোনো কথা বলত না। আমি বুঝতে পারতাম না

কী সে ভাবত তখন।

মনে আছে, একদিন লিন্সাস রোডের বাড়ি থেকে রোজিকে আনতে গিয়েছিলাম। বাড়ির পরিচারিকার মুখে শুনলাম রোজি তখনো তৈরি হয়নি। পারলারে আমাকে বসতে বললে। সে এল। পরণে কালো মখমলের জামা। উটপাখীর পালক দেওয়া একটা টুপি মাথায়। আমাদের পেভেলিয়নে যাবার কথা ছিল, তাই সেইভাবে সে তৈরি হয়ে এসেছিল। তাকে তখন এত সুন্দর লাগল যে আমার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। আমি একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। সেদিনকার পোশাকে কেমন একটা গাম্ভীর্য ছিল এবং তার ঐ কুমারী রূপ-(নেপলস্-এর যাদুঘরে রাখা সাইকের তৈরি কোনো মূর্তির মতো অনেক সময় মনে হতো তাকে) সেদিনকার ঐ পোশাকের আভিজাত্যকে এমন করে ম্লান করে দিয়েছিল যে তার ভেতরই যেন কেমন একটা অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি লক্ষ্য করলাম। তার হাবভাবের ভেতর এমন একটা কিছু দেখলাম যা হয়তো চোখে পড়ে না সাধারণতঃ। তার ফিকে নীল চোখের নিচের চামড়া মনে হতো শিশির ভেজা। আমি নিজের মনকে কখনো বুঝাতে পারতাম না যে এটা স্বাভাবিক। তাই একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম চোখের নিচে সে কখনো ভেসেলিন মাখে কিনা। দেখে কতকটা সেই রকমই মনে হতো। সে একটু মুচকি হেসেছিল। একখানা রুমাল বার করে আমার হাতে দিয়েছিল।

—রুমালটা দিয়ে মুছে দেখ না। সে বলল।

তারপর আর একদিন রাত্রে কেন্টারবারি থেকে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এসেছিলাম। তাকে বাড়ির দোর-গড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরবার মুখে একখানা হাত যখন তার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলাম সে কেবল একটু ঝুঁকে এসেছিল।

—ভারি দুষ্টু তুমি। সে বলল।

সে আমার মুখে চুমু খেল। চট করে সেরে নেওয়া নেহাত মন-দেখা একটা কিছু নয়; আবার কোনো কামনার শিহরণও ছিল না সেই চুমুতে। তার ঠোঁট দুটি, সেই টসটসে ভরা ভরা সুন্দর লাল ঠোঁট দুটি, আমার ঠোঁটের উপর এমনি নিবিড় করে আশ্রয় নিয়েছিল যে ঐ ঠোঁটের আকৃতি আর স্পর্শের উষ্ণতা, কোমলতা আমি বেশ পূর্ণ করে অনুভব করতে পারছিলাম। ক্ষণিক পরেই সে তার ঠোঁট দুটি সরিয়ে নিয়েছিল, খুব আস্তে আস্তে। একটুও যেন তাড়া ছিল না তাতে। তারপর নিঃশব্দে অতি নীরবে দরজা ঠেলে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল বাড়ির ভেতর। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। ঐ পরিবেশটুকুর এমনি আকস্মিকতায় কেমন যেন আমি

অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। কোনো কথা আমি বলতে পারলাম না। তার দেওয়া এই চুম্বনকে কেমন যেন একটা নির্বোধের মতো গ্রহণ করেছিলাম। আমি নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এসেছিলাম নিজের আবাসস্থলে। রোজির সেদিনকার ঐ হাসিটা আজও বেশ আমার কানে বাজে। মনে পড়ে ঘৃণার কোনোরূপ প্রকাশ বা আঘাতের কোনো আভাস ছিল না সেই হাসিতে। সে হাসি ছিল প্রাণ-খোলা প্রীতিভরা, যেন সে হেসেছিল শুধু আমাকে ভালোবাসত বলে।

ষোল

প্রায় এক সপ্তাহের চেয়েও বেশি হবে, আমি আর রোজিকে নিয়ে বাইরে বেরুই নি। কোনোদিন সে তার মায়ের সঙ্গে এক-আধ রাত্রির কাটাবার জন্য হেভারসাম যেত। আবার লণ্ডনেও তার অনেক এনগেজমেণ্ট থাকত। তারপর একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তাকে নিয়ে হে-মারকেট থিয়েটারে যেতে পারি কিনা। নাটকটা ভালো চলছিল। কিন্তু পাশ পাওয়া সম্ভব ছিল না। কাজেই সাধারণ আসনে যাওয়া আমরা স্থির করলাম। কাফে মনিকোতে কিছুটা স্টিক্ আর এক গ্লাস বিয়ার খেয়ে নিয়ে টিকিট কাটার ভিড়ে গিয়ে আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম। সুশৃঙ্খল কিউ দিয়ে দাঁড়াবার অভ্যাস চালু হয়নি তখনো। কাজেই দরজা খুলবার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরে ঢুকবার জন্য ধাক্কা ধাক্কি শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমার কেমন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। কোনো রকমে যখন নিজেদের আসনে গিয়ে বসলাম তখন প্রায় অর্দ্ধমৃত অবস্থা আমাদের।

ফেরবার পথে সেণ্ট জেমস পার্ক হয়ে হেঁটে আমি বাড়ি ফিরছিলাম। রাতটা এত সুন্দর লাগছিল যে, পার্কের ভেতর একটা বেঞ্চিতে বসলাম কিছুক্ষণের জন্য। আকাশের তারার নরম আলোতে রোজির মুখ আর তার সুন্দর চুলগুলো ঝিলমিল করছিল। যেন কোনো এক প্রীতি রসের মধুর কোমল ক্ষীণ স্রোতধারায় সে স্নাত হয়ে উঠছিল (কথাটা খুব মামুলী লাগছে হয়তো, কিন্তু সে যে কোন অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল সেটাকে প্রকাশ করবার ভাষা আমার নেই), সে যেন একটি রাতের শুভ্র মল্লিকা। তার সৌরভ-অঞ্জলী সাজিয়ে রাখে ঐ চাঁদেরই জন্যে। ধীরে ধীরে আমার একখানা হাত দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরলাম। সে আমার মুখের দিকে ফিরে তাকাল। এইবার আমি তাকে চুমু খেলাম। সে একটুও নড়ল না। তার নরম লাল ঠোঁট দুটি আমার ঠোঁটের নিষ্পেষণের

কাছে অতি প্রশান্ত এবং নিষ্ক্রিয় অনুভূতি নিয়ে আত্মসমর্পণ করল, সরোবরের জল যেমন গ্রহণ করে চাঁদের কিরণকে। জানি না কতক্ষণ আমরা ছিলাম এভাবে। ..

—এই, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। হঠাৎ সে বলে উঠল।

—আমারও। আমি হেসে ফেললাম।

—কোথাও গিয়ে কিছু একটা খেলে হয় না?

—মন্দ কি!

সে সব দিনে ওয়েস্টমিনিস্টার অঞ্চলের সব অলিগলি আমার জানা ছিল। পার্লামেন্টের সদস্য বা এমনি ধরণের কৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের আনাগোনায় তখনও অভিজাত হয়ে ওঠেনি ঐ অঞ্চল। তখনও নিচের মহলের ভিড় সেখানে। পার্ক ছেড়ে বেরিয়ে এসে, ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট পেরিয়ে হর্সফেরি রোডে একটা ভাজা মাছের দোকানে আমি নিয়ে গেলাম রোজিকে। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল তখন, লোকের মধ্যে ছিল বাইরে দাঁড় করানো একটা চার-চাকা গাড়ির ড্রাইভার। মাছ ভাজা, চিপস আর এক বোতল বিয়ার অর্ডার দিলাম। একটি গরিব স্ত্রীলোক দোকানের ভেতর ঢুকল দেখলাম। দু পেনি দিয়ে কি যেন কিনল মেয়ে লোকটি। তারপর একটা কাগজে জড়িয়ে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। বেশ তৃপ্তির সঙ্গে আমরা খেলাম।

রোজির বাড়ি যেতে ভিনসেন্ট স্কোয়ার হয়েই আমাদের পথ। আমার বাড়ির সমুখে পৌঁছে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—এক মিনিটের জন্য আমার বাড়িতে একটু আসবে নাকি? আর ঘরগুলো তো তুমি দেখনি!

—কিন্তু তোমার বাড়িওয়ালী? শেষে একটা কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়বে, এ আমি চাই না।

—সে ভয় নেই। মড়ার মতো ঘুমোয়।

—বেশ, তবে বেশিক্ষণ থাকব কিন্তু।

তালায় চাবিটা ঢুকিয়ে দিলাম। প্যাসেজটা ভীষণ অন্ধকার। তাই রোজির হাত ধরে নিয়ে চললাম। বসবার ঘরে আলোটা জ্বালিয়ে দিলাম। রোজি তার টুপিটা নামিয়ে ফেলে পাগলের মতো মাথা চুলকোতে লাগল। তারপর একটা আয়না খুঁজতে লাগল, কিন্তু আমি একটু শিল্পীসুলভ রুচি আয়ত্ত করেছিলাম, তাই চিমনির উপর ঝুলানো আয়নাটা আমি সরিয়ে ফেলেছিলাম, কাজেই সেই ঘরে বসে নিজের চেহারা দেখবার সুযোগ আমি দিই না কাউকে।

আমার শোবার ঘরে এস। আমি বললাম—ও ঘরে একটা আয়না আছে।

দরজাটা খুলে দিয়ে ক্যাণ্ডেল জ্বালিয়ে দিলাম। আমার পেছন পেছন রোজি ভেতরে এল। ল্যাম্পটা একটু উ'চু করে ধরে রেখেছিলাম, নিজেকে সে দেখতে পারে যাতে। আয়নার ভেতর আমি দেখলাম তাকে, মাথায় চুল ঠিক করছিল। দু একটা চুলের কাঁটা খুলে রাখল, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রাখল সেগুলোকে, আবার চিরুণী দিয়ে ঘাড় থেকে উপর দিকে আঁচড়ে তুলতে লাগল চুলগুলোকে। চুলগুলো একটু পাকিয়ে একটু চাপ দিয়ে কাঁটাগুলো আবার বসাল চুলের মধ্যে। ঐ কাজে যখন তার মন সন্নিবিষ্ট হঠাৎ আয়নার ভেতর তার চোখ পড়ল আমার চোখে। একটু মুচকি হাসল রোজি। চুলের শেষ কাঁটাটা লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল আমাকে মুখোমুখি করে। কোনো কথা সে বলল না। প্রশান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে। তার নীল চোখ আর মুখে তখনো তার সেই প্রীতিভরা মুচকি হাসির রেশটুকু লেগে আছে। ক্যাণ্ডেলটা আমি নিচে নামিয়ে রাখলাম। আমার ঘরখানা খুবই ছোটো, এবং ড্রেসিং টেবিলটা বিছানার ধারেই। হাতখানা তুলে সে ছোট্ট একটা নরম টোকা দিল আমার গালে।

এখন ভাবি এই বইটা প্রথম পুরুষ একবচনে লিখতে শুরু না করলেই ভালো করতাম। এসব ক্ষেত্রে খুব ভালো লাগবে যদি নিজেকে একটুখানি অমায়িক অথবা বেশ একটু হৃদয়গ্রাহী বলে দেখাতে পারেন, যদি কিছুটা বীরপণা অথবা একটুখানি ভারিক্কি ধরণের কৌতুকের আভাস রাখতে পারেন, তাহলেও বোধহয় এর চেয়ে ভালো লাগবে না। এই পদ্ধতিতে লিখতে গিয়ে এই উপায়টা বেশি করে চর্চা হয়ে থাকে; নিজের কথা লিখতে সত্যি ভারি চমৎকার লাগবে যদি পাঠকের চোখের পালকে জল জ্বলে দুই ফোঁটা অশ্রু অথবা ঠোঁটের কোণে কোমল হাসির রেশ দেখতে পান। কিন্তু যদি একটা আস্ত নির্বোধ বলে প্রকাশ করতে হয় নিজেকে তাহলে নিশ্চয়ই ততটা সুখপ্রদ হবে না।

এই তো কিছুকাল আগে ইভেনিং স্টাণ্ডার্ড পত্রিকায় মিঃ ইভেলিন ওয়াঘ্-এর একটা প্রবন্ধ পড়ছিলাম। তিনি লিখেছেন উপন্যাস রচনায় প্রথম পুরুষ ব্যবহারের মতো বিশ্রী জিনিস আর কিছু নেই। এই কথাটাকে আরো একটু ব্যাখ্যা করলে ভালো হতো, কিন্তু তা না করে মানুন বা না মানুন এমনি ভাব দেখিয়ে, যেমন ইউক্লিড তার সমান্তরাল রেখা সম্বন্ধে সর্বজন-বিদিত মন্তব্য করেছিলেন, কথাটাকে তিনি ছুঁড়ে মেরেছিলেন। আমার একটু আগ্রহ জেগেছিল, তক্ষুণি কথাটা অলরয় কিয়ারকে জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম, (যে সব কিছু পড়ে থাকে, এমন কি যে সব বইয়ের ভূমিকা লেখে সেগুলিও) উপন্যাস লেখার উপায় সম্বন্ধে কয়েকখানা বইয়ের নাম করতে।

তার কথামতোই মিঃ পারসি লিউবক-এর লেখা 'ক্রাফট অব ফিকশন' বইখানা পড়েছিলাম। সেই বই থেকে আমি জেনেছিলাম যে হেনরি জেমসের পন্থাটাই সব চেয়ে সেরা পন্থা। তারপর মিঃ ই এম ফরস্টার লেখা 'আসপেকটস অব দি নভেল' বইখানাও পড়লাম। তখন মনে হলো ই. এম. ফরস্টার পদ্ধতিতে লেখাই উপন্যাস রচনার একমাত্র উপায়। তারপর আবার মিঃ এডউইন মুইর-এর 'দি স্ট্রাকচার অব নভেল' পড়লাম, এইবার আর কিছুই আমার মনে হলো না। এগুলোর কোনোটাতেই আমার প্রয়োজনীয় আসল বস্তু সম্বন্ধে কিছুই আমি পেলাম না। তা সত্বেও, এটা আমি বুঝতে পারি কেন কোনো কোনো ঔপন্যাসিক যেমন, ডিফো, স্টারনে, থ্যাকারে, ডিকেন্স, এমেলি ব্রন্ত এবং প্রাউস্ট, স্ব স্ব যুগে যাঁরা স্বনামধন্য ছিলেন অথচ আজকের দিনে যাঁরা নিঃসন্দেহে বিস্মৃত হয়ে গেছেন, মিঃ ইভেলিন ওয়াঘ্ যে পন্থাকে ঘৃণার যোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছিলেন সেই পন্থাকেই প্রয়োগ করেছিলেন। যতই আমাদের বয়স বাড়তে থাকে ততই আমরা মনুষ্য প্রকৃতির জটিলতা, অসঙ্গতি আর অবিবেচকতা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠি। কোনো মধ্য-বয়সী অথবা বয়স্ক লেখক, যাকে জটিল বিষয় নিয়েই নিজেকে নিয়োজিত রাখা উচিত, কাল্পনিক মনুষ্য জীবনের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে নিজেদের ব্যাপৃত রাখবার কারণ হিসাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য একমাত্র যুক্তি বলে জাহির করে থাকেন। কারণ মানুষকে দিয়েই যদি মনুষ্যজাতির বিচার করতে হয়, তাহলে বাস্তব জীবনের অপ্রাকৃত গোঁয়াটে চরিত্র নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে উপন্যাসের সঙ্গতিপুর্ণ, সারবান এবং বিশেষত্ব আছে এমনি মানুষ নিয়ে নাড়াচাড়া করার ভেতরে অনেক দিক দিয়ে স্পষ্ট যুক্তি আছে! অনেক সময় ঔপন্যাসিক নিজেকে ঈশ্বরের পর্যায়ে নিয়ে তুলে ফেলেন, এবং নিজের চরিত্রের সবকিছু খুঁটিনাটি বলতেও তাঁর মনে কুণ্ঠা জাগে না। অনেক সময় আবার পারেন না, আবার তখন যা জানা দরকার তার সবটুকু বলেন না। বলেন শুধু সেইটুকু যতটুকু তিনি জানেন নিজেকে, এবং যেহেতু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের পর্যায় থেকে আমরা নামিয়ে আনি নিজেদের, সেই হেতু আমার বিশ্বাস, ঔপন্যাসিকরাও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ সীমার গণ্ডির ভেতর সীমিত করে আনেন নিজের কর্মধারাকে, প্রথম পুরুষের একবচন এই সীমিত উদ্দেশ্য সাধনের পথে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

বোজি তার হাত তুলল এবং খুব আস্তে আমার মুখের উপর তার হাতের একটা আঙুল বুলোতে লাগল। তখন আমি যা করেছিলাম তা আমার করা উচিত ছিল কিনা জানিনা, কিন্তু এরকম পরিস্থিতিতে যা আমি

করে থাকি বলে জানি সে রকম আমি করিনি। একটা রুদ্ধ কান্নার আবেগ আমার গলা চিড়ে বেরিয়ে এলে। জানিনা আমার লাজুক স্বভাব এবং সঙ্গীহীনতা এর জন্য দায়ী কিনা, অথবা একটা তীব্র ভোগ-লিপ্সা আমাকে পেয়ে বসেছিল, তবে আমার কান্নার বেগকে রোধ করতে পারলাম না। পরমুহূর্তেই একটা দারুণ লজ্জায় আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। অশ্রুর বেগ উপচে উঠতে লাগল। কূল ছাপিয়ে আমার গাল বয়ে ধারা বইতে লাগল। ঐরকম অশ্রুধারা দেখে রোজি আঁৎকে উঠল।

—ওকি, ওকি? কী হয়েছে···কী হলো তোমার···? না, না···ছি ছি··
ওরকম করে না!···

সে তার বাহুতে আমার গলা জড়িয়ে ধরল এবং নিজেও কাঁদতে লাগল। আমার ঠোঁটে, আমার চোখে, আমার ভিজা গালে সর্বত্র পাগলের মতো চুমু খেতে লাগল। মাথাটা হাত দিয়ে ধরে নিচু করে এনে তার নগ্ন বুকের উপর চেপে ধরল।

—এই এইবার আলোটা নিবিয়ে দাও। ফিস ফিস করে সে বলল।

উষার আবছা আলো যখন পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে রাতের না-যাওয়া অন্ধকারের ভেতরও বিছানা এবং ওয়ার্ডরোবের আকৃতিটা স্পষ্ট করে তুলল তখন সে-ই আমাকে ডেকে তুলল। আমার ঠোঁটে চুমু খেয়ে সে আমার ঘুম ভাঙাল, তার মাথার চুল আমার মুখের উপর পড়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল।

—এইবার আমি উঠব। রোজি বলল। তোমার বাড়িওয়ালী টের পেয়ে যাবে এ আমি চাই না।

—এখনো সময় আছে।

সে যখন আমার মুখের উপর নুইয়ে পড়েছিল তার নগ্ন স্তন দুটির ভার আমার বুকের উপর চাপ দিয়েছিল। একটু পরেই সে উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। আমি আলোটা জেলে দিলাম। আয়নার কাছে গিয়ে সে তার চুলগুলো ঠিক করতে লাগল। হঠাৎ তার নগ্ন দেহটার উপর তার নজর পড়ল! একটা মুহূর্ত মাত্র! তার কোমরটা বেশ সরু ছিল, যদিও খুব বাড়তি গড়ন তবু বেশ হালকা দেখতে। তার স্তন দুটি বেশ খাড়া এবং সুঠাম বুকের ছাতির উপর থেকে উঠে এসেছে। যেন মার্বেল পাথরে খোদাই করা। এ দেহটা যেন তৈরী হয়েছিল পুরুষের ভোগের জন্য। আসি-আসি করা দিনের আলোতে ম্লান হয়ে যাওয়া ক্যাণ্ডেলের নিষ্প্রভ আলোতে সেই দেহকে মনে হলো যেন কাঁচা সোনার মতো, সেই দেহে ছিল শুধু একটুমাত্র রঙ, শুধু শক্ত স্তনাগ্রের গোলাপী লালটুকু।

দুই জনেই নীরবে কাপড় পরে নিলাম। সে তার জাঙিয়াটি আর পরল না, গুটিয়ে নিল। আমি ছেঁড়া খবরের কাগজ দিয়ে ওটাকে মুড়িয়ে দিলাম। প্যাসেজ দিয়ে পা টিপে টিপে আমরা বেরিয়ে এলাম। তারপর যখন দরজাটা খুলে বেরিয়ে এসে আমরা রাস্তায় পা দিলাম সেই মুহূর্তেই যেন উষার আলো ছুটে এল আমাদের সম্বর্দ্ধনা জানাতে। যেমন করে বেড়াল ছুটে যায় সিঁড়ি দিয়ে। পার্কটা তখন ফাঁকা। পূব দিকে এর মধ্যেই সূর্যের আলো উঁকি দিয়েছিল। ঐ আগত দিনটির মতোই যেন সজীব লাগল নিজেকে। বাহুতে বাহু আবদ্ধ করেই আমরা লিম্পাস স্ট্রীটের কোণ পর্যন্ত গেলাম।

—তুমি এবার যাও। রোজি বলল—কিছু বলা যায় না।

আমি তাকে চুমু খেলাম। হেঁটে হেঁটে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। খুব ধীরে ধীরে সে হাঁটছিল এবং পল্লী রমণীদের মতোই চেপে চেপে প্রতিটা পা ফেলছিল, মাটির স্পর্শকে অনুভব করবার জন্য। কিন্তু সে চলছিল সোজা হয়ে। আবার বিছানায় ফিরে যেতে আমার ইচ্ছে হলো না। ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম, যতক্ষণ না বাঁধ পর্যন্ত এসে পৌঁছলাম। ভোরের আকাশের রঙ নদীর জলে ছড়িয়ে পড়েছিল। একটা ডিঙি নৌকাতে পাড় ঘেঁসে দাঁড় বেয়ে চলছিল দুটি লোক। আমার ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছিল।

সতরো

এরপর প্রায় একটি বছর বা তার চেয়েও বেশীদিন যখনই রোজি আমার সঙ্গে বাইরে বেরুত, ফেরবার পথে অবশ্যি একবার আমার ঘরে আসত। কোনো দিন ঘণ্টাখানেকের জন্য, আবার কোনোদিন বা ভোর হয়ে যেত। এমনি কত রূপোলী ভোরের কথা এখনো আমার মনে পড়ে। সেসময় লণ্ডন শহরের ক্লান্ত আকাশে একটা সজীবতা ফুটে উঠত। নির্জন পথে আমাদের পথ চলার মৃদু পদধ্বনিও যেন শব্দ মুখরিত হয়ে উঠত। এবং মনে পড়ে শীতকালের ভোরে যখন ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ত, বৃষ্টি আসত, একই ছাতার নীচে গুড়িসুড়ি মেরে আমরা দুজনে পথ চলতাম, নীরবে অথচ প্রসন্ন চিত্তে। কর্মরত পুলিশ কনস্টেবলের সামনে দিয়ে যখন যেতাম সে আমাদের দিকে কটাক্ষপাত করত। কখনও বা সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাত। আবার কখনও অর্থবোধক দৃষ্টিও ঝলক দিয়ে উঠত তার চোখে। কখনও হয়তো কোনো হতভাগা গৃহহীন কোনো বাড়ির পোর্টিকোর নীচে গুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে দেখতাম। রোজি আমার হাতে একটু মৃদু চাপ দিত। শুধু দেখবার জন্য

এবং রোজির মনে আমার সম্বন্ধে একটা ভালো ধারণা সৃষ্টি করাবার জন্য যদিও বা বাজে খরচ করবার জন্য অপর্যাপ্ত শিলিং আমার পকেটে থাকত না। আমি একটা রৌপ্যমুদ্রা ঐ হতভাগ্যের কোলের উপর ছুঁড়ে ফেলতাম, অথবা অস্থিচর্মসার মুঠোর ভেতর গুঁজে দিতাম। রোজি আমাকে খুবই সুখী করেছিল। তার প্রতি আমার মনেও ছিল স্নেহ অপর্যাপ্ত। তাকে খুবই সহজ এবং স্বচ্ছন্দ লাগত। তার মেজাজে এমন একটা অমায়িকতা ছিল যে যে-ই তার সংস্পর্শে আসত তাকেই সে মুগ্ধ করত। পলাতক মুহূর্তগুলো তারি দেওয়া আনন্দের ছোঁয়ায় রসঘন হয়ে উঠত।

তার প্রণয়ী হবার আগে আমি নিজের মনে কতবার প্রশ্ন করতাম, রোজি অন্য কারো প্রণয়িনী হয়নি তো! যেমন—ফোর্ড, হ্যারি, রেট ফোর্ড হিলিয়ার বা এমনি কারও? পরে তাকেও আমি এই প্রশ্ন করেছিলাম। সে আমাকে চুমু খেয়েছিল।

—কি সব বাজে বকছ বল তো! ওদের আমার ভালো লাগে! সে তো তুমিও জান। ওদের সঙ্গে বাইরে বেরুতেই ভালো লাগে। বাস, এই পর্যন্ত।

সে কোনোদিন লর্ড জর্জের উপপত্নী ছিল কিনা এই কথা জিজ্ঞাসা করতেও আমার ইচ্ছে হতো, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে চাইতাম না। যদিও তাঁর মেজাজ আমি দেখিনি কোনোদিন, তবু এমনি একটা কিছু ছিল বলেই আমার ধারণা এবং আমি বেশ বুঝতে পারতাম এমনি প্রশ্ন শুনলে নিশ্চয়ই সে রেগে উঠবে আমার ওপর। তাকে এমন কোনো কথা বলবার সুযোগ দিতে আমি চাইতাম না যাতে তার দেওয়া আঘাতের জন্য তাকে ক্ষমা করতে পারতাম না। তখন আমার বয়স খুবই কাঁচ। একুশ বছরের সীমা পেরিয়েছি মাত্র। কোয়েনটিন ফোর্ড বা আর সবাই বয়সে অনেক বড়ো আমার চেয়ে। কাজেই রোজির কাছে তা শুধু বন্ধু মাত্র, এটা মোটেই অস্বাভাবিক মনে হতো না আমার। ভাবতেও একটা গর্বের শিহরণ লাগত যে আমি রোজির প্রণয়ী। প্রতি শনিবারের সান্ধ্য চায়ের আসরে যখন তাকে উপস্থিত সবার সঙ্গে হাসি তামাসায় মেতে উঠতে দেখতাম আত্মতৃপ্তিতে আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতাম। যে রাত্রিগুলো কাটিয়েছি তার সঙ্গে সেইসব কথা আমি ভাবতাম।

আমার গোপন অভিসার কাহিনী এদের কাছে অজ্ঞাত বলে এদের প্রতি আমার ভারি হাসি পেত। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হতো, লায়োনেল হিলিয়র যেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত, যেন আমাকে নিয়ে মনে মনে সে একটা কৌতুক অনুভব করত। আমিও মনের অস্বাচ্ছন্দ্য

নিয়ে ভাবতাম তবে কি তার সঙ্গে আমার এই গোপন অভিসার কাহিনীর কথা রোজি বলে দিয়েছে হিলিয়রকে। মনে মনে সন্দেহ হতো, নিজের ব্যবহার থেকে কিছু প্রকাশ হয়ে পড়েনি তো! আমি রোজিকে বললাম, হিলিয়র বোধহয় টের পেয়েছে। তার উজ্জ্বল-সহাস্য নীল চোখ দুটি নিয়ে সে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

—ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। রোজি বললে। ওর ভারি কুৎসিত মন।

—কোয়েনটিন ফোর্ডের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়নি কোনোদিন। সে আমাকে একটি অতি নির্বোধ এবং নগণ্য যুবক বলে মনে করত (আমি তাই ছিলাম অবশ্য) এবং যদিও সে সবসময় ভদ্রতা করত তবু আমার সম্বন্ধে কখনও কোনো রকম আগ্রহ দেখাত না। আমি ভাবতাম আগের চেয়েও সে আমার ওপর বিরূপ হয়েছে এই মনোভাবটা হয়তো আমার একটা কল্পনা মাত্র। কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেলাম। হঠাৎ একদিন হ্যারি রেটফোর্ড ডিনার খেতে এবং নাটক দেখতে যেতে নিমন্ত্রণ করে বসল আমাকে। আমি বললাম রোজিকে—নিশ্চয় তুমি যাবে। দেখবে খুব ভালো সময় কাটবে তোমার। খুব ভাল মানুষ এই হ্যারি। ও আমাকে হাসিয়ে মারে সবসময়।

তাই আমিও ডিনার খেলাম তার সঙ্গে। তাকে ভালো লাগল। অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের কথা তার মুখে শুনতে বেশ লাগল। তার ভেতর বেশ একটা করুণ রসিকতা ছিল। কোয়েনটিন ফোর্ডকে নিয়ে সে বেশ মজা করত, ঐ লোকটাকে আদৌ সে পছন্দ করত না। রোজির সম্বন্ধে তাকে দিয়ে কথা বলাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছুই তার বলবার ছিল না তার সম্বন্ধে। বেশ আমুদে লাগল তাকে। চোখের বিদ্রূপ কটাক্ষ এবং নানা-রকম হাস্য কৌতুকের ভেতর দিয়ে সে আমাকে বুঝিয়ে দিতে লাগল যে মেয়েদের ব্যাপারে সে একেবারে অকাঠ আনাড়ি। আমার মনে এই প্রশ্নটা না এসে পারল না, তবে কি আমি রোজির প্রণয়ী এই কথাটা জানত বলেই আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখবার জন্য আমাকে ডিনার খেতে নিমন্ত্রণ করেছিল? তবে সে যদি জানত, তাহলে আর সবাইও জানবে নিশ্চয়। তবে আমার ধারণা আমি প্রকাশ করিনি। কিন্তু মনে মনে ওদের প্রতি একটা পৃষ্ঠপোষকতার ভাব পোষণ করতাম এটা সত্যি।

তারপর একদিন শীতকালে, জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে হবে বোধহয়, একজন নতুন লোকের আবির্ভাব হলো লিমপাস রোডের আসরে। ভদ্রলোক একজন ওলন্দাজ ইহুদী। নাম জ্যাক কুয়েপার। আমস্টারডামের হীরকের ব্যবসায়ী। ব্যবসার ব্যাপারে কয়েক সপ্তাহের জন্য লণ্ডনে এসেছিল। জানি না কি করে তার ড্রিফিলডদের সাথে পরিচয় হয়েছিল। অথবা লেখক

হিসাবে সুনামের আকর্ষণে সে এ বাড়িতে এসেছিল কিনা তাও আমি জানি না। তবে এই আকর্ষণেই যে সে আবার ফিরে আসেনি এটা সত্যি। বেশ লম্বা এবং বলিষ্ঠ লোকটি। গায়ের রঙ একটু ময়লা! মাথা-ভর্তি একটা বিরাট টাক। বেশ বড়ো বাঁকানো নাক। বয়সও প্রায় পঞ্চাশ বছরের মতন হবে। তবে বেশ বলিষ্ঠ দেখতে চেহারা, আবার তেমনি মাদকতা দৃঢ়তা এবং আমুদে ভাবও ছিল বেশ। রোজির প্রতি তার মনোভাব সে গোপন করত না কখনও। বাহ্যত তাকে ধনী বলেই মনে হতো। কারণ প্রায় প্রতিদিন সে গোলাপ ফুলের তোড়া পাঠাত রোজিকে। তার এমনি অমিতব্যয়িতার জন্য রোজি ভৎর্সনা করত বটে, কিন্তু মনে মনে বেশ খুশী হতো। আমি তাকে বরদাস্ত করতে পারতাম না। লোকটা বড়ো বেশী মুখ কাটা এবং হৈ-চৈ করত ভীষণ। তার মুখের বিদেশী অথচ শুদ্ধ ইংরেজী আমি মোটেই পছন্দ করতাম না। রোজির প্রতি তার তেমনি অহেতুক অতিশয় তোষামোদি আমি আরও সহ্য করতে পারতাম না। যেরকম অন্তরঙ্গতা নিয়ে সে রোজির বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ব্যবহার করত তাও আমার ভালো লাগত না। তবে আমি লক্ষ্য করলাম কোয়েনটিন ফোর্ডও ঠিক আমার মতই ততটা পছন্দ করত না লোকটিকে। এই ব্যাপারটাকে উপলক্ষ্য করেই যেন আমাদের দুজনকার হৃদ্যতা হঠাৎ বেড়ে গেল।

—লোকটা বেশী দিন না থাকলেই রক্ষা পাওয়া যায়। জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে কালো ভুরু দুটি একটু উঁচু করে কোয়েনটিন ফোর্ড বললে। সাদা চুল এবং লম্বাটে পানসে মুখ বেশ ভদ্র-ভদ্রই লাগল তাকে। জানেন, সব মেয়েই সমান। শূন্য-গর্ভ কলসীর আওয়াজকেই ওরা পছন্দ করে।

—কী বিশ্রী অসভ্য লোকটা। আমি এই অভিযোগটুকু যোগ করলাম।

—আর এটাই ওর চার্ম। কোয়েনটিন ফোর্ড বলল।

পরের দু-তিন সপ্তাহ রোজির টিকিটির সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ হলো না। রাত এর পর রাত জ্যাক কুয়েপারই তাকে নিয়ে বাইরে যেতে লাগল। কখনও এই রেস্তোরায় কখনো ঐ রেস্তোরায়, একদিন এই নাটকে অন্যদিন আর কোনো একটিতে। আমার বিরক্তি আসল, আহত হলাম।

—লণ্ডনে কাউকে উনি চেনেন না। রোজি বলত আমার আহত অভিমানকে একটু প্রশমিত করতে চেষ্টা করে। যে ক'দিন এখানে আছেন, সে কয়দিনেই এখানকার সব দেখে ফেলতে চান। ওর মতো লোককে সব সময় একা একা বেরুনো ভালো দেখায় না। আর মোটে পনরো দিন, তারপরই উনি চলে যাবেন।

রোজির এমনি ক্ষতি স্বীকারের কী কারণ আমি বুঝতে পারলাম না।

—কিন্তু তোমার কি মনে হয় না ভদ্রলোক একটি অতি বাজে লোক ? আমি বললাম।

—না তো! আমার তো মনে হয় খুব মজার মানুষ। আমার কিন্তু বেশ মজা লাগে ওঁকে নিয়ে!

—তুমি জানো, তোমার জন্য ভদ্রলোকের মাথাটা একেবারে গুলিয়ে গেছে।

—দেখো, ভদ্রলোকের হয়তো ভালো লাগে, কিন্তু আমার তো তাতে কোনো ক্ষতি হয় না।

—ভদ্রলোক যেমন বয়সে বৃদ্ধ, আবার তেমনি মোটা, দেখতেও ভারি বিশ্রী। ওর দিকে তাকালেই আমার ভেতরটা কেমন বিলবিলিয়ে উঠে।

—এতো খারাপ কিন্তু আমি মনে করি না। রোজি বলল।

—ওর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক থাকা উচিত ছিল না, আমি আপত্তি করলাম. লোকটা অতি জঘন্য।

রোজি তার মাথা চুলকালো। ঐ ওর একটা বিশ্রী বদ অভ্যাস।

—জানো, ভাবতেও কেমন মজা লাগে, তোমার এই বিদেশীরা ইংরেজদের থেকে কত তফাৎ। সে বলল।

জ্যাক কুয়েপার যখন আমস্টারডামে ফিরে গেল আমি খুব খুশী হলাম। তারপর দিনই রোজি আমার সঙ্গে ডিনারে যাবে বলে কথা দিল। সোহো-তে যাব বলেই আমরা ঠিক করলাম। একটা হ্যানসমে রোজি আমাকে উঠিয়ে নিল। আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

—তোমার ঐ বুড়োটি গেছে তো ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—হ্যাঁ গেছে। বলেই সে হেসে ফেলল।

একটা হাত দিয়ে তার কোমরটা আমি জড়িয়ে ধরলাম। (আমি অন্যত্র বলেছি এসব ব্যাপারে আজকাল ট্যাক্সির চেয়েও আগেকার দিনের হ্যানসম গুলিতেই বেশী সুবিধে হতো) তার কোমর জড়িয়ে ধরে আমি চুমু খেলাম। বসন্তকালিন ফুলের মতো লাগল তার ঠোঁট দুটিকে। আমরা পৌঁছলাম। আমার টুপি এবং কোট ঝুলিয়ে রাখলাম। কোটটা ছিল খুব লম্বা, কোমরের কাছটায় ভীষণ আঁট-সাঁট। রোজিকে বললাম. তার ক্যাপটা খুলে দিতে।

—না, ওটা আমার গায়েই থাকবে।

—কিন্তু গরম লাগবে তো। তারপর বাইরে বেরুলেই আবার ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

—ওতে কিছু হবে না। আজকেই প্রথম পরেছি এটা। কী মনে হয় তোমার, জিনিষটা সুন্দর না ? দেখো, মাফলারটাও কেমন সুন্দর ম্যাচ করেছে!

আমি একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। ওটা 'ফার' দিয়ে তৈরি। তবে 'স্যাবল ফার' কিনা বুঝতে পারলাম না।

—খুব দামী মনে হচ্ছে, কোথায় পেলে ?

—জ্যাক কুয়েপার আমাকে দিয়েছেন। ওর যাবার আগে কালকে আমরা দুজনে গিয়ে কিনে এনেছি। নরম ফারের গায়ে হাত বুলিয়ে সে বলল, সে খুব খুশী হয়েছিল এটা পেয়ে। ছোট্ট শিশু খেলনা পেলে যেমন হয়।

—আচ্ছা এটার দাম কত হতে পারে বলতে পার ?

—ও আমার ধারণা নেই।

—দু'শ ষাট পাউণ্ড। জানো, জীবনে আমি এত দামী জিনিস পরিনি। আমি ওঁকে বলেছিলাম বড়ো বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। উনি শুনলেন না। জোর করে আমাকে গছিয়ে দিলেন।

রোজি আনন্দে খিলখিল করে উঠল, এবং তার দুটি চোখ চিক্‌চিক করে উঠল। কিন্তু আমার মুখের চেহারা কেমন বদলে গেল। বেশ বুঝতে পারলাম, একটা কম্পন শির শির করে নেমে গেল আমার শিরদাঁড়া দিয়ে।

—ড্রিফিল্ড কিছু মনে করবেন না জ্যাক কুয়েপার তোমাকে এমনি একটা দামী জিনিষ দিয়েছে বলে ? আমি বললাম, অবশ্যি নিজের গলার সুর একটু স্বাভাবিক করতে চেষ্টা করলাম।

দুষ্টুমিতে রোজির দুটি চোখ একটু নেচে উঠল।

—টেড কি রকম তুমি তো জানোই, ওর চোখে কিছু পড়ে নাকি ! আর ও যদি কিছু বলেও, আমি বলব কুড়ি পাউণ্ড দিয়ে বন্ধকী দোকান থেকে কিনেছি। এর চেয়ে বেশী কিছুই সে জানতে পারবে না। কলারে নিজের মুখটা ঘসল সে—আহ, কী নরম ! আর দেখলেই লোকে বুঝবে এটা দামী জিনিস।

আমি খেতে চেষ্টা করতে লাগলাম এবং মনের গোপন তিক্ততা যাতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে সেইজন্যে আলোচনা এ বিষয় থেকে ওবিষয়ে চালিয়ে যেতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। আমি যা বললাম রোজি বিশেষ কিছু মনে করল না। নতুন কেপটা নিয়েই সে মশগুল ছিল এবং প্রতি মুহূর্তে তার দৃষ্টি ঘুরে ঘুরে গিয়ে পড়ছিল, মাফলারটার দিকে। যেটাকে সে অতি যত্নে কোলের ওপর ধরে বসেছিল। এমন একটা স্নেহভরা দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিল, যে দৃষ্টিতে ছিল নিবিড় ভোগলিপসা এবং আত্মতৃপ্তি। আমার রাগ হলো তার ওপর। নির্বোধ এবং অতি বাজে লাগল।

—একটা ক্যানারি পাখি গিলে ফেললে একটা বিড়ালকে যেমন লাগে তোমাকে ঠিক তেমনি লাগছে। একটা আঘাত না দিয়ে আমি পারলাম না।

ফিক ফিক্ করে সে কেবল একটু হাসল।

—আমারও ঠিক তেমনি মনে হয় কিন্তু।

দু'শ ষাট পাউণ্ড আমার কাছে একটা বিরাট অঙ্ক। একটা কেপ-কোট কিনতে এত দাম কেউ দিতে পারে এ আমার ধারণাতেই আসেনি। আমার মাসোহারা ছিল মাত্র চৌদ্দ পাউণ্ড, খুব কম ছিল বলব না। কোনো পাঠক যদি সহজে হিসাবটা না করতে পারেন তঁার অবগতির জন্যে বলছি অঙ্কটা এসে দাঁড়ায় বছরে একশত আটষট্টি পাউণ্ড। শুধু মাত্র বন্ধুত্বের খাতিরে এরকম দামী জিনিস কেউ উপহার দিতে পারে এ আমি বিশ্বাস করতে পারিনি, এই কি নয় যে, লণ্ডনে ধাকাকালিন রাতের পর রাত রোজির সঙ্গে সহবাসের মূল্য হিসেবেই জ্যাক কুয়েপার যাবার আগে এই জিনিসটা দিয়ে গিয়েছিল তাকে? নইলে, কেমন করে রোজি এ উপহার গ্রহণ করতে পেরেছিল? তবে সে কি বুঝতে পারেনি এটা কতখানি নিচে নামিয়ে দিয়েছিল তাকে? সে কি বুঝতে পারেনি এত দামী একটা উপহার তাকে দিতে যাওয়া কতখানি ইতরামি? সত্যি সে পারেনি, কারণ কথাটা সে নিজেই প্রকাশ করেছিল আমার কাছে।

—এই দেওয়াতে ও'র আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছিল, নয় কি? তবে ইহুদীরা স্বভাবত একটু উদার।

—আমার বিশ্বাস তার দেবার ক্ষমতা ছিল বলেই সে দিয়েছিল। আমি বললাম—হঁ্যা, তা তো বটেই, ও'র প্রচুর অর্থ। তিনি বললেন, যাবার আগে একটা কিছু উপহার দিতে চান আমাকে। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি কী নেব! আমি বললাম একটা কেপ-কোট আর তার সঙ্গে ম্যাচ করে একটা মাফলার হলেই আমার চলবে। কিন্তু আমি ভাবতেও পারিনি এমনি একটা দামী জিনিস কিনে ফেলবেন আমার জন্যে। আমরা যখন দোকানে ঢুকলাম, আমি বললাম সাধারণ জিনিস দেখাবার জন্য; কিন্তু তিনি বাধা দিয়ে বললেন—না স্যাবল-ফার চাই, এবং সবচেয়ে দামী জিনিস। তারপর এইটা যখন দেখাল, তখন এইটা নেবার জন্যই তিনি আমাকে চেপে ধরলেন। আমি কল্পনা করতে লাগলাম, রোজির এই সুন্দর ছোট্ট দেহটা, দুধের মতো সাদা গায়ের চামড়া, ঐ বৃদ্ধ লোকটির কুৎসিত আলিঙ্গনে নিথর হয়ে আছে। কল্পনা করতে লাগলাম, ঐ বৃদ্ধের খসখসে মোটা ঠোঁট চুমু খাচ্ছে রোজিকে। তক্ষুনি আমার মনে হলো, যে সন্দেহকে কিছুতেই আমি বিশ্বাস করতে চাইছিলাম না, সেটা সত্যি। আমি বুঝতে পারলাম যখনি সে কোয়েনটিন ফোর্ড, হ্যারি রেট ফোর্ড বা লায়োনেল হিলিয়রকে সঙ্গে নিয়ে ডিনারে যেত তখন নিশ্চয়ই সে তাদের সঙ্গে রাত্রিবাস করত। যেমনি

সে করেছিল আমার সঙ্গে। আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। জানতাম, কথা বললেই অপমান করতে হবে তাকে। আমার মনে হয়না, আমার মনে ততটা ঈর্ষা জেগেছিল যতটুকু না আমি আহত হয়েছিলাম। মনে মনে এই অনুভূতিটুকু আমি বেশ উপলব্ধি করতে পারলাম যে, রোজি বোকা বানিয়ে চলেছিল আমাকে। আমার মনের সব তিক্ততা যাতে আমার ঠোঁটের গণ্ডি ডিঙিয়ে আঘাত না করে তাকে তাই আমি সবটুকু দৃঢ়তা নিয়ে প্রতিরোধ করতে লাগলাম।

আমরা থিয়েটারে গেলাম। নাটকের একটি কথাও আমার কানে গেল না। আমি অনুভব করতে লাগলাম, আমার পাশে ঐ স্যাবল-ফার-এর নরম স্পর্শ, আর দেখতে লাগলাম রোজির আঙুল প্রতিটা মুহূর্তে স্পর্শ করছে তার নরম মুখটিকে। অপরের কথা হয়তো আমি সহ্য করতে পারতাম কিন্তু ঐ জ্যাক কুয়েপারের চিন্তা যেন পাগল করে তুলেছিল আমাকে।

কেমন করে পারল রোজি? গরিব হওয়া সত্যি একটা মহাপাপ। আমার ইচ্ছে হলো যদি আমার প্রচুর অর্থ থাকত তক্ষুনি আমি বলতাম রোজিকে ঐ জঘন্য ফার-কোটটা ফিরিয়ে দিলে তার চেয়েও দামী কিছু আমি দিতাম তোমাকে। এইবার সে লক্ষ্য করল আমি কোনো কথা বলছি না।

—কোনো কথা বলছ না যে আজকে, কী হলো?

—কই, কিছু না তো!

—শরীর ভালো লাগছে না বুঝি?

—না, খুব ভালো আছি।

একটু তির্যক দৃষ্টিতে সে তাকাল আমার দিকে। তার চোখে আমি চোখ ফেললাম না, তবে আমি বুঝতে পারছিলাম আমার খুব চেনা ঐ হাসিটা যেমনি দুষ্টুমিতে ভরা তেমনি শিশুর মতো সরলতা ফুটে উঠেছে সেই দৃষ্টিতে আর কিছু সে বলল না। নাটক শেষ হবার পর, তখন বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। আমরা একটা হ্যানসন নিলাম। লিমপাস রোডে রোজির বাড়ির ঠিকানা বললাম ড্রাইভারকে। ভিকটোরিয়া স্ট্রীটে এসে পৌঁছবার আগ পর্যন্ত আর একটিও কথা বলল না রোজি; এইবার সে বলল:

—তোমার বাড়িতে আসি তুমি চাও না!

—সে তোমার ইচ্ছে।

গাড়ির পর্দা উঠিয়ে আমার বাড়ির ঠিকানাটা সে বলল ড্রাইভারকে। সে আমার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল এবং ধরে বসে রইল, কিন্তু আমি তেমনি নিস্পন্দ রইলাম। একটা আহত মর্যাদার ভাব নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। ভিনসেন্ট স্কোয়ারে পৌঁছে নিজেই

হাত ধরে নামালাম তাকে। বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলাম একটিও কথা না বলে। আমার টুপি এবং কোট খুলে রাখলাম। সেও তার কেপ-কোট এবং মাফলার ছুঁড়ে ফেলে দিল সোফাটার উপর।

—এরকম মুখ গুমড়ো করে আছ কেন বলত? রোজি বলল আমার খুব কাছে এসে।

—বই, না। আমি উত্তর দিলাম, বাইরে তাকিয়ে।

সে তার দুই হাতের ভেতর আমার মুখ টেনে নিল।

—আচ্ছা, তুমি এতটা বোকা হলে কেমন করে বল দেখিনি? জ্যাক কুয়েপার আমাকে একটা কেপ-কোট উপহার দিয়েছে বলে তুমি এতটা রেগে গিয়েছ? তুমি তো পারবে না দিতে, কি, পারবে?

—আমি পারব না সে সত্যি।

—আর টেডও পারবে না। দু'শ ষাট পাউণ্ড দামের একটা ফার-কোট আমি নেব না এ তুমি আশা করতে পার না। সারা জীবন-ভোর এমনি একটা ফার-কোট আমি চেয়ে আসছিলাম। অবশ্যি জ্যাকের কাছে এটা কিছুই না।

—আর কেবল বন্ধুত্বের খাতিরে তোমাকে ঐ কোটটা দিয়েছিল এ কথাটা আমি বিশ্বাস করব, এ আশাও তুমি করনা নিশ্চয়ই।

—হতেও তো পারে। যাক গে, সে আমস্টারডাম ফিরে গেছে, আবার কবে আসবে কে জানে।

—কিন্তু শুধু সে-ই তো নয়?

এইবার আমি রোজির দিকে তাকালাম, ক্রুদ্ধ, আহত এবং ঘৃণার দৃষ্টিতে সে মুচকি হাসল। তার ঐ সুন্দর হাসিটুকুর মিষ্টি করুণার ভাবটুকু যদি আমি বর্ণনা করতে পারতাম! একটা অদ্ভুত রকম শান্ত ছিল তার কণ্ঠস্বর।

—অন্য কাউকে নিয়ে তোমার ঐ মাথাটা ঘামাও কেন বল তো? তোমার কোন ক্ষতি হয় তাতে? তোমার সময়টুকুকে কি আমি ভরে তুলিনি? আমাকে কাছে পেলে কি সুখী হও না তুমি?

—খুব।

—তবে? এমনি হিংসে করা আর হৈ-চৈ করা কী বিশ্রী বল তো? কেন সুখী হও না, যতটুকু তুমি পাও, তাই নিয়ে? যখন সুযোগ পাও ভোগ করে নাও, এই আমার কথা। আগামী একশত বছরের বেশি কেউ-ই তো আর আমরা থাকব না, সেদিন কে মাথা ঘামাবে এসব নিয়ে? যতটুকু সুযোগ পাই চল ততটুকু-কেই আমরা সাথক করে ভোগ করে নিই।

সে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। তার ঠোঁট চাপ দিয়ে রাখল আমার ঠোঁটের উপর। সমস্ত রাগ আমি ভুলে গেলাম। আমি শুধু ভাবতে লাগলাম তার

রূপ আর করুণার কথা।
—আমি যা, ঠিক সেই ভাবেই নিও আমাকে। ফিস ফিস করে বলল রোজি।
—বেশ। আমি বললাম।

আঠারো

এসব দিনে ড্রিফিলডের সঙ্গে খুব কমই দেখা হতো। দিনের বেশি সময় কাগজের সম্পাদনার কাজ নিয়ে তাঁর কাটত এবং সন্ধ্যাবেলায় তিনি লিখতেন। তবে প্রতি শনিবার বিকেলে অবশ্যি তাঁকে পাওয়া যেত, যেমনি অমায়িক আবার তেমনি শ্লেষ বিদ্রূপভরা আমুদেপনা; আমাকে দেখলে তিনি খুব খুশী হতেন, কিছুক্ষণ আজে বাজে কথা নিয়ে গল্প করতেন আমার সঙ্গে; তবে স্বভাবতই ঐসব অতিথিদের উপর তাঁর বিশেষ দৃষ্টি থাকত—যাঁরা আমার চেয়েও বয়স্ক এবং আমার চেয়ে বেশী গণ্য-মাণ্য। তবে তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে একান্তে সরিয়ে নিচ্ছিলেন এটা আমি বুঝতে পারতাম। ব্লেকস্টেবলে আমার সেই অপরিচিত ফুর্তিবাজ, সভ্য আখ্যা দেওয়া যায় না এমনি সেই সঙ্গী যেন তিনি আর ছিলেন না। হয়তো বা আমার একটা ক্রমবর্দ্ধমান চেতনাবোধ তাঁর এবং অন্যান্য যাঁদের সঙ্গে হাস্য-কৌতুক রসিকতার ভেতর সময় কাটত তাদের ভেতর একটা অদৃশ্য গণ্ডি-রেখা আবিষ্কার করেছিল। যেন কোনো কল্পনা-লোকে তিনি বাস করতেন যার ঘন-রহস্য দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতাকে ধোঁয়াটে করে তুলত। পাবলিক ডিনারে বক্তৃতা দেবার জন্য প্রায়ই আমন্ত্রণ আসত। একটা সাহিত্যিক ক্লাবে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর লেখক জীবনে যে ক্ষুদ্র গণ্ডি তিনি গড়ে তুলেছিলেন তারও বাইরে বহু লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় বাড়তে লাগল। এবং গণ্য-মাণ্য লোকদের নিয়ে আসর জমানো যাদের স্বভাব এমনি সব মহিলাদের লাঞ্চ বা চায়ের আসরেও ঘন ঘন তাঁর ডাক পড়তে লাগল। রোজিরও ডাক পড়ত কিন্তু সে খুব কম যেত; সে বলত এই সব পার্টি-ফার্টি তার ভালো লাগত না। আর তাছাড়া সত্যি করে তাকে কেউ চাইত না, তারা চাইত টেডকে। মনে হয় এসব বিষয়ে একটু বেশী সচেতনতার জন্য এদের সে এড়িয়ে চলত। হয়তো বা তাকে নিমন্ত্রণ করবার অনিচ্ছা থেকে যে বিরক্তিবোধ তার-ই প্রকাশ বহুবার সে লক্ষ্য করত গৃহকর্ত্রীদের চোখেমুখে; তাকে নিমন্ত্রণ করত, কারণ এটা ভদ্রতার দাবী করলেও তাকে অবহেলা দেখাত। তাদের ধারণায় অতি সৌজন্য বিরক্তিকর।

প্রায় ঠিক এমনি সময় এডওয়ার্ড ড্রিফিলডের 'দি কাপ অব লাইফ' উপন্যাসখানা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর রচনার সমালোচনা করতে আমি

বসিনি, এবং এত বেশি লেখা হয়েছে এ নিয়ে যে হয়তো সবটুকু ক্ষুধা নিশ্চয় মিটে গিয়েছে আমার সাধারণ পাঠকদের। তবু এই কথাটা আমি বলব যে, 'দি কাপ অব লাইফ' উপন্যাসটি যদিও তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা নয়, অথবা খুব সর্বজনগ্রাহ্যও নয়, তথাপি আমার মতে এই উপন্যাসটির একটু বিশেষত্ব আছে। এমন একটা তুহিন নিষ্ঠুরতার প্রকাশ হয়েছে বইখানাতে যে, ইংরেজী সাহিত্যের সর্বজনবিদিত ভাবপ্রবনতার ভেতরও কেমন একটা অদ্ভুত মৌলিক সুরের ইঙ্গিত আছে এতে। মনকে যেমনি সজীব করে তোলে আবার তেমনি সঙ্কুচিত করে আনে। এর স্বাদ টক আপেলের মতো। দাঁতে দাঁত লেগে যায়, কিন্তু আবার এমন একটা তিক্ত-মধুর রস ছড়িয়ে আছে যে জিবে ভালো লাগে। ড্রিফিলডের লেখা সবগুলি বইএর মধ্যে এইটির মতো একখানা বই লিখতে পারলে আমিও খুব খুশী হতাম। শিশুটির মৃত্যু দৃশ্যটি খুব ভীষণ আবার তেমনি হৃদয় বিদারক। তবু নক্কার ক্না একটুও ক্লেদ নেই কোথাও, তারপর যে ঘটনা ঘটল, এর কোনোটাই যে একবার পড়েছে সে সহজে ভুলতে পারবে না।

বইয়ের এই অংশটিকে উপলক্ষ্য করেই হঠাৎ একদিন ভীষণ ঝড় উঠেছিল, যার প্রচণ্ডতা সেদিন হতভাগ্য ড্রিফিলডের মাথায় ভেঙে পড়েছিল। প্রকাশনার কয়েকদিন পরও এমনি মনে হলো হয়তো আর সবগুলোর মতোই সহজ মনে এগিয়ে চলবে এটাও, যেমন ধরুন সার্থক রিভিউ ছাপবে, মোটামুটি প্রশংসা করে, অবশ্যি "কিন্তুর" সুর থাকবে কিছুটা এবং বিক্রিও হবে সন্তোষজনক। যদিও খুব বাড়াবাড়ি কিছু না। রোজি আমাকে বলেছিল ড্রিফিলড তিনশত পাউণ্ড আশা করেছিলেন বইখানি থেকে এবং গ্রীষ্মের সময় নদীর ধারে একটা বাড়ি ভাড়া নেবেন এই কল্পনাও করেছিলেন। প্রথম দুই তিনখানা রিভিউতে কিছুই অর্থপূর্ণ মন্তব্য ছিল না; তারপর হঠাৎ একদিন এক প্রভাতী পত্রিকায় শুরু হোলো ভীষণ আক্রমণ। প্রায় এক কলম জুড়ে। বইটাকে বলা হলো অহেতুক আক্রমণাত্মক, অশ্লীল এবং বইখানা সাধারণে প্রকাশনার জন্য প্রকাশকগণ তিরষ্কৃত হলেন। ইংলণ্ডের যুবকদের ওপর কিরকম বিধ্বংসী প্রভাব বিস্তার করবে তার বীভৎস চিত্র অঙ্কিত হতে লাগল। নারী জাতির অবমাননা বলে রূপায়িত করা হলো বইখানাকে। রিভিউ লেখক তরুণ যুবক এবং অবিবাহিতা তরুণীদের হাতে বইখানা পড়বার সম্ভাবনার বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ ব্যক্ত করল। দেখাদেখি শুরু হলো অন্য কাগজগুলিতেও। যারা অতিরিক্ত নির্বোধ তারা দাবি করল যে বইখানাকে দাবিয়ে দেওয়া হোক। আবার কেউ অতিশয় গাম্ভীর্য নিয়ে প্রশ্ন করল পাবলিক প্রসিকিউটরের হস্তক্ষেপ করবার প্রশস্ত ক্ষেত্র নয় কি এটা? উপযুক্ত শাস্তি দেবার দাবি এল

সবার কাছ থেকে, কন্টিনেন্টের সাহিত্যের বাস্তববাদীতার সঙ্গে যাদের পরিচয় ছিল তাদের কেউ যদি সাহস করে বলেছে যে, এর চেয়ে ভালো কিছু এডওয়ার্ড ড্রিফিলড রচনা করেননি, তাকেও কেউ আমল দিল না। তার স্বাধীন মতকে সাধারণের মনকে বিভ্রান্ত করবার দুরভিসন্ধি বলে উড়িয়ে দিল। বইটির গ্রন্থাগারে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে গেল। রেলের বুকস্টলের মালিকরাও বইটি রাখতে অসম্মতি জানাল।

এডওয়ার্ড ড্রিফিলডের এসব স্বভাবতই খুব অপ্রীতিকর, কিন্তু সবকিছু একটা দার্শনিক প্রশান্তি নিয়ে তিনি সহ্য করলেন। শুনে শুধু একটু ঘাড় নাড়লেন। —সবাই বলে এ হতে পারে না, অবাস্তব। তিনি মুচকি হাসলেন, বললেন— সবাই জাহান্নামে যাক, আপত্তি নেই। কিন্তু এ সত্যি।

এমনি সঙ্কটের দিনে বন্ধুদের বিশ্বস্ততার সহায়তা তিনি পেয়েছিলেন। 'কাপ অব লাইফ' কে প্রশংসা করা সৌন্দর্য্যানুভূতি প্রকাশের একটা মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াল, বইটিকে অগ্রাহ্য করার অর্থ দাঁড়াল নিজেকে কাফের বলে প্রচার করা। মিসেস বারটন টেফর্ড এটিকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি বলে প্রচার করতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করলেন না, যদিও বারটনের কোয়ার্টারলিতে প্রবন্ধ লিখবার তখনও সময় হয়নি, তবুও মিসেস বারটন টেফর্ডের কাছে এডওয়ার্ড ড্রিফিলডের ভবিষ্যত রইল অকম্পিত। যে বইখানা একদিন এমন একটা গোলমাল সৃষ্টি করেছিল আজকে সেইটা পড়তে গিয়ে খুবই আশ্চর্য লাগে এমন একটা শব্দ নেই যাসপ্রতিভকেও যা রাঙিয়ে তুলবে, এমন কোনো ঘটনা নেই যাতে আধুনিক পাঠকের চুল উত্তেজনায় খাড়া হয়ে উঠবে।

উনিশ

প্রায় ছ'মাস পরের কথা, দি কাপ অব লাইফ' উপন্যাস নিয়ে উত্তেজনা ততদিনে প্রশমিত হয়ে গিয়েছিল এবং ড্রিফিলড তাঁর পরবর্তী উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিলেন, যেটা 'বাই দেয়ার ফ্রুটস নামে প্রকাশিত হয়েছিল। আমি তখন মেডিকেল কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেনীর ছাত্র এবং ইনডোরে ড্রেসারের কাজ করতাম। একদিন ডিউটি করতে করতে যে সার্জনের সহকারীরূপে ওয়ার্ড রাউণ্ডে বেরুবার কথা তাঁর খোঁজে হাসপাতালের মেন-হলে গিয়েছিলাম। চিঠি রাখবার তাকের উপর একবার তাকিয়ে দেখলাম, কারণ অনেক সময় ভিনসেন্ট স্কোয়ারে আমার ঠিকানা না জেনে অনেকেই হাসপাতালের ঠিকানায় চিঠি লিখত। আমার একখানা

টেলিগ্রাম আছে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। টেলিগ্রামে লেখা ছিল,
আজকে বিকেল পাঁচটার অবশ্যি অবশ্যি আমার সঙ্গে দেখা করবে। জরুরী।
ইসাবেল টেফর্ড।

আমি ভাবতে লাগলাম কী তাঁর এমন প্রয়োজন। গত দুই বছরের মধ্যে বোধহয় প্রায় দশ-বারো বার আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁর সঙ্গে, কিন্তু কোনোদিন আমার প্রতি তাঁর নজর পড়েনি। আমিও কোনোদিন তাঁর বাড়ি যাইনি। আমি জানতাম চায়ের আসরে অনেক সময় লোকের অভাব হয়ে পড়ে, শেষমুহূর্তে আর কাউকে হাতের কাছে না পেলে, এই গরিব মেডিকেল ছাত্রটির কথা মনে পড়ে যাওয়া কোনো গৃহকর্ত্রীর পক্ষে একটুও বিচিত্র ছিল না হয়তো। কিন্তু টেলিগ্রামের ভাষণ এ ধরণের কোনো পার্টির ইঙ্গিত ছিল না।

যে সার্জনের সঙ্গে আমি ড্রেসারের কাজ করতাম তিনি অত্যন্ত বেশী কথা বলতেন এবং একেবারে গদাময় ছিলেন। পাঁচটা না বাজা পর্যন্ত আমি ছুটি পেলাম না এবং তারপর চেলসাতে পৌঁছতেও প্রায় গোটা কুড়ি মিনিট লাগল। মিসেস বারটন টেফর্ড বাঁধের ধারে একটা ফ্লাটে থাকতেন। যখন তাঁর দরজায় গিয়ে বেল টিপলাম প্রায় ছটা বেজে গিয়েছিল। তিনি বাড়ি আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু আমাকে যখন তাঁর ড্রয়িংরুমে নিয়ে যাওয়া হলো এবং কেন আমার দেরি হলো বলতে চাইলাম তিনি আমাকে থামিয়ে দিলেন।

—আমরা ধরে নিয়েছিলাম নিশ্চয় তুমি যাওনি। সে যাক গে। তাঁর স্বামীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

—আমার মনে হয়, আগে ওর এক কাপ চায়ের প্রয়োজন। তিনি বললেন।

—না, না, চা নয়, চায়ের অনেক দেরি হয়ে গেছে। তিনি শান্তভাবে তাকালেন, আমার দিকে। তাঁর নরম সুন্দর চোখের দৃষ্টিতে করুণার রসধারা উপচে পড়ছিল—তোমার চা চাই না বোধ হয়, তাই না?

আমি যেমনি ক্ষুধার্ত তেমনি তৃষ্ণার্তও ছিলাম। কারণ লাঞ্চের সময় শুধু এক টুকরো রুটি, একটু মাখন আর এক পেয়ালা কফি খেয়েছিলাম। কিন্তু কথাটা আমার বলতে ইচ্ছে হলো না। আমি চা খেতে অসম্মতি জানালাম।

—তুমি অসগুড নিউটনকে চেন? মিসেস বারটন টেফর্ড বললেন, একজন ভদ্রলোকের দিকে ইশারা করে। আমি ঘরের ভেতর ঢুকেই দেখেছিলাম একটা আর্ম চেয়ারে বসেছিলেন ভদ্রলোকটি। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

—আমার মনে হয় এডওয়ার্ডের বাড়িতে তুমি দেখে থাকবে এঁকে।

আমি দেখেছিলাম। তিনি খুব বেশি আসতেন না, কিন্তু তাঁর নাম

আমার পরিচিত ছিল, মনেও ছিল। এই ভদ্রলোককে দেখলেই আমি কেমন নার্ভাস হয়ে পড়তাম। যতদূর মনে পড়ে তাঁর সঙ্গে কোনোদিন আমি কথা বলিনি। এতদিনে বিস্মৃত হয়ে গেলেও সে যুগের ইংলণ্ডের একজন সুপরিচিত সমালোচক বলেই তাঁর খ্যাতি ছিল। বেশ মোটা, বড়সড়ো সৌখিন মানুষ। বেশ ভরা ভরা তাঁর মুখ, ফিকে নীল চোখ, এবং একটু পাক ধরা সুন্দর চুলও ছিল তাঁর মাথায়। তিনি প্রায় সবসময় ফিকে নীল রঙের টাই বাঁধতেন, চোখের রঙটাকে আরো স্পষ্ট করে তুলবার জন্য। ড্রিফিলডের বাড়িতে যেসব লেখকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হতো তাদের সঙ্গে অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহার করতেন। সবাইকে বেশ মিষ্টি মিষ্টি তোষামুদি কথা বলতেন, কিন্তু যখন সবাই চলে যেত এদের নিয়েই আবার ভীষণ ঠাট্টা তামাশা করতেন। নিচু সুরে বেশ স্পষ্ট করে ভালো শব্দ প্রয়োগ করে কথা বলতেন। কোনো বন্ধুর সম্বন্ধে মুখরোচক গল্প বলতে তাঁর কোনো জুটি মিলত না।

আলগুড নিউটন আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন, এবং মিসেস বারটন ট্রেফর্ড তাঁর স্বাভাবিক সরলতা নিয়ে আমার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজেই হাত ধরে আমাকে তাঁর পাশের সোফাটায় বসিয়ে দিলেন। তখনো টেবিলে চা দেওয়া ছিল, এক টুকরো জ্যাম স্যানডুইচ তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে মুখে দিলেন।

—এর মধ্যে ড্রিফিলডদের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে? তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন।

—গত শনিবার আমি সেখানে গিয়েছিলাম।

—এরপর তাদের কারও সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়নি?

—না।

মিসেস বারটন ট্রেফর্ড অলগুড নিউটনের দিক থেকে একবার স্বামীর দিকে আবার নিউটনের দিকে তাকালেন। যেন তাদের কাছে সমর্থন পাবার জন্য মৌন প্রার্থনা ছিল দৃষ্টিতে।

—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে কোনো লাভ নেই, ইসাবেল নিউটন বললেন, একটা অস্পষ্ট শ্লেষ তাঁর চোখে ফুটে উঠল।

মিসেন বারটন ট্রেফর্ড আমার দিকে ফিরে তাকালেন।

—তাহলে এ খবর তুমি জান না যে, মিসেস ড্রিফিলড তার স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে গেছে?

—কী বলছেন?

আমি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম। নিজের কানকেও আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

—ঘটনাটা খুলে বললে বোধ হয় ভালো হয়, অলগুড। মিসেস টেফর্ড বললেন।

সমালোচক তাঁর চেয়ারে একটু হেলান দিয়ে বসলেন এবং এক হাতের আঙুলের ডগা অন্য হাতের আঙুলের ডগার উপর স্থাপন করলেন। একটু আবেগ দিয়ে তিনি বলতে শুরু করলেন।

—তাঁর সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটা লিখছি সেই বিষয়ে ডিফিলডের সঙ্গে গতকাল রাত্রে আমার দেখা করবার কথা ছিল। রাত্তিরটা ভারি সুন্দর ছিল। তাই ডিনারের পর ভাবলাম হেঁটে হেঁটে গেলে মন্দ হবে না। তিনিও আমার প্রতীক্ষা করছিলেন। তাছাড়া আমি জানতাম, রাত্তিরে কখনো তিনি বাইরে বেরুতেন না, লর্ড মেয়রের ভোজসভা অথবা আকাদমির ডিনার জাতীয় কোনো বিশেষ উৎসব ছাড়া। একবার কল্পনা করে দেখুন আমি কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। না, শুধু তাই কেন, আমার সব বুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছিল, যখন ওঁদের বাড়ির দোর-গোড়ায় পৌঁছেই দেখলাম সদর দরজা খোলা এবং এডওয়ার্ড নিজেই ছুটে বেরিয়ে এলেন। আপনারা নিশ্চয় জানেন ইমানুয়েল কান্টের একটা অদ্ভুত অভ্যাস ছিল, তিনি ঠিক একই সময় প্রতিদিন বেড়াতে বেরোতেন। তাঁর এই সময়ানুবর্তিতা এত প্রখর ছিল যে কনিসবুর্গের লোকদের এই দেখেই ঘড়ি মিলিয়ে নেওয়া একটা রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাই একদিন তাঁকে প্রায় একঘণ্টা আগে বেরোতে দেখে সবার মুখ-চোখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। কারণ তারা নিশ্চিত জানত, কোনো ভীষণ ঘটনার এটা একটা ইঙ্গিত মাত্র। তাদের ধারণা ঠিক ছিল। ইমানুয়েল কান্ট বেস্টিল পতনের সংবাদ সেই মুহূর্তে পেয়েছিলেন।

বর্ণিত ঘটনার প্রভাব যাচাই করবার জন্য অলগুড নিউটন একটু থামলেন। মিসেস বারটন টেফর্ড অনুজ্ঞাসূচক হাসি হাসলেন তাঁর দিকে তাকিয়ে।

—যখন এডওয়ার্ডকে আমার দিকে এক রকম ছুটে আসতে দেখলাম, তখন এতো বড়ো একটা বিধ্বংসী ভূমিকম্পের কথা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। তবে একটু পরেই আমি বুঝতে পারলাম, একটা দুর্ঘটনা কিছু ঘটে গিয়েছে। তাঁর হাতে ছড়ি বা দস্তানা কোনটাই ছিল না দেখলাম। কাজ করবার কোটটা তখনো তাঁর গায়ে। কালো আলপাকার তৈরী আভিজাত্যের ছোপ দেওয়া পোশাক, এবং মাথায় একটা বড়ো টুপিও ছিল। কেমন উদভ্রান্ত ভাব ফুটে উঠেছিল তাঁর চোখে-মুখে। কেমন একটা বিত্রস্তভাব। বিবাহিত জীবনের বাদবিসম্বাদের কথা স্মরণ করে নিজেকেই আমি প্রশ্ন করলাম, তবে কী স্ত্রীর সঙ্গে মতান্তরের ফলেই এমনি একটা উত্তেজনার ভাব নিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন বাড়ির বাইরে, নাকি ছুটে আসছিলেন চিঠির বাক্সে একটা

চিঠি ফেলবার জন্য ! ধাবমান গ্রীক বীর হেকটরের মতোই বুঝি তিনি ছুটে আসছিলেন। আমাকে দেখতে পেলেন বলে যেন মনে হলো না। এবং একটা সন্দেহ আমার মনের ভেতর ঝলক দিয়ে গেল—হয়তো তিনি আমাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। আমি তাঁকে থামিয়ে দিলাম। ডাকলাম, এডওয়ার্ড ! চমকে উঠে তিনি তাকালেন আমার দিকে। আমি নিশ্চিত, সেই মুহূর্তটিতে তিনি চিনতে পারেন নি আমাকে। এরকম পাগলের মতো কোথায় যাচ্ছ ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম। 'ও, তুমি !' তিনি বললেন। কোথায় যাচ্ছ তুমি ?' আমি আবার প্রশ্ন করলাম। 'কোথাও না' তিনি উত্তর দিলেন। বুঝলাম এমনিভাবে বলতে থাকলে ড্লগুড নিউটনের গল্প কোনোদিন শেষ হবে না। আর মিসেস হাডসনও ডিনার নিয়ে বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে উঠবেন।

—আমার আসবার উদ্দেশ্য বললাম তাঁকে, এবং ঘরে গিয়ে যে সমস্যা আমাকে অস্থির করে তুলছিল, সেই বিষয়ে আলোচনা শুরু করবার প্রস্তাব দিলাম। আমার মনটা এখন এত চঞ্চল যে আমি বাড়ি ফিরতে পারব না এখন। তিনি বললেন, চলুন একটু হাঁটা যাক তাহলে। তাই চল, চলতে চলতে তোমার কথা আমাকে বলতে পারবে। কথাটা মেনে নিয়ে আমি ফিরলাম এবং দুজনে হাঁটতে লাগলাম ; কিন্তু তাঁর চলন এত দ্রুত হয়ে উঠেছিল যে গতি আরও একটু সংযত করতে বললাম। ফ্লিট স্ট্রীট ধরে এক্সপ্রেস ট্রেনের মতো দ্রুত গতিতে চলতে চলতে আলোচনা চালিয়ে যেতে ডাঃ জনসনও বোধহয় পারতেন না। এডওয়ার্ডের চেহারা এমন অদ্ভুতরূপ ধারণ করেছিল এবং ব্যবহারে এত উত্তেজনা প্রকাশ হয়ে পড়ছিল যে জনবিরল পথ ধরে তাঁকে নিয়ে যাওয়াই আমি সমীচীন মনে করলাম। আমার প্রবন্ধটার প্রসঙ্গ আমি বললাম তাঁকে। যে বিষয়টা আমার মস্তিষ্কে শিকড় গেড়ে বসেছিল সেটার পরিধি যে এত বড়ো প্রথম দৃষ্টিতে তা বুঝতে পারিনি এবং আমার মনে সন্দেহ ছিল যে একটা সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকার কলামের গণ্ডির ভেতর এনে এমনি বিষয়বস্তুর উপর সুবিচার করা হবে কিনা। আমি বিষয়টাকে পুরোপুরি এবং স্পষ্টভাবে তাঁর সম্মুখে তুলে ধরে তাঁর মন্তব্য আহ্বান করলাম। রোজি আমাকে ছেড়ে গেছে। তিনি জবাব দিলেন। একটা মুহূর্তমাত্র ! আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না তিনি কী বলছিলেন, কিন্তু আচমকা হঠাৎ কথাটা আমার মনের পর্দায় ঝিলিক দিয়ে গেল। সেই তন্বী মহিলাটির কথা বলছিলেন, যার হাতের চা আমি খেয়েছি বার কয়েক ! তাঁর কথার সুর থেকে আমি বুঝতে পারলাম আমার কাছে শোক-প্রকাশ করা তিনি প্রত্যাশা করছেন, কোনোরকম

অভিনন্দন নয়।

অলগুড নিউটন আবার থামল এবং তার নীল চোখ দুটি পিট পিট করতে লাগল।

—তুমি সত্যি অপূর্ব, অলগুড। মিসেস বারটন টেফ্রর্ড বললেন।

—শুধু তাই নয়, অমূল্য। তাঁর স্বামী যোগ করলেন।

—সহানুভূতি দেখানোর প্রয়োজন বুঝতে পেরে আমি বললাম, প্রিয় বন্ধু। তিনি আমাকে বাধা দিলেন—গত মেলে একখানা চিঠি পেয়েছি তিনি বললেন। সে লর্ড জর্জ কেম্পের সঙ্গে চলে গেছে।

আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। কোনো কথা বলতে পারলাম না। মিসেস টেফ্রর্ড একটা চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন আমার দিকে।

—লর্ড জর্জ লোকটি কে? আমি জানতে চাইলাম। ব্রেকস্টেবলের লোক তিনি উত্তর দিলেন। চিন্তা করবার মতো অবসর আমার ছিল না। খোলাখুলি ভাবে কথা বলতে আমি সিদ্ধান্ত করলাম। তুমি সত্যি রেহাই পেলে ওর হাত থেকে। আমি বললাম—'অলগুড্'। চীৎকার করে উঠলেন! আমি থামলাম এবং তাঁর বাহুতে আমার হাত রাখলাম। তোমার অবশ্যি অবশ্যি জানা দরকার যে তোমারই বন্ধুদের নিয়ে সে এতকাল প্রতারণা করছিল তোমার সঙ্গে! তুমি জানতে না, তার চাল-চলতি একটা কেলে-ঙ্কারী বেচ্ছায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তাই বলছি, প্রিয় বন্ধু, সত্যকে সত্য বলে মেনে নাও ভাই। একজন স্বৈরিনী ছাড়া আর কিছু নয় তোমার স্ত্রী। হাঁচকা মেরে তিনি হাত সরিয়ে নিলেন আমার কাছ থেকে। গর্জন করে উঠলেন কিছুটা নিচু গলায়। যেমন করে উঠে বোর্নিওর জঙ্গলে ওরাং ওটাং জোর করে নারকেল কেড়ে নিলে পর। এবং তাঁকে ধরবার আগেই তিনি ছুটে পালিয়ে গেলেন আমার কাছ থেকে। আমার এমনি চমক লেগে গিয়েছিল যে তাঁর কান্না আর দ্রুত পদক্ষেপের ধ্বনি কান দিয়ে শোনা ছাড়া কিছুই আমি করতে পারলাম না।

—তাঁকে ছেড়ে দেওয়া তোমার মোটেই উচিত হয়নি। মিসেস বারটন টেফ্রর্ড বললেন—যে অবস্থায় তিনি ছিলেন টেমসের জলে ঝাঁপ দেওয়া তাঁর পক্ষে বিচিত্র ছিল না।

—আমারও তাই মনে হয়েছিল, কিন্তু আমি লক্ষ্য করছিলাম নদীর দিকে তিনি যাননি। যে পল্লীর ভেতর দিয়ে আমরা পথ চলছিলাম তারই একটা ছোটো অখ্যাত গলির ভেতর তিনি ঢুকে পড়েছিলেন। তারপর এও আমি ভাবলাম নিজের হাতে অসমাপ্ত লেখা রেখে কোনো সাহিত্যিক আত্মহত্যা করেছে এমন কোনো নজির নেই সাহিত্যের ইতিহাসে। জীবনে যত অশান্তি আর

দুর্বিপাক থাকুক না, কোনো অসমাপ্ত সৃষ্টি রেখে যেতে চায় না কোনো সাহিত্যিক।

যা শুনলাম তাতে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আঘাত পেয়েছিলাম। মর্মাহতও হয়েছিলাম ; কিন্তু একটুখানি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিলাম, কেননা আমি বুঝতে পারছিলাম না কেন মিসেস ট্রেফর্ড ডাকিয়েছিলেন আমাকে। তিনি আমাকে এতটা ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন না। যাতে এই ঘটনার বিষয়ে আমার বিশেষ কোনো আগ্রহ থাকতে পারে বলে তিনি ধারণা করতে পারেন ; এমন কি বিশেষ খবর হিসাবে আমাকে জানবার জন্য ত'ার এতটা শ্রম স্বীকার করবার কোনো কারণ ছিল না।

—বেচারা এডওয়ার্ড! তিনি বললেন—কেউ অস্বীকার করতে পারবে না নিশ্চিত যে এটা তারপক্ষে সাপে বর হয়েছে। তবু আমার পক্ষে আশঙ্কা হয়, ব্যাপারটা ভীষণ ভাবে তার মনে লেগেছে। তবু ভালো, গোয়ার্তুমি কিছু করে বসেনি। তিনি ফিরে তাকালেন আমার দিকে! —মিঃ নিউটনের মুখে খবরটা শুনেই আমি লিমপাস রোডে ছুটে গিয়েছিলাম। এডওয়ার্ড বাড়ি ছিলেন না, কিন্তু বাড়ির ঝি বলেছিল একটু আগেই নাকি তিনি বেরিয়েছেন। তার অর্থ অলগুডের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার পর থেকে আজকে সকাল পর্যন্ত তিনি বাড়িতেই ছিলেন। তুমি হয়তো অবাক হয়ে ভাবছ কেন আমি ডাকিয়েছি তোমাকে!

আমি কোনো জবাব দিলাম না। ত'ার কথা শুনবার প্রতীক্ষায় রইলাম।

—ব্লেকস্টেবলেই ড্রিফিলডদের সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল, তাই না? তাহলে তুমি নিশ্চয়ই বলতে পারবে এই লর্ড জর্জ কেম্প লোকটি কে। এডওয়ার্ড বলেছিলেন সে নাকি ব্লেকস্টেবলের লোক।

—তিনি একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। স্ত্রী এবং দুইটি ছেলে বর্তমান। ছেলেরাও প্রায় আমার বয়সী।

—কিন্তু তার কী পরিচয়, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।

আমি প্রায় হেসে ফেললাম।

—না না, তিনি সত্যিকার লর্ড নন। তিসি একজন স্থানীয় কয়লার ব্যবসায়ী! খুব বাবুয়ানা করতেন বলে লোকে ত'াকে ব্লেকস্টেবলের লর্ড বলত। ও একটা তামাশা!

—এ ধরণের রসিকতা নীরস লোকের পক্ষে সত্যি বুঝে ওঠা খুব কঠিন। অলগুড নিউটন বলল।

আমাদের সবাইকে মিলে সাহায্য করতে হবে হতভাগ্য এডওয়ার্ডকে। মিসেস বারটন ট্রেফর্ড বললেন। ত'ার চিন্তান্বিত দৃষ্টি এসে নিবদ্ধ হলো আমার

মুখের উপর। —কেম্প যদি রোজি ড্রিফিলডকে নিয়ে পালিয়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে গেছে।
—আমার তাই মনে হয়। আমি বললাম।
—তুমি একটা উপকার করবে ?
—যদি সম্ভব হয়।
—একবার ব্লেকস্টেবলে গিয়ে দেখে আসবে ব্যাপারটা কী ঘটেছে ? আমার মনে হয় কেম্পের স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করা দরকার।
অপরের ব্যাপারে নাক গলানো আমি কোনোদিন পছন্দ করতাম না।
—আমার দ্বারা কতটুকু সম্ভব হবে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি জবাব দিলাম।
—কেন, তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না ?
—না, সে সম্ভব নয়।
আমার জবাব কাট-খোট্টা মনে করলেও মিসেস বারটন ট্রেফর্ড সেটা প্রকাশ করলেন না। তিনি একটু মুচকি হাসলেন শুধু।
—আপাততঃ ওটা না হলেও চলবে হয়তো। কিন্তু সেখানে গিয়ে কেম্পের বিষয় একটু খোঁজ নেওয়া অবশ্য জরুরী। এডওয়ার্ডের সঙ্গে আজকেই বিকেলে আমি দেখা করতে চেষ্টা করব। ওরকম একটা বিশ্রী বাড়িতে সে একা থাকবে এ আমি ভাবতেই পারি না। বারটন আর আমি ঠিক করে ফেলেছি এখানেই এনে রাখব তাকে। একখানা খালি ঘর আছে এ বাড়িতে সে ঘরটাই গুছিয়ে দেব তার কাজ করবার জন্য। তোমার কেমন মনে হয় আইডিয়াটা, ভালো হবে না ?
—খুব ভালো ব্যবস্থা।
—বরাবরের জন্য এখানে না থাকবারও কারণ কোনো দেখি না, তবে কয়েক সপ্তাহের জন্য তো বটেই, তারপর গ্রীষ্মের সময় সেও যেতে পারবে আমাদের সঙ্গে। আমরা এবার ব্রিটানি যাব মনে করছি। নিশ্চয় তার ওখানে ভালো লাগবে। বেশ একটু হাওয়া বদল হবে।
—আপাততঃ প্রশ্ন হচ্ছে, স্ত্রীর মতোই একটুখানি সদয় দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করে মিঃ বারটন ট্রেফর্ড বললেন,—এই ছোকরা ব্লেকস্টেবলে যাবে কিনা এবং গিয়ে দেখবে কিনা কী সে করতে পারে। আসল ব্যাপার আমাদের জানা দরকার, এটাই মোদ্দা কথা।
এমনি হালকা ধরণে কথা বলতে গিয়ে তাঁর পুরাতাত্ত্বিকের গাম্ভীর্যকেও বারটন ট্রেফর্ড একটুখানি ক্ষুণ্ণ করতে পিছপা হলেন না।
—অমত করবেনা নিশ্চয়। একটু নরম এবং অনুনয়ের দৃষ্টিতে আমার

দিকে তাকিয়ে তাঁর স্ত্রী বললেন—কী, অমত করবে না তো? বিষয়টা অত্যন্ত জরুরী, আর এ ব্যাপারে তুমিই কেবল আমাদের সাহায্য করতে পারবে। অবশ্য তিনি জানতেন না যে এ ব্যাপারের হদিস করবার জন্য আমি নিজেও মনে মনে কতটুকু উতলা হয়ে উঠেছিলাম; তিনি জানতেন না ঈর্ষার কী তীব্র জ্বালা আমার বুকের ভেতরটা পুড়িয়ে মারছিল—শনিবারের আগে বোধহয় আমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাব না, আমি বললাম।

—তাতেই হবে। অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে। এডওয়ার্ডের সব বন্ধুরা কৃতজ্ঞ থাকবে তোমার কাছে। তুমি ফিরবে কবে?

—সোমবার সকালেই আমাকে লণ্ডন ফিরতে হবে।

—তাহলে সেদিন বিকেলে এসে চা খাবে আমাদের এখানে, এই কথা রইল। তোমার জন্য অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করব কিন্তু। ভগবানকে ধন্যবাদ, ব্যাপারটা মিটল এখানে। এইবার আমাকে এডওয়ার্ডকে খুঁজে বার করতে হবে।

আমি বুঝতে পারলাম আমার কাজ শেষ হয়েছে। অলগুড নিউটনও বিদায় নিয়ে নিচে নামাল আমার সঙ্গে।

—আরাগণের ক্যাথারণের মতো একটা আভিজাত্য আছে আমাদের এই ইসাবেলের। দরজাটা আমাদের পেছনে বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে আপন মনে বিড় বিড় করতে করতে কী যেন বলল নিউটন—এই একটা সুবর্ণ সুযোগ, এ সুযোগ বন্ধুবর হেলায় হারাবে না। এ বিশ্বাস রাখতে পারি আমরা। চমৎকার মহিলা, সোনার মতো তাঁর অন্তকরণ।

সেই সঙ্গে বিড় বিড় করে কী বলে কথাটা শেষ করল আমি ঠিক ধরতে পারলাম না। কারণ মিসেস বারটন ট্রেফর্ড সম্বন্ধে পাঠকদের আমি এ পর্যন্ত যা বলেছি তা আমি জেনেছি অনেক পরে, তবে এটুকু আমি বুঝতে পারলাম ঐ মহিলা সম্বন্ধে বিদ্রূপ কটাক্ষ করেই সে কথাগুলি বলছিল এবং হয়তো একটু তামাশা হলেও হতে পারে। কাজেই আমি একটু বিরক্তি প্রকাশ করলাম।

—আমার সুপ্রিয় বন্ধু ডিজি কোনো এক অশুভ মুহূর্তে যেটাকে লণ্ডনের গেণ্ডুলা বলে অভিহিত করেছিল সেইটার অপেক্ষাই বোধহয় করছেন আপনি, কী বলেন?

—আমি বাসে যাব। জবাব দিলাম।

—বটে? হ্যানসমে যাবেন বললে আমার বাড়ির মোড় পর্যন্ত দয়া করে পৌঁছে দিতে বলতাম আপনাকে, তবে আপনি যখন এই ঘরোয়া পরিবহনটি ব্যবহার করবেন মনস্থ করেছেন, যেটাকে আমার সেকেলে মন নিয়ে এখনও আমি 'অমনিবাস' বলেই আখ্যায়িত করব, তখন আমার এই বিরাট বপুটিকে

একটা চার-চাকা গাড়িতে চাপিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কি উপায় বলুন?
ইশারায় সে একটা গাড়ি ডাকল, এবং করমর্দন করবার জন্য তার দুখানা মোটা মোটা আঙুল বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।
—সোমবার দিন এসে শুনব আপনার মিশনের ফলাফল।

কুড়ি

কিন্তু এরপর আবার যখন অলগুড নিউটনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তখন বহু বছর কেটে গিয়েছিল, কারণ আমি ব্রেকস্টেবলে পৌঁছে দেখলাম মিসেস বারটন টেফোর্ডের লেখা একখানা চিঠি অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। তিনি আগে থেকেই আমার ঠিকানা সংগ্রহ করে রাখবার সাবধানতা নিয়েছিলেন। অনুরোধ জানিয়ে, কারণ সাক্ষাতে বিবৃত করবেন, যেন তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা না করে ভিকটোরিয়া স্টেশনে প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারে সন্ধ্যা ছয়টায় সাক্ষাৎ করি। কাজেই সোমবার দিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে আমি সেখানে গিয়ে হাজির হলাম এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর তিনি এলেন। আস্তে আস্তে পা ফেলে তিনি এগিয়ে এলেন আমার কাছে।
—কী, কোনো খবর আছে? এসো আগে একটু নিরিবিলি জায়গা খুঁজে নিয়ে বসি দুজনে।
খুঁজে পেলাম।
—তোমাকে এখানে কেন আসতে বলেছি সেইটুকু আগে খুলে বলি। তিনি বললেন—এডওয়ার্ড আমার বাড়িতেই আছেন। প্রথমে কিছুতেই আসতে চাননি, কিন্তু আমি তাঁকে সম্মত করিয়েছি। কিন্তু ভীষণ নার্ভাস, খুব অসুস্থ, অল্পেতেই রেগে উঠেন। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার বিপদের ঝুঁকিটুকু নিতে আমি ভরসা পেলাম না।
আমার কাহিনীর মোটামুটি বিষয়গুলো আমি বললাম মিসেস বারটন টেফোর্ডকে, এবং তিনিও খুব মন দিয়ে শুনলেন কথাগুলি। মাঝে মাঝে শুধু মাথা নাড়লেন। কিন্তু ব্রেকস্টেবলে যে উত্তেজনা আমি দেখে এসেছি তার গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করতে পারবেন সে প্রত্যাশা আমি করতে পারিনি। উত্তেজনায় সারা শহর আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। বহু বছর এই ধরনের উত্তেজনার কোনো কারণ ঘটেনি এই শহরে এবং এছাড়া আর কোনো কথা ছিল না লোকমুখে। হবুচন্দ্রের বিরাট পতন হলো এতদিনে। লর্ড জর্জ পলাতক হয়েছে। হপ্তা খানেক আগে থেকে সবার কাছে সে বলে বেড়িয়েছিল ব্যবসার ব্যাপারে সে লণ্ডন যাবে এবং দিন দুই পরে দেউলিয়া ঘোষণার আরজি পড়েছিল তার পক্ষে। দেখা গেল তার বাড়ি-তৈরির ব্যবসা

সফল হয়নি, ব্রেকস্টেবলকে সমুদ্রতীরবর্তী স্বাস্থ্য নিবাসে পরিণত করবার পরিকল্পনা কারও সহানুভূতি পায়নি বলে, এবং যেখান-সেখান থেকে অর্থ কর্জ করতে সে বাধ্য হয়েছিল। নানা রকম গুজব ছড়াতে লাগল সারা শহরময়। বহু সংখ্যক সাধারণ মানুষ, যারা তাদের স্বল্প পরিমাণ পুঁজি তার কাছে গচ্ছিত রেখেছিল তারাও সর্বস্বান্ত হবার মুখে এসে দাঁড়াল। এসবের খুঁটিনাটি বিষয় সব অস্পষ্ট রয়ে গেল আমার কাছে। কেননা, কাকা কাকীমা কিছুই বুঝতেন না ব্যবসার ব্যাপারে। তাছাড়া যাও বা তাঁরা বললেন তাও উপলব্ধি করবার মতো জ্ঞান আমার ছিল না। তবে জর্জ কেম্পের বাড়িটা বন্ধক ছিল এটা জেনেছিলাম এবং বাড়ির আসবাব-পত্র ইত্যাদি সবকিছু নিলামে উঠেছিল। স্ত্রীর জন্য একটি কপর্দকও সে রেখে যায় নি। তার ছেলে দুটিও, একটির বয়স কুড়ি আর অপরটির একুশ, কয়লার ব্যবসায় ছিল, সেটাও একই সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। হাতের কাছে যা ক্যাশ পেয়েছিল তাই নিয়ে জর্জ কেম্প সরে পড়েছিল। সবাই বলছিল প্রায় পনরো হাজার পাউণ্ডের মতো হবে বোধহয়। কেমন করে তারা এ খবর সংগ্রহ করছিল সে খোঁজ আমি করিনি।

শুনেছিলাম তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাও নাকি বেরিয়েছিল। সবাই ধরে নিয়েছিল, সে অস্ট্রেলিয়া পালিয়েছে। কেউ বলছিল, হয়তো কানাডায়।

—সে ধরা পড়লে আমি খুশী হই, কাকা বলেছিলেন! আজীবন কারাদণ্ড হওয়া উচিত ঐ লোকটার।

সবার মনে তার বিরুদ্ধে একটা তীব্র ঘৃণা। কেউ তাকে ক্ষমা করতে পারল না। কারণ সে সারাটা জীবন হৈ-হুল্লড় করেই কাটিয়ে গেছে। সবাইকে বিদ্রূপ করেছে, মদ খাইয়েছে। উদ্যান পার্টিতে আপ্যায়িত করেছে, তকতকে গাড়ি চালিয়েছে সবার মুখের সামনে, তেরছা করে টুপি পরেছে সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ খবর শুনলাম চার্চ-ওয়ার্ডেনের মুখে। কাকাকে বলছিল রবিবার দিন রাত্রে উপাসনার পর। গত দুই বৎসর ধরে, প্রায় প্রতি সপ্তাহে নাকি হেভারসামে তার সঙ্গে দেখা হতো রোজি ড্রিফিলড-এর এবং তারা পাবলিক হাউসে রাত কাটাত। ঐ হোটেলওয়ালা কিছু অর্থ খাটিয়েছিল জর্জ কেম্পের ঐসব ভুয়ো-পরিকল্পনার কোনো একটিতে। যখন দেখল তার সব গিয়েছে তখনই সে ফাঁস করে দিল ঐসব কেচ্ছা। লর্ড জর্জ যদি কেবল অন্য লোককেই প্রতারণা করত তাহলেও হয়তো সে গোপন রাখত, কিন্তু যখন সে দেখল তাকেও বাদ দেয়নি যাকে সে বন্ধু বলে বিশ্বাস করেছিল, তখনই আর বাধা রইল না কিছু।

—আমার মনে হয় ওরা দুজনেই একসঙ্গে পালিয়েছে। কাকা বলেছিলেন।
—আশ্চর্য হবার কিছু নেই। চার্চ ওয়ার্ডেন জবাব দিয়েছিলেন।
রাত্রির খাবারের পর বাড়ির চাকরানী যখন টেবিল পরিষ্কার করছিল আমি রান্নাশালের দিকে গিয়েছিলাম মেরি আনের সঙ্গে কথা বলবার জন্য। সেও গির্জায় গিয়েছিল এবং গল্পটা শুনেছিল। আমার বিশ্বাস হয়না সেদিন জমায়েতের সবাই আদৌ মন দিয়ে কাকার দেওয়া উপদেশাবলী শুনেছিল কিনা ?
—ভিকার বলেছেন তারা দুজনেই নাকি একসঙ্গে গেছে। আমি যা জানতাম তার একটি বর্ণও প্রকাশ করলাম না।
—হ্যাঁ, তাই তো গেছে, মেরি আন বলল—সেই একমাত্র পুরুষ যার প্রতি রোজির সত্যিকারের একটা আকর্ষণ ছিল। শুধু তার একটা অঙ্গুলি সঙ্কেত, যার কাছেই থাকুক না কেন ছুটে আসতেই হবে রোজিকে।
আমি আমার চোখ নিচু করলাম। একটা তীব্র বেদনা আমি অনুভব করছিলাম এবং আমার রাগ হচ্ছিল রোজির উপর। আমি ভাবছিলাম সে অন্যায় ব্যবহার করেছে আমার সঙ্গে।
—আমার বিশ্বাস আমাদের আর কোনোদিন দেখা হবে না! কথাটা বলতে বুকের ভেতরটায় যেন একটা চিড় দিয়ে উঠছিল। —আমারও তাই বিশ্বাস। খুশীর সঙ্গে মেরি আন বলল।
যখন আমি মিসেস বারটন টেফোর্ডকে এই কাহিনীর যতটুকু জানা প্রয়োজন বললাম, তিনি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু তৃপ্তিতে না দুঃখে আমি ঠিক উপলব্ধি করতে পারলাম না।
—যাক, এইখানেই তাহলে রোজি পর্বের সমাপ্তি। তিনি বললেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। —এই সব লেখকরা কেন যে এরকম অবাঞ্ছিত বন্ধনে ধরা দেন ? সত্যি বড়ো দুঃখের বিষয়। তুমি যা করেছ সেজন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। সব জানা হলো। তবে আসল কথা এই, এডওয়ার্ডের কাজে এসব যাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটায় তাই দেখতে হবে।
তাঁর এই উক্তির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না। আসল কথা, এতে আমার কিঞ্চিত মাত্র সন্দেহ নেই যে মিসেস টেফোর্ড সম্বন্ধে কোনো চিন্তা তখন স্থান পায়নি আমার মনে। ভিকটোরিয়া স্টেশনের বাইরে নিয়ে গেলাম তাঁকে এবং একটা বাসে উঠিয়ে দিলাম, যেটা কিংস রোড ধরে চেলসার দিকে চলে গেল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে আমি ফিরে এলাম আমার আবাস স্থলে।

একুশ

তারপর ডিটফিলডের সঙ্গে আমার সকল যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। তাঁকে খুঁজে বার করবার মতো উৎসাহও আমার ছিল না। আমার পরীক্ষা নিয়েই আমি ব্যস্ত ছিলাম। তারপর যখন পাস করলাম, বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। খুব অস্পষ্ট মনে পড়ে, কাগজে দেখেছিলাম রোজিকে তিনি ডিভোর্স করেছিলেন। তার কথাও আর শোনা যায়নি। দশবিশ পাউণ্ড মাঝে মাঝে তার মায়ের নামে আসত, তাও আসত রেজেস্ট্রী করা খামের ভেতর, নিউইয়র্কের ছাপ মারা; কিন্তু কোনো ঠিকানা থাকত না, কোনো খবর দিত না। রোজির কাছ থেকে আসত বলেই ধরে নেওয়া হতো, কেননা মিসেস গ্যানকে টাকা পাঠাবার মতো আর তো কেউ ছিল না ভূভারতে। তারপর বয়স পূর্ণ করে রোজির মাও একদিন স্বর্গলাভ করল, হয়তো এই খবরও কোনো প্রকারে পৌঁছেছিল রোজির কাছে। কেননা এরপর টাকার খাম আসাও বন্ধ হয়ে গেল।

বাইশ

অলরয় কিয়ার এবং আমি, পূর্ব ব্যবস্থা মতো, শুক্রবার দিন ভিকটোরিয়া স্টেশনে মিলিত হলাম, ব্রেকস্টেবলে যাবার পাঁচটা দশ মিনিটের গাড়ি ধরবার জন্য। স্মোকিং-কমপার্টমেন্টের দুটি বিপরীত কোণে মুখোমুখি হয়ে আরাম করে বসেছিলাম দুজনে। স্ত্রী ছেড়ে যাবার পর ডিটফিলডের কী হলো তারই মোটামুটি ঘটনা আমি শুনলাম তার কাছে। ধীরে ধীরে মিসেস বারটন টেফ্রর্ডের সঙ্গেও রয়-এর বেশ একটা সম্প্রীতি গড়ে উঠেছিল। রয়কে আমি জানতাম, তারপর মিসেস বারটন টেফ্রর্ডের কথা যখন মনে পড়ল তখন আমি বুঝতে পারলাম এ যোগাযোগ অবশ্যম্ভাবি ছিল। আমি শুনে একটুও আশ্চর্য হলাম না যে, মিসেস এবং মিঃ বারটন টেফ্রর্ড-এর সহযাত্রী হয়ে, তাঁদেরই ওয়াগনার প্রীতি, এবং পোস্টইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকর ও বারোক স্থাপত্য শিল্পের প্রতি আকর্ষণের সমভাগী হয়ে সারা কনিনেণ্ট রয় ঘুরে এসেছিল। চেলসার ফ্লাটে গিয়ে অনবরত লাঞ্চ খাওয়া তার অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং তারপর বার্দ্ধক্য এবং স্বাস্থ্যহীনতার জন্য যেদিন মিসেস টেফ্রর্ড তাঁর ড্রয়িং রুমের গণ্ডির ভেতর আটকা পড়ে গিয়েছিলন তখন নিজের সময়ের প্রয়োজনীয়তা সত্বেও, সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন তাঁর পাশে গিয়ে বসতে রয় ভুল করত না। তার অন্তরটা ছিল বড়ো সুন্দর। মিসেস বারটন টেফ্রর্ডের মৃত্যুর পর তাই সে বেশ বড়ো রকম একটা প্রবন্ধ

লিখেছিল তাঁর সমন্ধে। মনের যথেষ্ট আবেগ মিশিয়ে তাঁর চরিত্রের অশেষ গুণাবলী প্রশংসা করতে কার্পণ্য করেনি সে।

তার অন্তরের এমনি সহৃদয়তা যে একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে পুরস্কৃত হয়েছিল একথা ভাবতেও আমি খুশী হলাম। কারণ মিসেস বারটন টেফের্ড এডওয়ার্ড ড্রিফিলড সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছিলেন রয়কে, যেসব কথা আজকে তার এই গুরু দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কাজে না এসে পারেনি। মিসেস বারটন টেফের্ড, একটুখানি মৃদু বলপ্রয়োগ করে হলেও, এডওয়ার্ড ড্রিফিলডকে, যখন স্ত্রীর পলায়নের পর তাঁর এমনি অবস্থা হয়েছিল, শুধু নিজের বাড়িতেই নিয়ে আসেননি, প্রায় বৎসরাধিক কাল তাঁর বাড়িতে থাকতে বাধ্য করে ছিলেন। প্রীতির আঁচলে তিনি তাঁকে ঢেকে রেখেছিলেন। অন্তরের অশেষ করুণা, নারীর সহজাত বিচার শক্তি, কোনোটারই তিনি অভাব রাখেননি। তাঁর এই ফ্ল্যাটে বসেই ড্রিফিলড 'বাই দেয়ার ফ্রুটস' বইখানা শেষ করেছিলেন। এই বইখানাকে যে মিসেস ট্রেফর্ড তাঁর নিজের বই বলে মনে করতেন এর পেছনে যৌক্তিকতা ছিল সন্দেহ নেই, এবং বইখানা তাঁকে উৎসর্গ করা থেকেই প্রমাণ হয় ড্রিফিলড তাঁর ঋণ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি ড্রিফিলডকে ইতালি নিয়ে গিয়েছিলেন (অবশ্য বারটনও সঙ্গে ছিলেন। কারণ মিসেস টেফের্ড জানতেন সাধারণ মানুষ কত হিংসুটে, চাই কি একটা কলঙ্কের ছাপ হয়তো বসিয়ে দিত নইলে) এবং রাসকিনের একখানা বই তাঁর হাতে দিয়ে ঐ দেশের অবিনশ্বর সৌন্দর্যের ভাণ্ডার ড্রিফিলডের সমুখে খুলে ধরে ছিলেন। তারপর 'টেম্পলে' তার থাকবার ব্যবস্থা, লাঞ্চের ব্যবস্থা, সবই করে দিয়েছিলেন। গৃহকর্ত্রীর দায়িত্বের ভার নিজের হাতেই নিয়েছিলেন, সেখানে তাঁর ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তা আর প্রতিষ্ঠা কত বিভিন্ন লোককে আকর্ষণ করত।

এটা স্বীকার করতেই হবে ড্রিফিলডের ক্রমবর্দ্ধমান যশ লাভের পেছনে ছিলেন মিসেস বারটন টেফের্ড। তাঁর জীবনের সত্যিকার প্রতিপত্তি এবং প্রতিষ্ঠা এসেছিল জীবনের সায়াহ্নে এসে, যখন সত্যি তিনি লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল নিঃসন্দেহ ভাবে মিসেস বারটন টেফের্ডের অক্লান্ত চেষ্টায়। কোয়াটারলিতে প্রকাশিত যে প্রবন্ধটিতে সর্বপ্রথম তাঁকে শ্রেষ্ঠ লেখকদের একজন বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল সেই প্রবন্ধটি লিখবার জন্য বারটনকে মিসেস টেফের্ড কেবল অনুপ্রাণিত করেননি, যখন যে বই প্রকাশিত হতো তারও সম্বর্দ্ধনার তিনি ব্যবস্থা করতেন। তিনি এখানে যেতেন, ওখানে যেতেন, সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তার চেয়েও বেশি, তিনি বিখ্যাত কাগজের মালিকদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতেন!

তিনি নানা প্রকার জমায়েতের ব্যবস্থা করতেন যেখানে অনেকে আসত যাদের দিয়ে তাঁর উদ্দেশ্য সাধিত হতো। বড়ো বড়ো লোকদের বাড়িতে পাঠে যোগ দেবার জন্য তিনি ড্রিফিলডকে বাধ্য করতেন ; চিত্র পত্রিকায় যাতে ড্রিফিলডের ছবি ছাপত সে দিকেও তাঁর নজর থাকত, যেসব ইনটারভিউতে ড্রিফিলকে উপস্থিত থাকতে হতো সেগুলো মুসাবিদাও তিনি করে দিতেন। দশটি বছর ধরে তিনি অক্লান্তভাবে তাঁর প্রেস এজেন্টের কাজ করেছিলেন।

মিসেস বারটন ট্রেফর্ডের তখন সুদিন, কিন্তু তাহলেও নিজেকে তিমি হারিয়েও ফেলেননি। তাঁকে বাদ দিয়ে এডওয়ার্ড ড্রিফিলডকে নিমন্ত্রণ করা অর্থহীন হতো। ড্রিফিলড ঐসব নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতেন। এবং যখনই কোথাও মিসেস ট্রেফর্ড মিঃ ট্রেফর্ড এবং ড্রিফিলড ডিনারে নিমন্ত্রণ হতেন তখন তিন জনই একসঙ্গে যেতেন আবার একই সঙ্গে ফিরে আসতেন। মিসেস ট্রেফর্ড কখনো ড্রিফিলডকে তার দৃষ্টির আড়ালে যেতে দিতেন না। গৃহকর্ত্রীদের হয়তো আপত্তি হতো ; কিন্তু উপায় ছিল না। হয় এ সর্ত মানতে হতো, নয়তো নিমন্ত্রণই বাদ দিতে হতো। কিন্তু সাধারণত সবাই এটা মেনে নিত। মিসেস বারটন ট্রেফর্ড যদি কখনো বিরক্ত হতেন সেটা ড্রিফিলডের আচরণের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেত। কারণ যদিও মিসেস ট্রেফর্ড বাইরে খুশি ভাবটা বজায় রাখতেন, এডওয়ার্ড ড্রিফিলড বিশ্রীরকম অস্বাভাবিক রুক্ষ হয়ে উঠতো। কিন্তু ড্রিফিলডের মেজাজ কেমন করে ঠিক রাখতে হতো মিসেস ট্রেফর্ডের তা ভালোভাবে জানা ছিল, এবং বিশিষ্ট লোক-সমাগমের ভেতর তাঁকে মনমতো করে তুলতে পারতেন। ড্রিডিলডের সঙ্গে তিনি খাঁটি ব্যবহার করতেন। তিনি যে সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক তাঁর মনের এই দৃঢ় বিশ্বাসকে কখনো গোপন করতেন না ড্রিফিলডের কাছে। তিনি শুধু তাঁকে একমাত্র শ্রেষ্ঠ বলেই উল্লেখ কবতেন না, একটা খেলাচ্ছলে বা কখনো তোষামোদির ভাব নিয়ে হলেও সব সময় এমনিভাবেই তাঁকে ডাকতেন। শেষ সময় পর্যন্ত এই ভাবটাকে তিনি বজায় রেখেছিলেন।

তারপর হঠাৎ একটা ভীষণ ব্যাপার ঘটে গেল। ড্রিফিলডের নিউমোনিয়া হয়েছিল এবং তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কয়েকদিন জীবনের কোনো আশাই ছিল না। মিসেস বারটন ট্রেফর্ডের মতো মহিলার পক্ষে যা সম্ভব সবই তিনি করেছিলেন, এবং এমন কি নিজের হাতে সেবা-শুশ্রূষা করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু তখন তিনি ভীষণ দুর্বল, ষাটের কোঠা অতিক্রম করে গিয়েছিলেন ; কাজেই ভাড়াটে নার্সের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল

ডিফিলডের জন্য। অবশেষে যখন তিনি সব বিপদ কাটিয়ে উঠলেন ডাক্তারেরা তাঁকে বায়ু পরিবর্তনে যাবার উপদেশ দিলেন। তখনো তিনি খুবই দুর্বল। কাজেই একজন নার্স সঙ্গে নেবার পরামর্শ দিলেন। মিসেস ট্রেফর্ডের ইচ্ছা ছিল ডিফিলড বোর্নিমাউথে যান। যাতে প্রতি সপ্তাহ শেষে তিনি নিজে গিয়ে দেখে আসতে পারেন বা তদারক করতে পারেন, কিন্তু ডিফিলড নিজের কর্নওয়ালের দিকে যাবার ঝোঁক ছিল। ডাক্তাররাও পরামর্শ দিলেন যে পেনজানসের জলবায়ু ভালোই হবে তাঁর পক্ষে। কেউ হয়তো মনে করতো মিসেস বারটন ট্রেফর্ডের মতো তীক্ষ্ণ সহজাত বুদ্ধি-সম্পন্ন মহিলার পক্ষে অনাগত বিপদের আশঙ্কা করা হয়তো স্বাভাবিক হতো। কিন্তু তা হলো না। তিনি তাঁকে যেতে দিলেন। তিনি নার্সকে বুঝিয়ে দিলেন একটা ভীষণ গুরু দায়িত্বের বোঝা পড়েছে তার উপর। তিনি তার হাতে তুলে দিচ্ছেন ইংরেজী সাহিত্যের ভবিষ্যৎ না হলেও, সে যুগের একজন জীবিত প্রতিনিধির জীবন এবং মঙ্গল। এ দায়িত্ব অমূল্য দায়িত্ব।

তিন সপ্তাহ পর ডিফিলড চিঠি লিখলেন, জানালেন বিশেষ লাইসেন্সের বলে তিনি সেই নার্সকে বিয়ে করেছেন।

আমার বিশ্বাস তাঁর অন্তরের মহত্বকে প্রকাশ করবার প্রকৃষ্টতম সুযোগ মিসেস বারটন ট্রেফর্ড আর পান নি কোনোদিন, এই পরিস্থিতিকে মুখোমুখি করতে গিয়ে যতটুকু তিনি পেয়েছিলেন। তিনি কি বলে উঠেছিলেন, যুডাস যুডাস? তিনি কি তাঁর মাথার চুল ছিঁড়েছিলেন, মাটিতে আছড়ে পড়েছিলেন, না কি দারুণ উত্তেজনায় হাত পা ছুঁড়েছিলেন? তিনি কি নিরীহ পণ্ডিত মানুষ বারটনের উপর গালিবর্ষণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন? পুরুষের প্রতারণা আর নারীর ভ্রষ্টাচারিতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন না কি আহত মনকে শান্ত করতে গিয়ে গলা ফাটিয়ে কুৎসিত অশ্লীলতার ধারা বর্ষণ করেছিলেন? আদৌ কিছু নয়। তার বদলে একখানা সুন্দর চিঠি লিখলেন ডিফিলডকে অভিনন্দন জানিয়ে। নবপরিণীতা পত্নীকে লিখে জানালেন তিনি কত খুশী হয়েছেন, এতদিন তাঁর বন্ধু ছিল একজন আর আজ পেয়েছেন দুজন। লণ্ডন ফিরে এলে তাঁর বাড়িতেই উঠবার জন্য অনুরোধ করলেন দুজনকেই। সবাইকে তিনি বলে বেড়াতে লাগলেন তিনি খুশি হয়েছেন, অত্যন্ত খুশি হয়েছেন এই বিয়েতে। কারণ দুদিন বাদে ডিফিলড ও বৃদ্ধ হবেন, সেদিন তাঁর সেবার প্রয়োজন হবে; হাসপাতালের একজন নার্সের চেয়ে ভালো কে পারবে? নতুন মিসেস ডিফিলডকে সব সময় প্রশংসা জানিয়েছেন; সুন্দরী না হলেও

তার মুখখানা সুন্দর এই কথা সব সময় তিনি বলতেন। সম্ভ্রান্ত মহিলা নয় বটে, তবে ভালোই হয়েছে। একটু বেশি সৌখিন হলে হয়তো ডিফিলডের অসোয়াস্তি হতো। তিনি ঠিক তাঁর প্রয়োজন মতো স্ত্রী পেয়েছেন। আমার মনে হয় কথাটা বলা খুব অন্যায় হবে না যে, মিসেস বারটন টেফর্ড বুকের মধু বর্ষণ করতে গিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন এ ক্ষেত্রে। তবুও আমার মনে একটুখানি সন্দেহ উঁকি ঝুঁকি দেয় যে মধুর ভেতর এক ফোঁটা তিক্ততা যদি মেশে কখনো তবে এই বুঝি তার উদাহরণ।

তেইশ

যখন আমরা ব্লেকস্টেবলে এসে পৌঁছলাম, আমি এবং রয়, দেখলাম একখানা গাড়ি, খুব সৌখিনও নয় আবার মামুলীও নয়, অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। শোফারের হাতে একখানা চিঠি ছিল আমার নামে। আগামী কাল মিসেস ডিফিলডের বাড়িতে আমার লাঞ্চ খাবার নিমন্ত্রণ। একখানা ট্যাকসি নিয়ে আমি চলে গেলাম 'বিয়ার এণ্ড কী' তে। রয়ের মুখে শুনেছিলাম সমুদ্রের ধারে একটা নতুন মেরিণ হোটেল হয়েছে, কিন্তু আমার যৌবনের আবাসস্থলের বিনিময়ে বিলাসী সভ্যতার এই নব্য আগন্তুককে বরণ করতে আমার উৎসাহ হলো না। প্রথম পরিবর্তন স্টেশনে নেমেই আমার চোখে পড়ল, স্টেশনটা পুরণো জায়গায় ছিল না। একটু এগিয়ে আর একটা নতুন রাস্তার উপরে, তারপর এই হাই স্ট্রীট ধরে গাড়ি ছুটিয়ে যাওয়া, এও একটা অদ্ভুত আশ্চর্য লাগল। কিন্তু বদলায় নি 'বিয়ার এণ্ড কী'। সেই পুরণো দিনের নিস্পৃহতার ভাব নিয়েই সে আমাকে গ্রহণ করল; প্রবেশ পথে কাউকে দেখলাম না, ড্রাইভার আমার ব্যাগটা নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে ফিরে গেল। আমি ডাকলাম, কিন্তু কেউ সাড়া দিল না; বার-এর ভেতর গিয়ে ঢুকলাম, দেখলাম একটি তরুণী বসে আছে, মিঃ কম্পটন মেকেঞ্জির একখানা বই পড়ছে। ঘর আছে কিনা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। একটুখানি বিরক্তি মাখানো দৃষ্টিতে সে একবার তাকাল আমার দিকে। বলল আছে, কিন্তু তার আগ্রহ এইটুকুতেই নিঃশেষিত হয়ে যেতে দেখে আমি আবার অতি ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলাম ঘরখানা দেখিয়ে দিতে কোনো লোক আছে কি? সে উঠে দাঁড়াল, একটা দরজা খুলল, তারপর কর্কশ কণ্ঠে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল—

—কেটি?

—কেন? আমি জবাব শুনতে পেলাম।

—এক ভদ্রলোক ঘর চাইছেন।

একটু পরেই একজন অতি কুৎসিত দেখতে বৃদ্ধা মহিলা বেরিয়ে এল। পরনে ততোধিক কুৎসিত জামা, মাথা ভর্তি নোংরা পাকা চুল; দুই ধাপ সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে একখানা খুপরির মতো ছোট্ট ঘর আমাকে দেখিয়ে দিল।

—এর চেয়ে ভালো ঘর পাওয়া যায় না কি? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—ব্যবসায়ীরা এ ধরণের ঘরই নেয়। একটু নাক টেনে সে জবাব দিল।

—আর কোনো ঘর নেই?

—সিঙ্গল ঘর আর নেই।

—বেশ ডবল-ঘরই দাও আমাকে।

—মিসেস ব্রেণ্টফোর্ডকে বলছি গিয়ে—

দোতলায় নেমে এলাম বৃদ্ধার সঙ্গে, একটা দরজায় সে ধাক্কা দিল। জবাবে ভেতরে যেতে ডাকল তাকে, এবং যখন দরজা খুলল দেখলাম ভেতরে সারা মাথায় পাকা চুল এক মোটা মতন বৃদ্ধা মহিলা বসে আছে। মহিলা একখানা বই পড়ছিল। মনে হলো 'বিয়ার এণ্ড কী' তে সাহিত্যের দিকে বেশ ঝোঁক আছে সবার। একটু অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে সে তাকাল আমার দিকে যখন কেটি বলল সাত নম্বর ঘরটা আমি নিতে চাইছি না।

—পাঁচ নম্বরটা দেখিয়ে দাও গে যাও। বৃদ্ধা বলল।

আমি ধীরে ধীরে উপলব্ধি করলাম, মিসেস ড্রিফিল্ডের বাড়িতে উঠবার আমন্ত্রণকে গোয়ার্তুমি করে উপেক্ষা করে এবং নেহাত একটা আবেগের বশে 'মেরিণ হোটেলে' উঠবার জন্য রয়-এর প্রস্তাবকে আমল না দিয়ে সত্যি বেশ অবিবেচনার কাজ হয়েছে। কেটি আবার আমাকে উপরে নিয়ে গেল। হাই স্ট্রীটের দিকটায় বেশ একটা বড়ো-মতো ঘরে নিয়ে গেল। একটা ডবল-বেড জুড়ে ছিল সারাটা ঘরকে। জানালাগুলো বোধহয় খোলা হয়নি প্রায় মাসেক ধরে।

আমি বললাম এইতে আমার চলবে এবং ডিনারের কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

—আপনার কী চাই বলুন। কেটি বলল—এখন অবশ্য কিছু নেই, তবে কী চাই বললে এক্ষুণি ব্যবস্থা করে দিতে পারব।

ইংলণ্ডীয় সরাইখানার পরিচয় আমার জানা ছিল, কিছু মাছ ভাজা এবং গরম ল্যাম্ব চপ আনতে বললাম। তারপর একটু ঘুরে বেড়াবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। সমুদ্র-সৈকত ধরে হাঁটতে লাগলাম, দেখলাম একটা এসপ্ল্যানেড তৈরি হয়েছে, কয়েকসারি বাংলো-বাড়ি এবং গুটি কতক ভিলা উঠেছে সেখানে। মনে আছে এখানটায় খোলা মাঠে কেবল ঝড়ো হাওয়া বইত সব সময়। কাদা মাটিতে ভরা থাকত। দেখে আমার মনে হলো, ব্লেকস্টেবলকে

জনপ্রিয় সমুদ্রতীরবর্তী আবাসস্থলে পরিণত করবার লর্ড জর্জের স্বপ্ন সফল হয়নি এতদিনেও! একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, গুটি কয়েক বৃদ্ধা মহিলা হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল এবড়ো-খেবড়ো আসফালটের রাস্তার উপর দিয়ে। কেমন বিশ্রীরকম হতশ্রী লাগল সবকিছু। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল, সমুদ্রের দিক থেকে এসে ছোট্ট হালকা এক পসলা বৃষ্টি ভিজিয়ে দিয়ে গেল সব কিছু।

আবার শহরে ফিরে এলাম, 'বিয়ার এণ্ড কী' আর 'ডিউক অবকাণ্ট এর মাঝামাঝি খালি জায়গাটায় এই দুর্যোগের ভেতরও বেশ ভিড়। সবার চোখের দৃষ্টি একই রকম ফিকে নীল, তাদের খাড়া চোয়ালের হাড়ে তেমনি রুক্ষ রঙ, যেমন ছিল তার বাপ-পিতামহদের। দেখে অবাক লাগল নীল জার্সি পরা নাবিকদের কারো কারো কানে তখনো সোনার ছোট্ট রিঙ্ ঝুলছে; শুধু বৃদ্ধরাই নয়, ছোটো ছোটো ছেলের দলও আছে! রাস্তা ধরে ধীর পায়ে চলতে লাগলাম। ব্যাঙ্কটা সেই জায়গাতেই আছে। শুধু সামনাটা একটু বদলেছে, কিন্তু যে মনোহারী দোকান থেকে হঠাৎ চেনা এক অপরিচিত-অজ্ঞাত লেখকের কথায় আমি একদিন কাগজ আর মোম কিনেছিলাম সেটি তখনো আছে তেমনি, একটুও বদলায় নি। দু তিনটা সিনেমা হল হয়েছে এর মধ্যে, ওদের কুরুচিপূর্ণ প্রাচীর পত্রগুলো তকতকে রাস্তার আবহাওয়াকেও যেন ক্লেদাক্ত করে তুলেছিল। সুরাসক্ত প্রবীনা মহিলার মতো লাগছিল পরিবেশটাকে।

যে ঘরটায় দুজনের বসে খাবার উপযোগী টেবিলে বসে সেদিনকার আহার পর্ব সমাধা করলাম, বড়ো নিরাপদ এবং শীতল লাগল সেটাকে। কেউ এসে খাবার দিয়ে গিয়েছিল আমাকে। আগুনের ব্যবস্থা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম তাকে।

—জুন মাসে পাওয়া যায় না, সে বলল—এপ্রিল মাসের পর আর আগুনের ব্যবস্থা রাখা হয় না।

—আমি দাম দেব। বার-মেডকে বললাম।

—তবু, জুন মাসে দিই না। অক্টোবর মাসে এলে নিশ্চয় পাবেন।

আহার শেষ করে আমি বার-এ গিয়ে বসলাম এক গ্লাস পোর্ট পান করবার জন্য।

—বড্ড বেশি নিরিবিলি, আমি বললাম বার-মেডকে।

—হ্যাঁ, খুবই নিরিবিলি, সে জবাব দিল।

—শুক্রবার দিনটায় তোমাদের এখানে ভিড় হবে মনে করেছিলাম।

—খুব স্বাভাবিক।

তক্ষুনি পেছন দরজা দিয়ে ভেতরে এল একজন মোটা সোটা লাল-মুখো লোক, মাথার পাকা চুল ছোটো ছোটো করে ছাঁটা, আমি ধরে নিলাম এ-ই মালিক।

—আপনি কি মিঃ বেণ্টফোর্ড ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—হ্যাঁ, আমি।

—আপনার বাবাকে আমি চিনতাম। আসুন না এক গ্লাস পোর্ট পান করবেন আমার সঙ্গে।

আমার নাম বললাম, তার শৈশবকালে এই নামের চেয়ে বেশী পরিচিত আর কোনো নাম ছিল না ব্লেকস্টেবলে, কিন্তু দেখে একটু বেদনা অনুভব করলাম যে, তার স্মৃতিতে একটুও সাড়া জাগাল না এই নাম। তবে আমার সঙ্গে পোর্ট পান করতে সে রাজী হলো।

-কাজে এসেছেন বোধহয় ? সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল। প্রায়ই দু'এক জন ব্যবসায়ী এসে উঠেন আমার এখানে। ওদের জন্য যতটুকু করা সম্ভব কিছুই আমরা কসুর করি না।

তাকে বললাম মিসেস ডিফিলডের সঙ্গে দেখা করব বলে এখানে এসেছি ! কিন্তু কোন কাজে, ওকেই ভাবতে ছেড়ে দিলাম।

—বৃদ্ধের সঙ্গে প্রায়ই আমার দেখা হতো, মিঃ বেণ্টফোর্ড বললে। তিনি এখানে খুব আসতেন, দু'এক গ্লাস বিয়ার খেতে। কিন্তু কখনো বে-সামাল হতেন, এ বদনাম আমি দেব না। বার-এ এসে বসে গল্পগুজব করতে পছন্দ করতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত, কার সঙ্গে কথা বলতেন খেয়ালই করতেন না কখনো। তিনি এখানে আসেন মিসেস ডিফিলড এটা পছন্দ করতেন না। তিনি বাড়িতে না জানিয়ে আসতেন, কাউকে কিছু বলতেন না, চুপি চুপি হাঁটতে হাঁটতে চলে আসতেন। ঐ বয়সের লোকের পক্ষে হাঁটা পথটা একটু বেশী তো বটেই। অবশ্য তাঁকে খুঁজে না পেলে মিসেস ডিফিলড ঠিক জানতেন তিনি এখানে এসেছেন, টেলিফোন করে খোঁজ নিতেন। তারপর গাড়ি নিয়ে চলে আসতেন এবং সরাসরি আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে হাজির হতেন। "মিসেস বেণ্টফোর্ড, দয়া করে ওঁকে একটু ডেকে দিন না।" তিনি বলতেন। "আমি নিজে বার-এর ভেতর যেতে চাই না, অত সব লোকজন রয়েছে সেখানে। তাই মিসেস বেণ্টফোর্ড ভেতরে যেতেন এবং বলতেন, মিঃ ডিফিলড এইবার উঠুন, আপনার স্ত্রী এসেছেন, গাড়ি নিয়ে, বিয়ার শেষ করে এইবার চলুন বাড়ি যাবেন তাঁর সঙ্গে। মিঃ ডিফিলড মিসেস বেণ্টফোর্ডকে অনুরোধ করতেন মিসেস ডিফিলড টেলিফোন করলে তিনি এখানে আছেন যেন না বলেন, কিন্তু আমরা

অবশ্য তা করতাম না। তিনি বুড়ো হয়েছিলেন, কাজেই ওরকম ঝুঁকি আমরা নিতাম না। এই গ্রামেই ত'ার জন্ম, আপনি জানেন বোধ হয়। আর তাঁর প্রথমা স্ত্রীও এই ব্রেকস্টেবলের মেয়ে। তিনিও মারা গেছেন আজ বহুকাল হয়ে গেল। আমি তাঁকে দেখিনি। কিন্তু ঐ বুড়ো ছিলেন ভারি মজার লোক। জানেন, কেউ তার শত্রু ছিল না। সবাই বলে লণ্ডনেও নাকি বুড়োকে সকলে খুব পছন্দ করত, তারপর মারা যাবার পর নাকি সবগুলো খবরের কাগজ তাঁর কথায় ভরতি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা কেউ খবর রাখতাম না। আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষ বলেই সবাই আমরা তাঁকে মনে করতাম। তবে এটা ঠিক, তাঁকে আরাম দেবার জন্য চেষ্টা করতাম সবসময়। তাঁকে কোনো একটা আরাম কেদারায় বসতে দিতাম যখন এখানে আসতেন। কিন্তু কোনো মতেই তিনি বসতেন না। ঐ বার-এর সামনে স্টুলে বসতেন। তিনি বলতেন ঐ কাঠের রেলের উপর পা রাখতে নাকি তাঁর খুব ভালো লাগত। আমার বিশ্বাস তিনি এখানে এলেই খুশী হতেন, অন্য কোথাও যেতে চাইতেন না। সবসময় বলতেন বার-এর পারলার ত'ার ভালো লাগত। তিনি বলতেন বার-এ এলে জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়, আর ঐ জীবনকেই তিনি ভালোবাসতেন। বিচিত্র মানুষ ছিলেন তিনি। আমার বাবার কথা মনে করিয়ে দিতেন, কেবল এইটুকু তফাৎ ছিল, আমার জন্মদাতা-পালনকর্তার অক্ষর জ্ঞান ছিল না। প্রতিদিন এক বোতল ব্রাণ্ডি খেতেন। মরবার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল আটাত্তর বছর। তাঁর শেষ অসুখই ছিল প্রথম অসুখ। যেদিন তিনি মারা গেলেন সেদিন সত্যি আমি ড্রিফিলডের অভাব বোধ করেছিলাম। ঐ তো সেদিন, আমি বলছিলাম মিসেস বেন্টফোর্ডকে, ড্রিফিলডের এক-আধখানা বই নিশ্চয় পড়তে হবে। সবাই বলে এ অঞ্চলের কথা খুব নাকি তিনি লিখেছেন তাঁর বইগুলিতে।

চব্বিশ

পরদিন সকাল বেলা ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছিল। কিন্তু বৃষ্টি ছিল না। আমি হাই স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভিকারেজের দিকে গিয়েছিলাম। দোকানের নামগুলি সবই আমার পরিচিত লাগল। কেণ্ট অঞ্চলের নাম। এক শতাব্দী ধরে চলে আসছে—গ্যানস, কেম্পস, কবস, ইগালডেনস—কিন্তু আমার পরিচিত কাউকে দেখতে পেলাম না, যেখানে একদিন আমি প্রায় প্রতিটি লোককে চিনতাম, কথায় পরিচিত না হলেও অন্তত চেহারায়। সেই পথ ধরে চলতে চলতে কেমন যেন একটা প্রেতাত্মার মতো মনে হলো নিজেকে। হঠাৎ

একটা পুরণো ঝর-ঝরে গাড়ি আমাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। একটু খানি গিয়ে থামল, আবার পিছলো একটুখানি। দেখলাম সেই গাড়িতে একটি লোক আমার দিকে অত্যন্ত কুতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে! বেশ লম্বাটে চেহারার একজন বয়স্ক ভদ্রলোক গাড়ি থামিয়ে নেমে এলেন এবং আমার কাছে এগিয়ে এলেন।

—তুমি উইলি আসেনডেন না? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

তখন আমি চিনতে পারলাম। ডাক্তারের ছেলে। আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম। এক সঙ্গেই শ্রেণীর পর শ্রেণী আমর . . গেছি। আমি জানতাম সেও তার বাবার পেশা নিয়েছিল।

—তারপর, কেমন আছ তুমি? সে জিজ্ঞাসা করল। ভিকারেজের দিকে যাচ্ছিলাম, নাতিকে দেখবার জন্য। জান না বোধহয় সেখানে একটা প্রিপারেটরী স্কুল হয়েছে, এই বছর থেকে নাতিকে ঐ স্কুলে দিয়েছি।

অত্যন্ত নোংরা জামা-কাপড় ওর পরণে ছিল, তবু চেহারাটা বেশ ভালো লাগল, মনে হলো যৌবনে নিশ্চয় সে খুব সুপুরুষ ছিল। খুব মজা লাগল এই জন্যে যে এর আগে কিন্তু কোনোদিন আমি এরকম লক্ষ্য করিনি।

—তুমি তাহলে ঠাকুরদা হয়ে গেছ? আমি প্রশ্ন করলাম।

—একবার নয়, তিনবার। সে হাসল।

হঠাৎ কেমন যেন একটা ধাক্কা খেলাম। পৃথিবীতে এসে সে নিঃশ্বাস নিল একদিন, হাঁটতে শিখল, বয়স হলো, বিয়ে করল, সন্তানের জন্ম হলো, আবার তারাও তাদের সন্তান জন্ম দিল। তার চেহারা থেকে আমি সিদ্ধান্ত করলাম, সে জীবনে বেঁচে এসেছে অবিরাম সংগ্রাম করে, সীমাহীন দারিদ্রের মধ্যে। পল্লী গ্রামের ডাক্তারদের মতোই তার ভেতরেও কতকগুলো অদ্ভুত রকম চালচলন লক্ষ্য করলাম। তেমন চালিয়াত, দিল খোলা আবার তেমনি সরস। বুঝতে পারলাম তার জীবন শেষ হয়ে গেছে। নাটক উপন্যাস ইত্যাদি লিখবার পরিকল্পনা তখন আমার মাথায়, ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় আমি ভরপুর। আমি অনুভব করছিলাম অফুরন্ত কর্ম প্রচেষ্টা আর জীবনের অপরিসীম আনন্দ তখনও অনেক পড়ে আছে আমার সমুখে; তবুও, আমি ভাবলাম, আমিও অপরের চোখে একজন বয়স্ক লোক, যেমনি আমার মনে হয়েছে আমার এই বাল্য বন্ধুকে। আমি এমনি চঞ্চল হয়ে পড়েছিলাম যে, তার যে ছোটো ভাইটির সঙ্গেও ছেলেবেলায় খুব খেলাধুলা করতাম তার কথা জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেলাম, অথবা যারা সব সেদিনে আমার সঙ্গী সাথী ছিল তাদের কথা মনেই এল না। নির্বোধের মতো দু একটা কথা বলে আমি এগিয়ে গেলাম তাকে ছেড়ে। ভিকারেজের দিকেই হাঁটতে লাগলাম।

সেকেলে পুরণো বিরাট বাড়িটা, আজকের অবাসিকের (যার কর্তব্যনিষ্ঠা আমার কাকার চেয়েও বেশি) কাছে অতি সেকেলে, আজকের জীবন যাপনের তুলনায় বড়ো বেশী বড়ো। বিরাট একটা উদ্যানের ভেতর বাড়িটা। বাড়িটার চারদিকে ঘিরে আছে বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ। একটা মস্ত-বড়ো চৌকোনো সাইন বোর্ড সাক্ষ্য দিয়েছে যে এটা বিশিষ্ট ভদ্রসন্তানদের জন্য একটা প্রিপারেটরী স্কুল, ওতে আরও আছে প্রধান শিক্ষকের নাম আর তৎসহ তার ডিগ্রী ডিপ্লোমা পরিচয়। বেড়ার ভেতর দিয়ে আমি দেখলাম ; উদ্যান আগাছায় ভরতি হয়ে গেছে। যে পুকুরটায় আমি মাছ ধরতাম তাও প্রায় ভরাট হয়ে এসেছে। বিস্তীর্ণ মাঠের বুক চিরে উঠেছে সারিবদ্ধ ইঁটের বাড়ি। ঐসব সারিবদ্ধ ইঁটের বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে সরু সরু অসমতল গলি রাস্তা। আমি জয় লেন ধরে হাঁটতে লাগলাম। এখানেও অনেক বাড়ি উঠেছে, বাংলো বাড়ি সমুদ্রের দিকে মুখ করে : পুরণো টার্নপাইক হাউসে এখন একটা চায়ের দোকান : এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালাম। অসংখ্য রাস্তা চোখে পড়ল, ধারে ধারে হলদে ইঁটের ছোটো ছোটো অগুণতি বাড়ি, কিন্তু জানিনা কারা থাকে সেগুলোতে, কারণ কাউকে আমার চোখে পড়ল না। পোতাশ্রয়ের দিকটায় গেলাম। সেখানটাও জনহীন পরিত্যক্ত। জেটি থেকে একটু দূরে কেবল একটি ভবঘুরে শুয়ে আছে দেখলাম। দু-চার জন নাবিকও বসেছিল একটা গুদামের বাইরে, আমায় যেতে দেখে কটমট করে তাকাল আমার দিকে। কয়লার ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেছে অনেকদিন, তাই কয়লাখনির মজুরও আর আসে না ব্রেকস্টেবলে : ততক্ষণ ফার্নে কোর্টে যাবার সময় হয়ে এসেছিল। তাই আমি ফিরে এলাম 'বিয়ার এণ্ড কি' তে। হোটেলের মালিক আমাকে বলেছিল তার একটা ডেইমলার গাড়ি সে ভাড়া খাটায়, ঐ গাড়িতেই লাঞ্চের সময় আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে ঠিক করেছিলাম! যখন আমি ফিরে এলাম তখন গাড়িটা হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে, ব্রুহাম গাড়ি খুব পুরণো, ঐ মডেলের সবচেয়ে ঝড়ঝড়ে গাড়ি, এমনটি আর দেখিনি। ক্যাঁচ ক্যাঁচ, হুস-হুস, আর থপ-থপ করে চলল গাড়িটা। চলতে চলতে তীব্র রোষে ঝাঁকানি দিয়ে থেমে পড়ল মাঝে মাঝে। ভয় হলো আমার, কি জানি গন্তব্যস্থল পৌঁছুবে তো! কিন্তু বড়ো অদ্ভুত অবাক করে দিল আমাকে যে এ গাড়িটার গন্ধও ঠিক আমার কাকা সেকালে যে ল্যাণ্ডো গাড়িটায় চড়ে প্রতি রবিবার গির্জায় যেতেন ঠিক সেটার মতোই। আস্তাবলের সেই অতি চেনা গন্ধ, গাড়ির তলায় রাখা প'চা খড়ের গন্ধ ; নিষ্ফল ভাবনা আমার মনে এল, একালের মটর গাড়িতে ঠিক সেই গন্ধ কেন? কিন্তু এই একটা দুর্গন্ধ আর সুগন্ধ ছাড়া অতীতকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় আর কিছুতেই, এবং যে অঞ্চল

এবং পরিবেশের ভেতর দিয়ে আমি চলছিলাম তাকে ভুলে গিয়ে, নিজেকে আমি কল্পনা করলাম সেই পুরনো দিনের ছোট্ট ছেলেটি, সামনের আসনে বসে, কম্যুনিয়নের থালাটা তার পাশে, মুখোমুখি বসে তার কাকীমা, অ-ডি-কলোন আর পাটভাঙা জামার গন্ধ তাঁর গায়ে। গায়ে কালো সিল্কের ক্লোক জড়ানো, মাথার বনেটে পাখির পালক লাগানো, ক্যাসক গায়ে সহযাত্রী কাকা নিজে, তাঁর চওড়া কোমর ঘিরে সিল্কের চওড়া কটিবন্ধ, গলায় সোনার চেনে সোনার ক্রুশ ঝুলতে ঝুলতে এসে পেটের উপর আশ্রয় নিয়েছে।

—উইলি, শোন, আজকের দিনটিতে একটুও দুষ্টুমি করবে না কিন্তু। কোথাও যেতে পারবে না, নিজের আসনে চুপটি করে বসে থাকবে। ঈশ্বর যে বাড়িতে থাকেন, ছুটোছুটি দুষ্টুমি করতে নেই সেখানে, তারপর মনে রাখবে কিন্তু, তোমার মতো এরকম সুযোগ পায়নি সেইসব ছেলেদের সামনে তোমাকে উদাহরণ হতে হবে কিন্তু।

যখন ফার্নে-কোর্টে এসে পৌঁছলাম মিসেস ড্রিফিলড এবং রয় বাড়ির সামনে পায়চারি করছিলেন। গাড়ি থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দুজনেই এগিয়ে এলেন আমার কাছে।

—রয়কে আমার বাগানের ফুল দেখাচ্ছিলাম। আমার সঙ্গে সেক-হ্যাণ্ড করতে করতে মিসেস ড্রিফিলড বললেন। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার বললেন—এই এখন আমার একমাত্র অবলম্বন।

ছয় বছর আগে যেমন দেখেছিলাম তার চেয়ে খুব বেশি বদলাননি তিনি। বেশ একটা বৈশিষ্ট্য এবং রুচির পরিচয় দিচ্ছে তাঁর পোশাক। গলায় সাদা ক্রেপের কলার, এবং তাঁর মনিবন্ধেও ঠিক তেমনি। রয়কে লক্ষ্য করলাম, তার নীল রঙের সুটের সঙ্গে কালো টাই পরেছে: মনে হলো স্বনামধন্য মৃতের প্রতি শ্রদ্ধার চিহ্ন হিসেবেই হয়তো।

—আগে আপনাকে আমার গাছপালাগুলি দেখাব চলুন। মিসিস ড্রিফিলড বললেন—পরে গিয়ে আমরা লাঞ্চ খেতে বসব।

আমরা ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। রয় অনেক কিছু জানে দেখলাম। কোন ফুলের কি নাম তাও সে জানে, সিগারেট তৈরি করবার যন্ত্র থেকে যেমনি করে বেরিয়ে আসে ঠিক তেমনিভাবে ফুলের লাটিন নাম তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। মিসেস ড্রিফিলডকে বলল বিশেষ বিশেষ ফুল কোথায় তিনি পেতে পারেন।

—এডওয়ার্ডের পড়ার ঘর হয়ে আমরা যাব কি? মিসেস ড্রিফিলড প্রস্তাব করলেন—সে যখন বেঁচেছিল তখন যেভাবে থাকত ঘরটা, আমিও ঠিক সেইভাবে রেখেছি সেটাকে। কিছু আমি সরাইনি! আপনারা শুনলে

অবাক হয়ে যাবেন কত লোক আসে এই বাড়িটা দেখতে। অবশ্যি সবাই যে ঘরটায় বসে সে লিখত সেই ঘরটাই বিশেষ করে দেখতে চায়।

একটা খোলা জানালার ভেতর দিয়ে আমরা ভেতরে গেলাম। ডেস্কের উপর একটা পাত্রে কতগুলো গোলাপ ফুল এবং একটা আর্ম-চেয়রের পাশে গোল-টেবিলের উপর একখানা স্পেকটেটর পত্রিকায় রাখা আছে সেটা চোখে পড়ল। ছাইদানির উপর লেখকের পাইপটা তখনো রাখা আছে এবং দোয়াতে কালি আছে দেখলাম। দৃশ্যটা যেন নিখুঁতভাবে সাজানো। জানি না কেন, ঘরের আবহাওয়াটা যেন একেবারে শুদ্ধ মৃত মনে হলো; যাদুঘরের সোঁদা সোঁদা ভাবটা যেন এর মধ্যেই ঘরখানার ভেতর প্রকট হয়ে উঠেছিল। মিসেস ড্রিফিলড বই-এর তাকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং একটু মুচকি হেসে কতকটা খেলাচ্ছলে আবার কতকটা বিষণ্ণতা নিয়ে, তাকের উপর সাজানো নীল মলাটে বাঁধা প্রায় ডজনখানেক বইয়ের উপর তাঁর হাত বুলিয়ে নিলেন।

—জানেন বোধহয়, ড্রিফিলড আপনার বইগুলোর খুব প্রশংসা করতেন, মিসেস ড্রিফিলড বললেন—বার বার তিনি সেগুলো পড়তেন।

—সত্যি ভাবতেও আমার খুব আনন্দ লাগছে! ভদ্রভাবে তাঁর কথার জবাব দিলাম।

বেশ মনে আছে, এর আগের বার যখন এসেছিলাম বইগুলো তখন ছিল না, এবং আলতোভাবে একখানা বই তুলে নিলাম, বইটার উপর একটু আঙুল বুলিয়ে দেখলাম ধুলো জমেছে কিনা। ধুলো ছিল না। আরো একখানা বই তুলে নিলাম, সেখানা সার্ল'ট ব্রনটির, দুচারটা হালকা কথার ফাঁকে ফাঁকে সেই একই পরীক্ষা চালিয়ে গেলাম। না, এই বইটিতেও ধুলো জমেনি। তবে আমি বেশ বুঝতে পারলাম মিসেস ড্রিফিলড একজন পাকা গৃহিণী এবং তেমনি একজন বুদ্ধিমতী চাকরাণীও ছিল তাঁর।

তারপর আমরা সবাই লাঞ্চ খেতে গেলাম। পাকা দস্তুর ইংরেজী খানা, রোস্ট-বিফ আর ইয়র্কশায়ার পুডিং এর একত্র সমাবেশ। খেতে খেতেই আমরা রয়ের পরিকল্পিত কাজের সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করলাম।

—যতদূর সম্ভব খুব বেশি খাটাতে চাই না রয়কে, মিসেস ড্রিফিলড বললেন। এবং মালমশলা যতটা সম্ভব একত্র করবার চেষ্টা করছি আমি নিজেও। অবশ্যি খুব কষ্টকর হচ্ছে, তবে বেশ ভালো লাগছে এ সত্যি। অনেকগুলো পুরনো ছবিও আমার হাতে এসেছে, সেগুলো দেখাব আপনাদের।

লাঞ্চ শেষ করে ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসলাম আমরা এবং এখানেও মিসেস ড্রিফিলডের নিপুণ হাতের স্পষ্ট ছাপ আর বুদ্ধির পরিচয় বেশ লক্ষ্য করলাম। এ সবকিছু স্ত্রী হিসেবে যতটুকু না মানিয়েছিল, তার চেয়ে

বেশি যেন মানাল প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকের বিধবা হিসাবে। ঐসব ছিট্ কাপড়, পট-পোরির পাত্র, ড্রেসডেনের চিনা-মাটির মূর্তি—এসবগুলোকে যেন ঘিরে ছিল কেমন একটা অস্পষ্ট খেদ ; যেন কোনো এক বিষাদ-ঘন চিত্তে এরা ভাবছে ঐশ্বর্যমণ্ডিত অতীতকে। আজকের এই ঠাণ্ডা দিনে চুল্লিতে একটু আগুণ পেলে খুশী হতাম, কিন্তু ইংরেজ জাতটা যেমনি শ্রম লিপ্সু আবার তেমনি রক্ষণশীল ; নিজের নীতিকে বজায় রাখতে অপরের অস্বাচ্ছন্দ্যকে বলি দিতে একটুও কুণ্ঠা তাদের জাগে না। পয়লা অক্টোবরের আগে চুল্লিতে আগুন জ্বালাবার কথা মিসেস ড্রিফিলডের মনে আদৌ এসেছিল কিনা সন্দেহ আছে আমার। যে মহিলাটি আমাকে ড্রিফিলডদের বাড়িতে লাঞ্চ খেতে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে ইদানিং আমার সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা তিনি জানতে চাইলেন, এবং আমি ধরে নিলাম তাঁর স্বনামধন্য স্বামীর মৃত্যুর পর ঐসব বিশিষ্ট মহলের সবাই স্পষ্টভাবে এড়িয়ে গেছে তাঁকে। অতীতের কথা নিয়ে আলোচনা করতে আমরা সবে শুরু করেছিলাম। আমার স্মৃতির মণিকোঠার দুয়ার খুলতে আমাকে উত্তেজিত করবার জন্য কত কী যে চাতুর্যপূর্ণ প্রশ্ন করতে শুরু করেছিলেন রয় আর মিসেস ড্রিফিলড আমিও আমার সব সাবধানতাকে এনে কেন্দ্রীভূত করেছিলাম, যাতে আমার মনের নিভৃত গোপন কথা বেরিয়ে না আসে অসতর্ক মুহূর্তে ; সেই সময় একটা ছোট্ট রেকাবিতে দুটো কার্ড নিয়ে ভেতরে এল মিসেস ড্রিফিলডদের পরিচারিকা।

—দুজন ভদ্রলোক, গাড়ি নিয়ে এসেছেন। বাড়ির ভেতরটা এবং বাগান ঘুরে দেখতে পারেন কিনা তাঁরা জানতে চেয়েছেন।

—ঐ এক বিশ্রী উৎপাত। মিসেস ড্রিফিলড বলে উঠলেন, কিন্তু অদ্ভুত একটা সজীবতার সঙ্গে। ভারি মজা তো, এই একটু আগেই না বলেছিলাম বাড়িটা দেখবার জন্য কত লোক আসে! একটা মুহূর্ত আমি শান্তিতে কাটাতে পারি না।

—বেশ তো, বললেই পারেন আপনি দুঃখিত, ওদের সঙ্গে এখন দেখা করতে পারবেন না। রয় বলল, বেশ কিছুটা খলতার ভাব ছিল যেন আমার মনে হলো।

—না, না, সে আমি পারি না। এডওয়ার্ড এরকম কিছুতেই চাইত না। তিনি কার্ড দুটোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।—চশমাটাও কাছে নেই।… তিনি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, একটা আমি পড়লাম হেনরি বিয়ার্ড ম্যাকডুগাল, ভারজিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, এবং পেনসিল দিয়ে লেখা ছিল ইংরেজী সাহিত্যের সহকারী অধ্যাপক। অপরটি ছিল 'জেন পল আণ্ডারহিল

এবং নিচে নিউ-ইয়র্কের একটা ঠিকানা।

—মার্কিন! মিসেস ডিফিলড বললেন—ওঁদের বলো, ও'রা যদি ভেতরে আসেন তবে আমি খুবই খুশী হব।

কিছুক্ষণের ভেতর আগন্তুক দুজনকে ভেতরে নিয়ে এল। দুজনই যুবক। বেশ লম্বাটে দেখতে, চওড়া কাঁধ, পরিষ্কার করে কামানো ভারি ভারি মুখ, চোখ দুটিও সুন্দর; দুজনের চোখেই চশমা ছিল এবং মাথার চুলও ঘন কালো, কপাল থেকে টেনে পেছন দিকে আচড়ানো। দুজনেই ইংলিশ সুট পরা, আনকোরা নতুন বলেই মনে হলো। দুজনেই বেশ সপ্রতিভ, কিন্তু স্বভাবে বাক-বাহুল্য থাকলেও ভদ্রতার অভাব দেখলাম। তারা বললে সাহিত্যিক পরিভ্রমণের লক্ষ্য নিয়েই তারা ইংলণ্ডে এসেছিল এবং এডওয়ার্ড ডিফিলডের ভক্ত বলেই হেনরি জেমসের বাড়ি, রি-তে যাবার পথে এই শহরে নামবার স্বাধীনতা নিয়েছিল, আশায়, যে শহর বহু স্মৃতির স্পর্শে পবিত্র হয়ে উঠেছিল তাকে দেখবার সুযোগ তাদের হবে। 'রি-র উল্লেখ খুব প্রীতিপ্রদ হলো না মিসেস ডিফিলডের কাছে।

—আমার বিশ্বাস একটা বিশেষ কোনো যোগাযোগ আছে নিশ্চয় ওদের ওখানে। তিনি বললেন।

রয় এবং আমার সঙ্গে তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন ঐ মার্কিন ভদ্রলোক দুটিকে। এই উপলক্ষে রয় এতটা উৎরে গিয়েছিল যে তাকে প্রশংসা না করে পারলাম না। এই প্রথম জানলাম যে সে ভারজিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এর আগে একবার বক্তৃতা দিয়েছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় ফ্যাকালটির কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বহুদিন কাটিয়ে এসেছিল। সে তার এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা! সে জানে না ঐ মধুর স্বভাব ভারজিনিয়া বাসীদের আতিথেয়তায় সে মুগ্ধ হয়েছিল, নাকি তাদের শিল্প আর সাহিত্যের প্রতি অপরিসীম অনুরাগ দেখে! সে জিজ্ঞাসা করল অমুক অমুক কেমন আছেন। সেখানে সে বহু আজীবনের বন্ধু লাভ করেছিল, এবং যাদের সঙ্গে তার মিলবার সুযোগ হয়েছিল তাদের সবাইকে তার ভালো লেগেছিল। তারপর ঐ তরুণ অধ্যাপক রয়কে বললেন তার বই তাঁর খুব ভালো লেগেছে। রয়ও অতি বিনয়ের সঙ্গে বলল কোন বইটাতে সে কী বলতে চেয়েছে ও তার অসফলতা সম্বন্ধে যে সে সচেতন এটুকু উল্লেখ করতেও সে বাদ দিল না। একটু সহাস্য-ভাব নিয়ে মিসেস ডিফিলড শুনছিলেন, কিন্তু আমার যেন একটা ধারণা হচ্ছিল যে ঐ হাসিও যেন ধীরে ধীরে কষ্ট-কম্পিত হয়ে আসছিল। হয়তো রয়ও একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, কারণ হঠাৎ সে তার কথা থামিয়ে দিল।

—কিন্তু আমার কথা শুনিয়ে আপনাদের বিরক্ত করে তুলব এ কথনো হতে পারে না। সে তার অতি উচ্ছ্বসিত আন্তরিকতার ভাব প্রকাশ করে বলল, মিসেস ড্রিফিলড তাঁর স্বামীর জীবনী রচনা করবার ভার দিয়েছেন আমাকে, তাই আমার আগমন এখানে।

এতে অবশ্যি আগ্রহ জাগল আগন্তুক ভদ্রলোক দুটির।

—সত্যি বলতে কি, বড়ো কঠিন কাজ, রয় বলল,—তবে এইটাই আমার সৌভাগ্য যে মিসেস ড্রিফিলডের সাহায্য পাচ্ছি, তিনি শুধু খাঁটি সহধর্মিনী নন, একজন সার্থক সহকর্মী এবং সহচরীও বলব। যেসব মালমশলা তিনি দিয়েছেন আমাকে সেগুলো এত প্রচুর যে সত্যি বলতে তাঁর পরিশ্রম আর তাঁর অত্যুগ্র উৎসাহ-উদ্দীপনার সুযোগ নেওয়া ছাড়া আমার আর করবার থাকে না কিছু।

একটু সঙ্কুচিত দৃষ্টিতে মাথা নুইয়ে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিসেস ড্রিফিলড এবং ঐ দুটি তরুণ মার্কিন তাদের বড়ো বড়ো চোখ নিয়ে এমন করে তাকাল মিসেস ড্রিফিলডের দিকে যে সে দৃষ্টিতে শুধু ফুটে উঠল একটা সংবেদনশীল অনুভূতি, তাদের মনের আগ্রহ এবং তাদের শ্রদ্ধা। আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর—কিছুটা সাহিত্যিক আবার অংশত গলফ খেলার কথা, কারণ তারা স্বীকার করল 'রি'-তে যাওয়া ঐ তাদের একটা উদ্দেশ্য। এই খানেও রয় তার নাম রাখল, কোথায় কোথায় যাবে সে তাদের বলে দিল এবং লণ্ডনে ফিরে আসলে সেও একবার খেলবার সুযোগ পাবে এ প্রত্যাশাও সে প্রকাশ করল। এরপর মিসেস ড্রিফিলড উঠে দাঁড়ালেন এবং এডওয়ার্ডের পড়ার ঘর, শোবার ঘর, বাগানটাও দেখাবার প্রস্তাব করলেন। রয়ও উঠে দাঁড়াল, ওদের সঙ্গে যাবার উদ্দেশ্য নিয়েই অবশ্যি, কিন্তু মিসেস ড্রিফিলড একটুখানি মুচকি হাসতে বিরত করলেন তাকে সেই হাসি মিষ্টি হলেও দৃঢ়তা ছিল।

—আপনার এসে কাজ নেই রয়, তিনি বললেন,—আমি এ'দের ঘুরিয়ে নিয়ে আসছি। আপনি বরং মিঃ আসেনডেনের সঙ্গে কথা বলুন।

—ও, আচ্ছা! তাই ভালো।

আগন্তুকরা আমাদের কাছে বিদায় নিলেন। আমি আর রয় আবার এসে আর্ম-চেয়ারে আসন নিলাম।

—ভারি সুন্দর ঘরখানা! রয় বলল।

—খুব।

—এদিকে খুব খাটতে হয়েছিল। জানেন বোধহয়, তাঁদের বিয়ের প্রায় দুই তিন বছর আগে বুড়ো এই বাড়িটা কিনেছিলেন। এটা বিক্রি করে দেবার

জন্য এমি কতবার বলেছেন, কিন্তু বুড়ো কিছুতেই রাজী হন নি। কোনো কোনো ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত জেদি ছিলেন। জানেন, বাড়িটা নাকি কোনো এক মিস উলফের ছিল। তারই বেলিফ ছিলেন বুড়োর পিতা এবং তিনি বলতেন যে ছেলেবেলায় তিনি নাকি অনেকবার এই বাড়িটা কিনবার কথা বলতেন। তাই একবার হাতে সুযোগ পেয়ে কোনোমতেই ছাড়তে চাইলেন না। যে অঞ্চলে তাঁর পরিবারের গোড়ার কথা অথবা তার আদ্যোপান্ত ইতিহাস সবাই জানত সেই অঞ্চলেই স্থায়ীভাবে বাস করতে আসবেন কেউ ভাবতে পারত না! একবার এমি এক চাকরানী রাখতে গিয়ে হঠাৎ পরিচয় বেরিয়ে গেল, সে সম্পর্কে ড্রিফিলডের নাতনী। এমি যখন প্রথম এসেছিলেন তখন টটেনহম কোর্ট রোডের রীতি অনুযায়ী আগাগোড়া সারাটা বাড়ি সাজানো ছিল, ওসব তো আপনি জানেন, যেমন টার্কি কার্পেট, মেহগনির সাইড বোর্ড, ড্রয়িং-রুম সুইট, আর আধুনিক ধরণের পর্দা ইত্যাদি। কোনো ভদ্রলোকের বাড়ি এই ধরণেই সাজানো উচিত এই তার ধারণা ছিল। কিন্তু এমি এটা মোটেই পছন্দ করতেন না। একটি জিনিসও নড়াতে দিতেন না, আর সেইজন্য এমিকেও ভীষণ সতর্ক থাকতে হতো। এমি বলতেন এমনি পরিবেশে বাস করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং সবকিছু তাঁর মনমতো করে তুলবার জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। করেও ছিলেন, কিন্তু খুবই ধীরে ধীরে। ড্রিফিলড-এর নজরেই পড়েনি। এমির কাছে শুনেছি তাঁর সবচেয়ে কঠিন সমস্যা দাঁড়িয়েছিল ড্রিফিলডের লেখার টেবিলটা নিয়ে! তাঁর স্টাডিতে যে টেবিলটা আছে, জানি না সেটা আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা। জিনিসটা খুব ভালো, ওরকম একটা পেলে আমিও খুশী হই। ড্রিফিলডের নিজেরটা ছিল একটা বিরাট বড়ো আমেরিকান রোল-টপ ডেস্ক। ওটা অনেকদিন ছিল, প্রায় ডজনখানেক বই লিখেছিলেন ঐ টেবিলে বসেই। কাজেই ওটা ছাড়তে নিতান্তই তিনি নারাজ ছিলেন। এসব জিনিসের প্রতি তাঁর যে বিশেষ কোনো একটা আকর্ষণ ছিল তা মোটেই নয়। বহুদিন ধরে এগুলোর সংস্পর্শে দিন কাটিয়েছিলেন এইটুকু মাত্র তাঁর আকর্ষণ। এমিকে জিজ্ঞাসা করলেই আপনি জানতে পারবেন কেমন করে তিনি সেগুলো সরিয়েছিলেন, সত্যি প্রশংসা না করে পারবেন না। অদ্ভুত মহিলা, সাধারণত নিজের বুদ্ধিতেই তিনি চলে থাকেন।

—সেটা আমিও লক্ষ্য করেছি। আমি বললাম।

আগন্তুকদের সঙ্গে যাবার ইচ্ছা থেকে রয়কে বিরত করতে তাই তাঁর একটুও অসুবিধে হয়নি। রয় আমার দিকে একটু চকিত দৃষ্টিতে তাকিয়েই হেসে ফেলল। রয় বোকা ছিল না।

—আমেরিকাকে আমি যতটুকু জানি আপনি ততটুকু জানেন না, রয় বলল,—মৃত সিংহের চেয়ে জীবন্ত ইঁদুরের মূল্য তাদের কাছে বেশি! আমেরিকাকে যে আমি পছন্দ করি এও তার একটি কারণ!

পঁচিশ

তীর্থ যাত্রীদের বিদায় করে দিয়ে মিসেস ড্রিফিলড যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর বগলে একখানা পোর্ট-ফোলিও।

—কি চমৎকার এই দুটি তরুণ! তিনি বললেন, ইংলণ্ডের যুবকরাও যদি সাহিত্যের প্রতি এমনি আগ্রহ দেখাত তাহলে আমি খুব খুশী হতাম। এডওয়ার্ড মারা যাবার সময়কার ফটোখানা ওদের দিয়ে দিয়েছি, এবং তারা আমারও একখানা ফটো চাইল। নিজের হাতে দস্তখত করে দিয়েছি একখানা। তারপর খুব নম্র ভাবে মিসেস ড্রিফিলড বললেন,—আপনার সম্বন্ধে খুব ভালো ধারণা এরা নিয়ে গেছে, রয়। আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়াকে তারা সৌভাগ্য বলে মেনে নিয়েছে।

—আমি আমেরিকায় অনেক বক্তৃতা দিয়েছি, অতি সঙ্গে রয় বলল।

—তা বটে, কিন্তু তারা আপনার বই পড়েছে। তারা বললে যেটা তাদের ভালো লেগেছে সেটা হলো আপনার রচনার সজীবতা।

পোর্ট-ফোলিওর ভেতর কতকগুলো পুরণো ফটো ছিল, স্কুলের ছাত্রদের একটা গ্রুপ ফটো, তার মধ্যে একটি অতি নোংরা ছোট্ট ছেলেকে আমি এডওয়ার্ড বলে চিনতে পারলাম, তাও তাঁর বিধবা স্ত্রী আঙুল দিয়ে চিনিয়ে দিলেন বলে। রাগবি খেলার দলের মধ্যে ড্রিফিলডকে একটু বয়স্ক বলে মনে হলো, আর একখানা জার্সি এবং জ্যাকেট পরা এক নাবিকের ছবি, ড্রিফিলড যখন জাহাজে কাজ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন তখনকার।

—এই ছবিখানা তাঁর প্রথম বিয়ের পর তোলা হয়েছিল, মিসেস ড্রিফিলড বললেন।

তখন তাঁর দাড়ি ছিল, সাদা-কালো চেকের ট্রাউজার পরনে ছিল; বাটন হোলে মস্ত বড়ো একটা সাদা গোলাপ ফুল, টেবিলের উপর তাঁর পাশে ছিল একটা টুপি।

—আর এই তাঁর কনের ছবি। মিসেস ড্রিফিলড বললেন মুখের হাসি গোপন করতে চেষ্টা করে।

বেচারা রোজি, চল্লিশ বছর আগে এক গ্রাম্য ফটোগ্রাফারের চোখে কী বিদকুটেই না দেখিয়েছিল: কেমন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হাতে ছিল একটা বিরাট ফুলের তোড়া, পোশাকটাও বিশ্রীরকম জমকালো, কোমরের কাছে খুব আটো-

—সাটো। টুপিটা চোখের কাছ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছিল। একটা কমলা-ফুলের মালা জড়ানো ছিল তার মাথায় এক গুচ্ছের চুলের উপর। তার উপর দিয়ে ঝুলছিল একটা বিরাট লম্বা ওড়না। শুধু আমি জানি কত সুন্দর তাকে দেখিয়েছিল সেদিন।

—অত্যন্ত বিশ্রী, মামুলী লাগছে কিন্তু, রয় মন্তব্য করল।

—তাই সে ছিল, মিসেস ড্রিফিল্ড আস্তে আস্তে বললেন।

এডওয়ার্ডের আরো অনেকগুলি ফটো দেখলাম, যখন তাঁর নাম হতে শুরু হয়েছে তখনকার ফটো। কোনটা যখন তিনি গোঁফ রাখতেন সে সময়কার। এবং বাকি সবগুলি পরবর্তী কালের, যে সময় দাড়ি-গোঁফ কিছুই তিনি রাখতেন না। ধীরে ধীরে মুখটা কৃশতর ও রেখা-বহুল হয়ে উঠছিল। গোড়ার দিকবার পোর্টেটগুলির অতি সাধারণ ভাব মিলিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে ক্লান্তিকর পারিপাট্যে এসে রূপ নিয়েছিল। চোখে পড়ল এই পরিবর্তনের মূলে ছিল তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা, চিন্তা আর উচ্চাশা। ঐ তরুণ নাবিকের ফটোখানার দিকে আমি আবার তাকালাম। মনে হলো যে নির্লিপ্ততা পূর্ণ পরিস্ফুট ছিল তাঁর পরবর্তী কালের ছবিগুলিতে তার একটু আভাস যেন ছিল এই ছবিতেও। এও মনে হলো যেন মানুষটির ভেতরও ঠিক এই জিনিসটাই আমি লক্ষ্য করেছিলাম বহু বছর পরেও। মুখখানা যেন একটা মুখোশ মাত্র এবং যে কর্ম তিনি সাধন করেছিলেন তাও যেন অর্থহীন। আমার ধারণা হলো যে নাকি মৃত্যু পর্যন্তও অচেনা, নিঃসঙ্গ রয়ে গেল সেই মানুষটি ছিল একটি ছায়া মাত্র; তাঁর বইগুলোর লেখক আর তাঁর জীবনকে যে চালাতো সেই সত্তা এই দুই অস্তিত্বের ভেতর ছিল সেই ছায়ামূর্তির অদৃশ্য শব্দহীন সঞ্চরণ; একটা নির্লিপ্ত হাসি খেলে গেল এই দুটি পুত্তলির কথা ভেবে—দুনিয়ার মানুষের কাছে যার পরিচয় ছিল এডওয়ার্ড ড্রিফিল্ড বলে। এ বিষয়ে আমি খুবই সচেতন, যে মানুষটির কথা আমি লিখছি তার জীবন্ত রূপকে আমি ফুটিয়ে তুলিনি, তার সেই মূর্তিকে আমি ফুটিয়ে তুলিনি যে-রূপে মানুষটা তার পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াত, চলত ফিরত, বুদ্ধিগ্রাহ্য উদ্দেশ্য নিয়ে যুক্তিপূর্ণ কাজ করত, সে চেষ্টাও আমি করিনি। অলরয় কিয়ারের প্রতিভার কাছে সেটাকে ছেড়ে দিতে আমি খুশী বোধ করছি।

অভিনেতা হ্যারি রেটফোর্ড রোজির যে ছবিখানা তুলেছিল সেখানাও দেখতে পেলাম। এবং লায়োনেল হিলিয়র যে ছবিখানা এঁকেছিল তার একখানা ফটোও আমার চোখে পড়ল। আমার বুকের ভেতরটা কেমন খচ্ করে উঠল। রোজির এই মূর্তিটাই আমার স্মৃতিতে বেঁচেছিল। তার পরনে

সেই অতি সেকেলে গাউন সত্ত্বেও সে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, যে কামনার আকৃতি তার সমস্ত সত্তায় উপচে উঠেছিল তারই যেন উদ্বেলতা ফুটে উঠেছিল এই ছবিটিতে। কামনার বহ্নিতে আত্মাহুতি দিতে যেন সে উন্মনা।

—একটা কুৎসিত বারবণিতার মতো মনে হয় একে, রয় বলল।

—গহলানী ধরণের বলতে পারেন। মিসেস ডিট্রফিলড জবাবে মন্তব্য করলেন। সাদা নিগার বলে মনে হয়েছে একে সব সময়।

ঠিক এই কথাটাই মিসেস বারটন ট্রেফর্ড'ও ব্যবহার করতেন রোজি সম্বন্ধে এবং রোজির মোটা ঠোঁট আর চেপ্টা নাক এই সমালোচনার স্বপক্ষেই সাক্ষ্য বহন করত। কিন্তু তাঁরা কেউ জানতেন না কি সুন্দর সোণালী বরণ ছিল তার চুলের, তাঁরা জানতেন না ততোধিক সোণালী ছিল তার দেহের চামড়ার রঙ; তাঁরা কেউ জানতেন না তার মনভুলানো মিষ্টি হাসির কথা।

—ঠিক সাদা-নিগার বলা ঠিক হবে না বোধ হয়, আমি বললাম।—তিনি ছিলেন উষার মতন স্নিগ্ধ অমলিন। ঠিক যেন হিব-এর (Hebo) মতো। তিনি ছিলেন একটি সাদা গোলাপের মতো।

মিসেস ডিট্রফিলড একটু মুখ টিপে হাসলেন, একটুখানি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন রয়ের দিকে।

—মিসেস বারটন ট্রেফর্ড এর সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন আমাকে। বিদ্বেষ প্রকাশ করা আমার ঠিক ইচ্ছে নয়। তবে সত্যি আমি দুঃখিত এই জন্যে একজন সৎ মহিলা বলে কিছুতেই আমি তাকে মনে করতে পারি না।

—এইখানেই আপনি ভুল করছেন, আমি জবাব দিলাম।—তিনি একজন সত্যিকার সৎ মহিলা ছিলেন। আমি কখনো তাঁকে রাগতে দেখিনি। আপনার কিছু প্রত্যাশা আছে শুধু এইটুকু বললেই হতো তাঁকে। কখনো কাউকে কোনোরকম কটুক্তি করতে তাঁকে শুনিনি। তাঁর অন্তকরণ ছিল সোনার মতো।

—অতি জঘন্যভাবে থাকত। সারা বাড়ি একটা ভূতের আস্তানা বলে মনে হতো, কোনো একটা চেয়ারে বসতে প্রবৃত্তি হতো না। ধুলোবালিতে এত নোংরা হয়ে থাকত সবসময়, আর ঘরের আনাচে কানাচে তাকানই দুষ্কর ছিল। নিজের সম্বন্ধেও একই কথা। ঠিক সোজা পরিপাটি করে কখনো স্কার্ট পরতে পারত না, দু এক ইঞ্চি পেটিকোট বেরিয়ে থাকত।

—এসব ব্যাপারে তিনি আদৌ মাথা ঘামাতেন না। তাঁর রূপ কমে যায়নি এতে। তিনি যেমনি রূপবতী ঠিক গুণবতীও ছিলেন তেমনি।

রয় হাসিতে ফেটে পড়ল, আর মিসেস ডিট্রফিলড তাঁর নিজের মুখ চেপে ধরলেন হাসি চাপবার জন্য।

—মিঃ আসেনডেন, এইবার কিন্তু আপনি খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন। যেটা সত্য সেটাকে মেনে নেওয়া উচিত। সে একজন নিমফোমেনিয়াক্ অর্থাৎ কামোন্মাদ।

—আমার মনে হয় কথাটা খুব অসঙ্গত প্রয়োগ। আমি বললাম।

—বেশ, তাই যদি না হয় তবে বেচারা ড্রিফিলডের সঙ্গে এ ধরণের ব্যবহার সে করতে পারল কেমন করে? তবে এটা সাপে বর হয়েছিল। সে যদি তাঁকে ছেড়ে না যেত, তবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঐ বোঝা টানতে হতো তাঁকে, আর ঐ প্রতিবন্ধক নিয়ে যে প্রতিষ্ঠা আজ পেয়েছেন তাও হয়তো কঠিন হতো। তবে কথাটা অব্যাহত থেকে যায় যে সে তাঁকে জঘন্যভাবে প্রতারণা করেছিল, তাঁর কাছে অবিশ্বাসিনী ছিল। আমি যতটুকু জানি সে ভ্রষ্টাচারিতার চরমে উঠেছিল।

—আপনি ঠিক বুঝতে পারেন নি। আমি বললাম—অতি সরল মহিলা ছিলেন তিনি। তাঁর প্রকৃতি ছিল অমলিন। তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন তাদেরকে সুখী করবার জন্য। তিনি ভালোবাসাকে ভালোবাসতেন।

—ওকে আপনি ভালোবাসা বলেন?

—বেশ, প্রেম করা বলতে পারেন। তিনি স্বভাবত স্নেহশীলা ছিলেন। যখনই কাউকে তাঁর ভালো লাগত তারই শয্যাসঙ্গিনী হতে তাঁর একটুও কুণ্ঠা বোধ হতো না; দ্বিবার তিনি কখনো ভাবতেন না। তিনি ঐ কাজকে কখনো পাপ মনে করতেন না; ওটা কামপ্রবণতাও নয়, ওটা ছিল তাঁর প্রকৃতি, তাঁর স্বভাব। সূর্য যেমন উত্তাপ বিলিয়ে যায়, ফুল যেমন গন্ধ বিতরণ করে তিনিও তেমনি বিলিয়ে দিতেন নিজেকে। এই ছিল তাঁর আনন্দ এবং এই আনন্দ অপরকে দিতেও তাঁর ভালো লাগত।

তাঁর চরিত্রের উপর এর কোনো প্রভাব পড়ত না; তাঁর নিষ্ঠা অটুট থাকত, তাঁকে কোনোরকম মলিনতা স্পর্শ করতে পারত না, তিনি নির্বিকার থাকতেন। মিসেস ড্রিফিলডের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো যেন তিনি এক ডোজ ক্যাষ্টর অয়েল খেয়েছেন, এবং এক টুকরো লেবু চুষতে চুষতে তারই স্বাদ দূর করতে চেষ্টা করছেন।

—এ আমার বুদ্ধিতে আসে না। তিনি বললেন।—তবে এ আমি স্বীকার করছি এডওয়ার্ড রোজির ভেতর কী দেখেছিল তাও আমি বুঝতে পারিনি।

—এর সব কীর্তি-কলাপ এডওয়ার্ড জানতেন? রয় জিজ্ঞাসা করল।

—নিশ্চয় সে জানত না। চটপট জবাব দিলেন মিসেস ড্রিফিলড?

—আমি যতটুকু না ভাবি তার চেয়েও অনেক বেশি নির্বোধ বলে তাঁকে আপনি মনে করেন, তাই না মিসেস ড্রিফিলড? আমি বললাম।

—তাহলে সে এসব সহ্য করত কি করে ?

—আমার মনে হয় আমি বলতে পারব আপনাকে। জানেন, রোজি এমনি স্ত্রীলোক যে কখনো কারো মনে ভালোবাসা জাগাতে পারত না। সে স্নেহ জাগাত। তাই তার প্রতি ঈর্ষা জাগাও অসম্ভব ছিল। ঘন বনানীর ভেতর স্বচ্ছতোয়া সরসীর মতো সে, ওতে ঝাঁপিয়ে পড়তেই জীবন সার্থক, কিন্তু সেই সরোবরের জলের শীতলতা বা স্বচ্ছতা একটুও কমে না যদি না কোনো এক ভবঘুরে যাযাবর জিপসী বা কোনো এক শিকারী আপনার আগেই ডুব দিয়ে যায় এই জলে।

রয় আবার হেসে উঠল এবং এইবার মিসেস ড্রিফিলডও গোপন করবার চেষ্টা না করে মুখ টিপে হাসলেন একটু।

—আপনাকে এমনি কাব্য করতে শুনলে খুব মজা লাগে কিন্তু। রয় বলল। আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপতে চেষ্টা করলাম। আমি লক্ষ্য করেছি যখনই একটু গম্ভীর হয়েছি তখনই লোকের হাস্যোদ্রেক হয়েছে. আবার মনের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে কিছু লিখে কিছুক্ষণ পরে যখন সেই লেখাই পড়েছি তখন নিজের মনেই আমার হাসি পেয়েছে! স্বাভাবিক নির্দোষ আবেগের ভেতর নিশ্চয় একটা অদ্ভুত অবাস্তব কিছু আছে : যদিও কেন এ সম্ভব আমি কল্পনা করতে পারি না—যদি না হয়, তবে এই ক্ষুদ্র গ্রহের ক্ষণস্থায়ী বাসিন্দা এই মানুষ তার সকল ব্যথা-বেদনা আর জীবনের সকল আকু-পাকু নিয়ে অনন্ত মানসের একটা কৌতুক বই আর কি বলুন।

মনে হলো মিসেস ড্রিফিলড আরো কিছু জানতে চাইছেন আমার কাছে। এরজন্য তিনি যেন কেমন একটু অপ্রস্তুতবোধ করছিলেন!

—আপনার কি মনে হয় রোজি ফিরে আসতে চাইলে ড্রিফিলড আবার তাকে গ্রহণ করতো ?

—আমার চেয়েও আপনি বেশি জানেন তাঁকে। তবে আমি বলব তিনি গ্রহণ করতেন না। মনে হয় তাঁর মনের কোনো একটা আবেগ যখন নিঃশেষিত হয়ে যেত তখন যে এই আবেগের জন্ম দিত তার প্রতি তাঁর মনে আর একটুও আগ্রহ থাকত না। বোধহয় একটা প্রবল অনুভূতি এবং অশেষ নিস্পৃহতার অদ্ভুত একটা সংমিশ্রণ ছিল তাঁর ভেতর।

—জানিনা এ আপনি বলছেন কেমন করে। রয় বলে উঠল। তাঁর চেয়ে দয়াবান লোক আমি আর দুটি দেখিনি।

স্থিরদৃষ্টিতে মিসেস ড্রিফিলড তাকালেন আমার দিকে, তারপর চোখ নামিয়ে নিলেন।

জানিনা আমেরিকা চলে যাবার পর কী হয়েছিল রোজির! রয় জিজ্ঞাসা করল।

—আমার বিশ্বাস সে কেম্পকে বিয়ে করেছিল। মিসেস ড্রিফিলড বললেন। শুনেছি তারা নাকি নাম বদলে নিয়েছিল। অবশ্যি এখানে ফিরে এসে তারা আর মুখ দেখাতে পারত না নিশ্চয়।

—কখন সে মারা গেল ?

—সে প্রায় বছর দশেক হয়েছে।

—কার কাছে শুনলেন ? আমি প্রশ্ন করলাম।

—কেম্পের ছেলে হেরলড কেম্পের কাছে ; মেডস্টোনে কী একটা ব্যবসা করে এডওয়ার্ডকে আমি কথাটা বলিনি। রোজি তার কাছে মরে গিয়েছিল অনেকদিন আগেই, কাজেই আমি অতীতকে টেনে আনবার কোনো সার্থকতা দেখিনি। অপরের জায়গায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে ভাবলেই সব সহজ হয়ে যায় দেখবেন তাই ভাবলাম, আমি যদি হতাম তাহলে যৌবনের একটা দুঃখময় ঘটনার কথা কিছুতেই স্মরণ করিয়ে দিতে দিতাম না কখনও। বলুন তো আমি ঠিক করিনি ?

ছাব্বিশ

মিসেস ড্রিফিলড অনুগ্রহ করে তাঁর গাড়িতেই আমাকে ব্লেকস্টেবল পৌঁছে দিতে প্রস্তাব করলেন, কিন্তু আমি হেঁটে যাওয়াই স্থির করলাম। পরদিন ফার্নে-কোর্টে ডিনার খেতে আসব কথা দিলাম এবং এও কথা দিলাম এডওয়ার্ড ড্রিফিলডের সঙ্গে যখন আমার খুব ঘনঘন যাতায়াত ছিল সেই সময়কার স্মৃতি এই অল্প সময়ের মধ্যে লিখে নিয়ে আসব। আঁকা বাঁকা জনমানবহীন পল্লীর পথ ধরে চলতে চলতে কী বলব তাই ভাবছিলাম। সবাই তো বলে বাদ সাফ দেবার আর্টকেই নাকি বলে স্টাইল। তাই যদি হয়, তাহলে নিশ্চয় আমি বেশ ভালো কিছুটা লিখতে পারব এবং বড়ো দুঃখ লাগল আমার সেই লেখাকেই রয় তার লেখার মাল মশলা বলে ব্যবহার করবে। মনে মনে হাসিও পেল এই ভেবে যে যদি ইচ্ছে করি একটা বমশেল ও ছাড়তে পারি। কারণ মাত্র একটি লোকই ছিল যে ড্রিফিলড সম্বন্ধে বা তার প্রথম বিবাহের ব্যাপারে, যা তারা জানতে চাইত, সবকিছু বলতে পারত ; কিন্তু আসল কথা আমি গোপন করব ঠিক করলাম। রোজির মৃত্যু হয়েছিল বলেই সবাই ধরে নিয়েছিল ; কিন্তু তারা ভুল করেছিল : আমি জানতাম রোজি নিঃসন্দেহে জীবিত ছিল, মরেনি।

আমার একটা নাটক মঞ্চস্থ করবার ব্যাপারে আমি নিউইয়র্কে গিয়েছিলাম। আমার ম্যানেজারের অতি উৎসাহী প্রেস রিপ্রেজেনটেটিভের কল্যাণে খবরটা অনেক আগেই সবরকম কাগজে কাগজে ছড়িয়ে পড়েছিল। হঠাৎ একদিন

একখানা চিঠি এল আমার হাতে, হস্তাক্ষর খুব পরিচিত মনে হলো, কিন্তু মানুষটিকে ঠিক মনে করতে পারলাম না। বেশ বড়ো বড়ো গোটা গোটা অক্ষর, কিন্তু অশিক্ষিত হাতের। হস্তাক্ষর আমার এত বেশী পরিচিত যে, কার হাতের লেখা মনে করতে না পেরে খুব রাগ হচ্ছিল মনে মনে। এ অবস্থায় চিঠিখানা তক্ষুনি খুলে দেখাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার বদলে আমি খামটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম এবং মস্তিষ্ককে তোলপাড় করতে লাগলাম। এমন কতকগুলো হস্তাক্ষর আছে দেখলেই আমার গায় জ্বর আসে। আবার এমনও আছে যে সপ্তাহ কেটে যায় তবু খুলে দেখতেও ইচ্ছে করে না। তারপর যখন খামটা খুলে পড়লাম একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগালো আমার মনে। চিঠিখানা যেন হঠাৎ শুরু হয়েছিল :

—এই একটু আগে দেখলাম তুমি নিউইয়র্কে
আছ এবং আবার তোমাকে দেখতে ইচ্ছে হলো।
আমি এখন আর নিউইয়র্কে থাকি না,
তবে ইয়ংকার জায়গাটা খুব বেশী দূরে নয়.
গাড়ি থাকলে আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছন
যায়। তুমি হয়তো খুবই ব্যস্ত, তাই দিন ঠিক
করবার ভারটা তোমার উপরই ছেড়ে দিলাম।
অনেকদিন হয়ে গেল আমাদের শেষ দেখা,
তবু আশা করি তোমার পুরনো বন্ধুকে
তুমি ভুলে যাওনি।

রোজ ইগালডেন (পূর্বতন ডিংফিলড)

ঠিকানাটা দেখলাম ; আলবামার্লে, নিশ্চয় একটা হোটেল বা এপার্টমেণ্ট, তারপর একটা রাস্তার নাম, ইয়ংকার অঞ্চল তাও উল্লেখ আছে। কেমন একটা শিহরণ শির শির করে গেল আমার শিরায় শিরায়। আমার কবরের উপর দিয়ে কে যেন হেঁটে গেল। যে সুদীর্ঘ বছরগুলি পেছনে ফেলে এসেছি তার মধ্যে অনেকবার রোজির কথা আমার মনে পড়েছে, কিন্তু ইদানিং কথাটা আমার মনে গেঁথে গিয়েছিল যে হয়তো নিশ্চয় তার মৃত্যু হয়েছে এত দিনে। নামটা পড়ে হঠাৎ মুহূর্তমাত্রের জন্য আমি কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম কিন্তু কেম্প না হয়ে ইগালডেন কেন ? হঠাৎ আমার মনে হলো ইংলণ্ড থেকে পালিয়ে আসবার সময় তারা কেণ্ট অঞ্চলের এই নামটা নিয়েছিল হয়তো ! আমার প্রথম ইচ্ছে হলো না যাবার, একটা কিছু ছুঁতো বার করা ; অনেকদিন যাকে দেখিনি তার সঙ্গে নতুন করে সাক্ষাৎ করতে আমি সব সময় একটা সঙ্কোচ বোধ করতাম ; তবু কেমন একটা কৌতূহল আমাকে পেয়ে

বসল। সে এখন দেখতে কেমন জানতে এবং তার এই সুদীর্ঘ দিনের ইতিহাস শুনতে আমার খুব ইচ্ছে হলো। 'ডবস ফেরিতে' সপ্তাহান্ত যাপন করতে যাবার কথা ছিল, সেখানে যেতে ইয়ংকারের ভেতর দিয়েই যেতে হতো; তাই আমি জবাব দিলাম পরবর্তী শনিবার দিন চারটে নাগাদ পৌঁছব সেখানে।

আলবামার্লে একটা বিরাট বড়ো ভাড়াটে ফ্ল্যাট বাড়ি। খুবই নতুন, দেখে মনে হলো খুব সাধারণ লোক বাস করে না সেখানে। ইউনিফর্ম পরা একজন নিগ্রো পোর্টার টেলিফোন করে আমার নাম উপরে পাঠিয়ে দিল, তারপর আর একজন এসে আমাকে এলিভেটরে তুলে নিল। কেমন যেন অদ্ভুত রকম নারভাস বোধ করেছিলাম। একজন কৃষ্ণাঙ্গী পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিল।

—ভেতরে আসুন, সে বলল—মিসেস ইগালডেন আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আমাকে একটা লিভিং রুমে নিয়ে গেল, সেটা ডাইনিং রুমেও ব্যবহৃত হতো; কারণ ঘরের এক প্রান্তে ওক কাঠের একটা চৌকো টেবিল ছিল, গোটা চারেক চেয়ারও দেখলাম; গ্রাণ্ড রেপিডসের মিস্ত্রীরা এগুলোকেই হয়তো জেকোবিয়ান বলত। কিন্তু ঘরের অপর প্রান্তে ছিল চতুর্দ্দশ লুইসের আমলের সোফা-স্যুট, নীল ডামাস্ক কাপড়ে আপহোলস্টার করা, বেশ দামী ছোটো ছোটো টেবিলও ছিল অনেকগুলি, সেগুলোর উপর নানা রকমের ফুলদানী সাজানো. কত রকমের চিত্র করা, কোনোটায় বিবসনা নারীর ব্রোঞ্জমূর্তি, গায়ের ওড়না যেন ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে গিয়ে লজ্জায় ঢেকে দিতে চাইছে বিবসনার নগ্ন স্ত্রী অঙ্গকে। প্রতিটা মূর্তির প্রসারিত হাতের মুঠোয় একটি করে বৈদ্যুতিক আলো। গ্রামোফোনটা একটা অপূর্ব জিনিস। দোকানের শো-উইনডোরেও আমি দেখিনি কোনোদিন, সবটুকু সোণালী, একখানা সিডন চেয়ারের মতো দেখতে ওয়াটুর রাজসভাসদ আর তাঁদেরই স্ত্রীদের অঙ্কিত ছবি ওটার গায়।

প্রায় পাঁচ মিনিট মতো অপেক্ষা করবার পর আর একটা দরজা খুলে দ্রুত পায়ে রোজি ঘরে ঢুকল। দুখানা হাতই বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

—সত্যি আমি চমকে গিয়েছি! সে বললো। ওফ! সে আজ কতদিন হয়ে গেল আমাদের দেখা হয়নি! দাঁড়াও, এক মিনিট। দরজার কাছে গিয়ে সে একটা হাঁক দিল। জেসি, চা-টা এইবার নিয়ে আসতে পার; দেখো, জলটা ফোটে যেন ঠিক মতো। তারপর আবার ফিরে এসে বসতে

পাগল। তুমি বিশ্বাস করবে না, এই মেয়েটাকে চা করতে শিখাতে গিয়ে কী ভোগ আমাকে ভুগতে হয়েছে।
রোজির বয়স তখন প্রায় সত্তর। সবুজ শিফনের একটা হাত কাটা ফ্রক তার পরণে ছিল, গলার কাছটায় চৌকো করে' কাটা আবার বেশ খাটো, ফেটে পড়া দস্তানীর মতো আট হয়ে গায় সেটে ছিল। আকৃতি দেখে আমি বুঝতে পারলাম সে রাবারের করসেট ব্যবহার করত। আঙুলের নখ রক্ত রঙ দেওয়া, আর চোখের ভুরু তুলে ফেলা। বেশ মোটা হয়েছে। চোয়ালের নিচে মাংস ঝুলে পড়েছে! মুখের চামড়ায় যদিও খুব পাউডার ঘসেছে, বেশ লাল দেখতে, আবার মুখের রঙও তেমনি রক্তিম। কিন্তু তাকে যেমনি স্বাস্থ্য-বতী তেমনি সজীব মনে হলো আমার। তখনও তার মাথা ভরতি চুল, কিন্তু সে চুল একদম সাদা, বেশ কোঁকড়ানো। তরুণী বয়সে বেশ নরম নরম স্বাভাবিক ঢেউ খেলানো চুল ছিল, কিন্তু আজকে চুলের এই কড়া ঢেউ-গুলোর দিকে (বুঝি এইমাত্র হেয়ার-ড্রেসারের কাছ থেকে এসেছে) তাকিয়ে এই কথাটাই মনে হলো, যেন আর কেউ। কিন্তু একটি জিনিস বদলায়নি দেখলাম। সেটা তার মুখের হাসি। সেই পুরনো দিনের শিশুর মতো দুষ্টুমি ভরা মিষ্টি হাসি। তার দাঁত কোনোদিনই ভালো ছিল না, অসমান বিশ্রী দেখতে, কিন্তু সেগুলির জায়গায় স্থান নিয়েছে পরিপাটি সুন্দর, তুষারের মতো শুভ্র সমুজ্জ্বল এক প্রস্থ দাঁত, দেখে মনে হলো খুব দামী।
কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েটি অনেক কিছু নিয়ে এল চায়ের সঙ্গে, স্যাণ্ডউইচ, কুকিস, ক্যান্ডি ইত্যাদি, ছোটো ছোটো ছুরি কাঁটা আর ন্যাপকিন। বেশ তকতকে ঝকঝকে।
—এই একটা জিনিস আমি ছাড়তে পারিনি কোনোদিন, চা। রোজি বলল এক টুকরো মাখন মাখানো রুটি হাতে তুলে নিয়ে।—সত্যি, এই আমার সেরা খাবার, যদিও আমি জানি এ আমার খাওয়া উচিত নয়। ডাক্তার সব সময় বলে মিসেস ইগালডেন, আপনার দেহের ওজন কিছুতেই কমবে না যদি চায়ের সঙ্গে এমনি করে ডজন খানেক কুকিস খান। বলেই একটু মুখ টিপে হাসল, হঠাৎ যেন দেখতে পেলাম পরিপাটি করা চুল, রঙ আর পাউডার ঘষা মেদ-বহুল মেয়েটির ভেতর সেদিনের সেই রোজি যেন বেঁচে আছে তখনও।
—কিন্তু তার উত্তরে আমি কী বলি জান, আমি বলি যা তোমার ভালো লাগে তার একটুখানিও উপকারে আসে।
কথায় তাকে সাবলিল দেখেছি বরাবরই। তাই কিছুক্ষণের ভেতরই এমনি মশগুল হয়ে গেলাম যেন মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে দেখা হয়েছে আমাদের।

—আমার চিঠি পেয়ে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলে, তাই না? ডি-ফিলড নামটা উল্লেখ করেছিলাম যাতে তুমি চিনতে পার। আমেরিকায় এসে আমরা ইগালডেন নামটা নিয়েছিলাম। ব্রেকস্টেবল ছেড়ে আসবার সময় জর্জ একটা অপ্রীতিকর কাজ করে এসেছিল, তুমি শুনেছ নিশ্চয়, তারপর ভাবল নতুন দেশে এসে নতুন নাম নিয়ে শুরু করাই ভালো; আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছ বোধহয়।

আমি একটু অস্পষ্টভাবে মাথা নাড়লাম।

—বেচারা জর্জ, বছর দশেক হয়ে গেল সে মারা গেছে, শুনেছ বোধহয়।

—না, এ খবর শুনে সত্যি আমি দুঃখিত।

—ও···তা জানো···ওর বয়স বাড়ছিল। তখন সত্তর বয়স পার হয়ে গিয়েছিল, অথচ দেখে কিন্তু কেউ বুঝতে পারত না। সেদিন আমি ভীষণ আঘাত পেয়েছিলাম। আমি জানি কোনো নারী এরকম স্বামী প্রত্যাশাও করতে পারে না, আমি যা পেয়েছিলাম তার কাছে। আমাদের বিয়ের দিন থেকে তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত কোনোদিন একটি কড়া কথা শুনিনি তার মুখে। তারপর এও আমি আজ খুব আনন্দের সঙ্গে বলছি আমার জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থাও করে রেখে গেছে।

—শুনে খুব খুশী হলাম।

—হ্যাঁ, এ দেশে এসে সে তার অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছিল। বাড়ি তৈরির ব্যবসাই সে বেছে নিয়েছিল, ওতে তার ভারি সখও ছিল; তাই টামানিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। সবসময় সে খালি বলত বছর কুড়ি আগে আসেনি এটাই তার জীবনের বড়ো ভুল হয়েছিল। প্রথম দিন পা দিয়েই এই দেশটাকে তার ভালো লেগে গিয়েছিল। অদ্ভুত কর্মোদ্দম ছিল তার, আর এদেশে এ জিনিসটার বেশি করে প্রয়োজন। এদেশে উন্নতি করতে যা প্রয়োজন তার সবই ছিল তার ভেতর।

—আর কোনোদিন তোমরা ইংলণ্ডে ফিরে যাওনি?

—না, যেতে ইচ্ছেও করেনি। জর্জ অনেক সময় বলত, এক-আধ বার বেড়িয়ে আসবার জন্য, কিন্তু দুজনে একমত হইনি কোনো সময়; আজ সে নেই, আমারও ইচ্ছে হয় না। আমার মনে হয় নিউইয়র্কে দিন কাটাবার পর লণ্ডন আমার কাছে হয়তো প্রাণহীন মনে হবে। জানো বোধ হয়, আমরা নিউ ইয়র্কেই থাকতাম। তার মৃত্যুর পর আমি এখানে চলে এসেছি।

—তুমি এই ইয়ংকার অঞ্চল বেছে নিলে কেন?

—তার কারণ, আমার মনে মনে একটা সখ ছিল। আমি প্রায়ই জর্জকে বলতাম, কাজে অবসর নেবার পর আমরা ইয়ংকার অঞ্চলে গিয়ে বাস করব।

এ জায়গাটা আমার কাছে অনেকটা ছোটো-খাটো ইংলণ্ডের মতো লাগে ; এই ধরো মেইডস্টোন বা গিলডফোর্ড বা এমনি কোনো অঞ্চলের মতো।
একটু মুচকি হাসলাম ; কিন্তু কথাটা আমি বুঝতে পারলাম। এই শহরের ট্রাম, হুস হুস করা গাড়ির ভিড়. এর সিনেমা, ইলেট্রিক আলোর বিজ্ঞাপন, এই সব সত্ত্বেও ইয়ংকার অঞ্চলের আঁকা বাঁকা সদর রাস্তা ইংলণ্ডের যে কোনো একটা বাজার অঞ্চলের অতি ক্ষীণ আভাস জাগিয়ে দিত।
—অবশ্যি ব্রেকস্টেবলের সকলের কথা আমি ভাবতাম অনেক সময়। হয়তো এর মধ্যে অনেকেই মারা গেছে আর আমারও মৃত্যু হয়েছে বলেই বোধহয় তারা ধরে নিয়েছে।
—প্রায় তিরিশ বছর আমিও সেখানে যাই নি।
আমি তখনো জানতাম না রোজির মৃত্যু সম্বন্ধীয় গুজব ততদিন ব্রেকস্টেবলেও পৌঁছে গিয়েছিল। আমার বিশ্বাস কেউ হয়তো জর্জ কেম্পের মৃত্যু সংবাদ এদেশ থেকে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আর এই থেকেই হয়েতো এই মিথ্যে গুজবের উদ্ভব হয়েছিল!
—আমার মনে হয় এখানে কেউ জানেনা যে তুমি এডওয়ার্ড ড্রিফিলেডের প্রথমা স্ত্রী, তাই না ?
—তা তো নয়ই ; নইলে তা যদি জানত, মৌমাছির ঝাঁকের মতো এসে আমাকে ছেঁকে ধরত। জানো, আমি অনেক সময় কোনো তাসের আসরে গিয়ে হাসি চাপতে পারতাম না যখনই ওরা টেডের বইগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করত। আমেরিকায় তার ভক্তের কোনো সীমা সংখ্যা নেই। আমি নিজেও হয়তো তার বই নিয়ে এত ভাবিনি কোনোদিন।
—উপন্যাস পড়ার দিকে তেমন কোনো ঝোঁক তো তোমার ছিল না কোনোদিন, ছিল কি ?
-তার চেয়ে ইতিহাস আমি পছন্দ করতাম বেশি, তবে আজকাল আর তেমন সময় পাই নাই না। রবিবার আমার আসল দিন। জানো, এখানকার রবিবারের কাগজগুলি অত্যন্ত ভালো লাগে আমার। ইংলণ্ডে এমনটি তোমরা পাবে না কখনো। তারপর ব্রিজ খেলি প্রচুর, কন্ট্রাক্ট ব্রিজ আমার একটা ভীষণ নেশা।
মনে আছে আমার কৈশোরে যেদিন প্রথম রোজির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তখন তার হুইস্ট খেলার পারদর্শিতা দেখে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হতাম। মনে হলো সে যে কি ধরণের ব্রিজ খেলোয়ার এ যেন আমার অজানা ছিল না, খুব দ্রুত হাত, অত্যন্ত বেপরোয়া আবার তেমনি নির্ভুল। খুব ভালো জুটি, তবে ভীষণ প্রতিপক্ষ।

—টেডের মৃত্যুর পর এ দেশে যে রকম হৈ চৈ হয়েছিল তা শুনে তোমরা অবাক হয়েছিলে। কিন্তু আমি জানি এরা ভীষণ শ্রদ্ধা করত তাকে; আমি জানতাম না যে সে এত বড়ো ছিল। কাগজগুলো তাকে নিয়ে মেতে উঠেছিল, তার ছবি, ফার্নেকোর্টের ছবি, সবকিছু খুঁটি-নাটি তারা ছেপেছিল, সেসব দিনে ঐ বাড়িটায় থাকবার কথা প্রায়ই সে বলত। কিন্তু ঐ হাসপাতালের নার্সটিকে সে বিয়ে করেছিল কেন বলতে পার? সবসময় আমি ভাবতাম মিসেস বারটন ট্রেফর্ডকে সে বিয়ে করবে। তাদের কোনো ছেলেপুলে হয়নি বোধহয়, কেমন?

—না।

—হলে সে খুব খুশী হতো। প্রথমটির পর আর একটিও আমি তাকে দিতে পারিনি, এইটাই তার খুবই মনোবেদনার কারণ ছিল।

—তোমার সন্তান হয়েছিল, কই জানতাম না তো? একটু অবাক বিস্ময়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—হয়েছিল। তাই তো টেড আমাকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু যখন সেই সন্তান এল আমার অবস্থা মরণাপন্ন, ডাক্তাররা বলেছিলেন এইটির পর আর দ্বিতীয়বার হবার কোনো আশা নেই। যদি আজ সেই মেয়েটি বেঁচে থাকত, হতভাগা, হয়তো আমি জর্জের সঙ্গে পালিয়ে আসতাম না।! ওর বয়স তখন মাত্র ছয় বৎসর, যখন ও মারা গেল। কী মিষ্টি না ছিল মেয়েটি ঠিক যেন ছবির মতো ফুটফুটে সুন্দর।

—ওর কথা তো তুমি বলতে না কোনোদিন।

—না। ওর কথা আমি বলতে পারতাম না, সহ্য করতে পারতাম না। ওর মেনিনজাইটিস হয়েছিল, হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। একটা নির্জন ঘরে তাকে রাখল, আমাদেরও থাকতে দিল না তার পাশে। কী যে কষ্ট ও পেয়েছিল আমি কোনোদিন তা ভুলতে পারব না, কেবল চিৎকার করত সারা সময় শুধু আর্তনাদ করত যন্ত্রণায়, অথচ কেউ কিছু করতে পারত না।

রোজির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল, লক্ষ্য করলাম।

—ঐ মৃত্যুর কথাই কি ড্রিফিলড তাঁর 'দি কাপ অব লাইফ' উপন্যাসে উল্লেখ করেছিলেন?

—হ্যাঁ, তাই। কিন্তু টেডকে আমার ভারি অদ্ভুত লাগত। এ ব্যাপারে কোনো কথা বললে সে সইতে পারত না আমি না যতটুকু পারতাম, অথচ মজা এই সবকিছু সে লিখে রেখেছিল, একটুখানি খুঁটিনাটিও সে বাদ দেয়নি; এমন কি অনেক সূক্ষ্ম জিনিস যা আমার চোখেও পড়েনি তখন, তারও সব কিছু সে লিখে রেখেছিল, সেগুলো পড়ে আমার সব মনে পড়েছিল।

তোমার হয়তো তাকে হৃদয়হীন মনে হবে, কিন্তু সে তা ছিল না, আমি যতটুকু কাতর হয়েছিলাম সেও ততটুকু হয়েছিল। রাত্রে আমরা যখন বাড়ি ফিরতাম সে শিশুর মতো হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠত। ভারি অদ্ভুত মানুষ, তাই না?

এই 'দি কাপ অব লাইফ' উপন্যাস খানাই একদিন বিরোধিতার তুমুল ঝড় তুলেছিল, শিশুটির মৃত্যু এবং তার পরবর্তী ঘটনার বিবরণের জন্যই বিশেষ করে পাঠক সমাজের তিরস্কারের বোঝা ডিফিলডের মাথায় সেদিন ভেঙে পড়েছিল। সেই বিবরণ বেশ স্পষ্ট মনে আছে আমার। সে এক লোমহর্ষক বিবরণ। একটুও কৃত্রিম আবেগ বিহ্বলতা ছিল না; মানুষের চোখে অশ্রুর উদ্রেক করেনি, করেছে ক্রোধের, এই জন্যে যে এতটুকু শিশুর উপর এমনি নিষ্করুণ নির্যাতন সম্ভব হলো কেমন করে। মনে হয়েছে শেষ বিচারের দিন নিশ্চয় এর জবাব দিতে হবে একদিন। অদ্ভুত শক্তিশালী লেখা এই অংশটুকু। কিন্তু বাস্তব জীবন থেকে যদি ঘটনাটা নেওয়া হয়েছিল তবে পরের ঘটনাও কি তাই? এই প্রশ্নই সে যুগের মানুষের মনকে আলোড়িত করে তুলেছিল, এবং এটাকেই সমালোচকেরা শুধু কুশ্রী বলে নয়, অবিশ্বাস্য বলে অভিযোগ করেছিল। 'দি কাপ অব লাইফ' উপন্যাসে শিশুটির মৃত্যুর পর স্বামী এবং স্ত্রী (নাম এখন আমি ভুলে গিয়েছি) হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিল—তারা খুবই গরীব, ভাড়াটে ঘরে দিন এনে দিন চলত তাদের—বাড়ি ফিরে দুজনে চা খেল। দিন প্রায় গড়িয়ে এসেছিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা সাতটা। একটা পুরো সপ্তাহের উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ আর শোকে ক্ষতবিক্ষত হয়ে দুজনেই বেশ শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। কিছুই তাদের বলবার ছিল না একজন অন্যজনকে। একটা অসহনীয় নিস্তব্ধতা তাদের ঘিরে ধরেছিল। ঘণ্টাগুলো কেটে যেতে লাগল। হঠাৎ স্ত্রী উঠে দাঁড়াল, শোবার ঘরে গিয়ে টুপিটা মাথায় চাপিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

—আমি বেরুচ্ছি। স্ত্রী বলল।

—বেশ।

ভিকটোরিয়া স্টেশনের কাছাকাছি তারা থাকত। বাকিংহাম প্যালেস রোড ধরে তারপর পার্কের ভেতর দিয়ে মেয়েটি হাঁটতে লাগল। পিকাডেলিতে এসে পড়ল, তারপর ধীরে ধীরে সার্কাসের দিকে এগুতে লাগল। একজন পথচারি পুরুষের চোখাচোখি হলো তার সঙ্গে, লোকটি থামল—তারপর ঘুরে দাঁড়াল।

—গুড ইভেনিং। লোকটি বলল।

—গুড ইভনিং।

মেয়েটিও থামল এবং একটু মুচকে হাসল।

—আসুন না কোথাও গিয়ে বসি আমরা দুজনে। লোকটি প্রস্তাব করল।

—কোনো আপত্তি নেই।

পিকাডেলির কোনো একটা ছোটো রাস্তার ধারে একটা টেভার্নে গিয়ে বসল দুজনে, যেখানে বারবণিতার দল এসে ভিড় করে আর পুরুষেরা এসে তুলে নেয় তাদের ; এক এক গ্লাস বিয়ার খেল দুজনে। অনেক আজে বাজে কথা বলল, হাসি তামাশা করল মেয়েটি ঐ অপরিচিত পুরুষটির সঙ্গে। বানিয়ে বানিয়ে এক কাহিনী ফেঁদে বসল নিজের সম্বন্ধে। এরই ফাঁকে মেয়েটির বাড়ি যাবার প্রস্তাব করল ঐ লোকটি ; না, সে হয়না, বলল মেয়েটি, তার চেয়ে তারা কোনো একটা হোটেলে যেতে পারে। একটা ক্যাবে উঠে বসল দুজনে, ব্লুমসবারির দিকে চলল, সেখানে দুজনে একখানা ঘর নিল সেই রাত্তিরটির জন্য। পরদিন ভোরে ট্রাফালগার স্কোয়ারে বাসে করে ফিরে এল মেয়েটি এবং পার্কের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগল ; যখন বাড়ি ফিরে এল তার স্বামী তখন প্রাতরাশ নিয়ে বসেছে। প্রাতরাশের পর দুজনেই আবার হাসপাতালে ফিরে গেল, শিশুটির অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করতে।

—রোজি, আমায় বলবে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম—শিশুটির মৃত্যুর পর উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাও কি……সত্যি ঘটেছিল ?

একটুখানি সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে সে মুহূর্ত মাত্র তাকাল আমার দিকে, তারপর তার ঠোঁট দুটি তার সেই অতি পরিচিত মিষ্টি হাসির ঢেউয়ে ভেঙে পড়ল।

—দেখ, সে আজ কতদিন আগের কথা, কিন্তু এতে এখন জেনে আর কি আসে যায় বল ? তবে তোমাকে বলতে আমার আপত্তি নেই। ঠিক ঠিক সে বুঝতে পারে নি। জানো, তার শুধু ওটা একটা আন্দাজ ছিল মাত্র। তবু সে এতটা বুঝতে পেরেছিল দেখে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম, আমি তাকে কোনোদিন কিছু বলিনি।

রোজি একটা সিগারেট তুলে নিল, চিন্তান্বিত ভাবে সিগারেটের একটা দিক আস্তে আস্তে টেবিলের উপর ঠুকতে লাগল, কিন্তু সেটা ধরাল না।

—তার গল্পে যেমন আছে, আমরা দুজনেই হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। হেঁটেই ফিরেছিলাম, গাড়িতে বসতে পারব না এরকম আমার মনে হচ্ছিল, আমার ভেতরটা যেন নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিল। এত বেশি কেঁদেছিলাম যে আর যেন কাঁদতেও পারছিলাম না, ভীষণ ক্লান্ত, হয়ে পড়েছিলাম। টেড আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, ভগবানের দোহাই, তুমি থামো। এরপর সে আর কোনো

কথা বলল না। তখন আমরা ভক্সাল ব্রিজ রোডে একটা বাড়ির দোতলায় থাকতাম, মাত্র দুখানা ঘর—একখানা বসবার আর একখানা শোবার; সেই জন্যই তো ওকে হাসপাতালে দিতে হয়েছিল; বাড়িতে ওর নার্সিং সম্ভব ছিল না; তাছাড়া বাড়িওয়ালীর অমত ছিল, আর টেডের ধারনা ছিল হাসপাতালেই রোগীর সেবা-শুশ্রূষা ঠিক মতো হবে। বাড়িওয়ালী খারাপ লোক বলব না, খুব গপপি মেয়েটি, ঘন্টার পর ঘন্টা টেডের সঙ্গে বসে বসে গল্প করত। যখন আমরা বাড়ি ফিরলাম বাড়িওয়ালী উপরে এল।

—'খুকু আজকে রাত্তিরে কেমন আছে?' জিজ্ঞাসা করল।

—'সে আর নেই' টেড জবাব দিল।

—আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। বাড়ীওয়ালী আমাদের দুজনের জন্য চা করে নিয়ে এল। আমার কিছুই খেতে ইচ্ছে করছিল না, কিন্তু টেড এরকম জোর করেই কিছুটা খাওয়ালে আমাকে। তারপর জানলার ধারে গিয়ে আমি বসে রইলাম। বাড়ীওয়ালী চায়ের বাসনপত্র গুলি নিয়ে যাবার জন্য যখন আবার উপরে এল আমি ফিরে তাকালাম না, কারো সঙ্গে কথা বলবার ইচ্ছে ছিল না আমার। টেড একটা বই পড়েছিল, অন্তত সেরকম ভান করছিল, বইয়ের পাতা ওলটাতে তাকে দেখলাম না একবারও, শুধু টস্ টস্ চোখের জল বাড়ছিল। জানলা দিয়ে আমি বাইরের দিকেই তাকিয়ে রইলাম। তখন জুন মাসের শেষ দিক, আটাশে তারিখ, দিন গুলিও তখন বড়ো। রাস্তার প্রায় মোড়ে আমাদের বাড়িটা, পাবলিক হাউসের ভেতর থেকে লোকের যাওয়া আসা আমি লক্ষ্য করেছিলাম, দেখছিলাম ট্রাম গাড়ির আনাগোনা। খালি ভাবছিলাম দিনটির বুঝি আর শেষ নেই; হঠাৎ আমার খেয়াল হলো ততক্ষন রাত হয়ে গেছে। আলো জ্বলে উঠেছে। বহু লোকের ভিড় রাস্তায়। ভীষণ ক্লান্ত এবং অবসন্ন মনে হলো নিজেকে।

আমার পা দুটিও যেন পাথরের মতো ভারি হয়ে উঠেছিল।

—গ্যাসটা জ্বাললে না কেন? আমি বললাম।

—তোমার দরকার আছে? সে বলল।

—অন্ধকারে বসে থেকে লাভ কি? আমি বললাম।

—সে আলো জ্বালিয়ে দিল। পাইপ ধরাল।

আমি জানতাম ওতে ওর কাজ হবে, মনটা শান্ত হবে। কিন্তু আমি তেমনি রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। জানিনা কী আমার হয়েছিল তখন। হঠাৎ মনে হলো এমনি বসে থাকলে হয়তো পাগল হয়ে যাব। যেখানে মানুষের ভিড় আলোর ছড়াছড়ি সেখানে যেতে আমার মন অস্থির

হয়ে উঠল। টেডের সান্নিধ্য ছেড়ে দূরে চলে যেতে ইচ্ছা করল; না, না, শুধু তাই নয়, টেড যা কিছু ভাবতে যা কিছু অনুভব করছে যেন এ সবকিছুর সংস্পর্শ থেকে বহু দূরে। মাত্র দু'খানা ঘর ছিল আমাদের। শোবার ঘরে চলে গেলাম; খুকুর শূন্য খাটটা পড়ে আছে সেই ঘরে, কিন্তু তাকালাম না সেদিকে। টুপিটা এবং একটা ওড়না মাথায় পরলাম। জামাটাও বদলে নিলাম, তারপর আবার ফিরে এলাম টেড যেখানে বসেছিল সেই ঘরে।

—আমি বাইরে যাচ্ছি, আমি বললাম।

—টেড আমার দিকে ফিরে তাকাল। আমি ঠিক বুঝেছিলাম আমার পরনে ঐ নতুন পোশাকটা সে লক্ষ্য করেছিল এবং হয়তো যেতে যেতে এমন কিছু বলেছিলাম যাতে সে বুঝতে পেরেছিল তার সান্নিধ্যে আমার অনিচ্ছা।

—বেশ, সে বলেছিল।

—তার গল্পে দেখিয়েছে আমি পার্কের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আসলে আমি তা করিনি! আমি সোজা ভিক্টোরিয়া চলে গিয়েছিলাম এবং চেয়ারিং ক্রশে যাবার জন্য একটা হেনসম নিয়েছিলাম। মাত্র এক শিলিং ভাড়া। তারপর স্ট্রাণ্ড ধরে হাঁটতে লাগলাম। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে কী করব আমি ঠিক করে বেরিয়েছিলাম। হ্যারি রেটফোর্ডের কথা মনে আছে তোমার? সে তখন এডলফি থিয়েটারে কাজ করছিল, একটা কমেডি রোলে অভিনয় করছিল। আমি স্টেজের দরজায় গিয়ে হাজির হলাম এবং আমার নাম ভেতরে পাঠিয়ে দিলাম। হ্যারি রেটফোর্ডকে আমি বরাবরই পছন্দ করতাম। একটুখানি বিবেক বর্জিত মানুষ বলেই আমি তাকে জানতাম এবং টাকা পয়সার ব্যাপারেও তার একটা বদ স্বভাব ছিল তাও সত্যি, কিন্তু সে হাসাতে পারত এবং তার সব দোষ সত্ত্বেও এই জন্যই তাকে ভালো লাগত। জানো বোধ হয়, সে বুওর যুদ্ধে মারা গেছে।

—না, আমি শুনিনি। শুধু জানতাম সে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, বিজ্ঞাপন বা প্রাচীর পত্রে তার নাম আর দেখা যেত না; আমি ভেবেছিলাম সে হয়তো কোনো ব্যবসায় বা অন্য কিছু কাজ নিয়ে কোথাও চলে গেছে।

—না, যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে চলে গিয়েছিল! লেডিস্মিথে নিহত হয়েছিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর সে বেরিয়ে এল, আমি তাকে বললাম: 'হ্যারি, চলো না আজকে রাত্রে একটু ফুর্তি করা যাক। রোমানোতে সাপার খাব চলো, কেমন, আপত্তি আছে?' 'মোটেই না' সে জবাব দিল। 'তুমি একটু অপেক্ষা করো। বইটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মেক আপ উঠিয়ে আমি চলে আসব।' তাকে দেখেই কিছুটা ভালো বোধ করতে লাগলাম;

ঘোড়-দৌড় মাঠের টাউটের ভূমিকায় সে তখন অভিনয় করছিল, তার ঐ কিম্ভূৎকিমাকার পোশাক আর বিলিকক হ্যাট মাথায়, আর লাল রংয়ের নাক দেখে ভারি হাসি পেয়েছিল আমার। নাটক শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। সে বেরিয়ে এলে পর দুজনে হাঁটতে হাঁটতে 'রোমানোর' দিকে চললাম।

—তোমার খুব খিদে পেয়েছে বোধহয়! সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল।

—মরে গেলাম আমি বললাম। তাই আমার হয়েছিল।

—'চলো সব চেয়ে সেরা খাবার আজকে আমরা খাব। সে বলল—দাম দেব আমি। বিল টেরিফকে বলে এসেছি আমার সবচেয়ে পছন্দের মেয়ে বন্ধুকে সাপার খেতে নিয়ে যাচ্ছি, সেই বলে দুটো মুদ্রাও ওর কাছ থেকে খসিয়ে এনেছি।

—'শ্যাম্পান খাব' আমি বললাম।

—'থ্রি চিয়ারস ফর দি উইডো' সে বলল।

—জানিনা, সেই যুগে তুমি কখনও রোমানোতে খেতে কিনা। বড়ো ভালো ছিল। রঙ্গমঞ্চের সব লোক এসে সেখানে জুটত, আর আসত 'গেইটির' মেয়েরা। ঐটাই ছিল একমাত্র জায়গা তারপর রোমান নিজে। হ্যারির সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। সেও এসে বসল আমাদের টেবিলে; ভাঙা ভাঙা ইংরেজী তার মুখে ভারি মজার লাগত; আমার বিশ্বাস সবাই হাসত বলে সে অমনি করে কথা বলত। তারপর তার চেলাদের কেউ যদি কখনো বিপদে পড়ত সাহায্যের জন্য সে তার হাত বাড়িয়ে দিত।

—বাচ্চা কেমন আছে? হ্যারি জিজ্ঞাসা করল।

—ভালো। আমি উত্তর দিলাম।

—তাকে সত্যি কথাটা বলতে চাইলাম না। তুমি তো জান, পুরুষরা কেমন অদ্ভুত; এমন কতকগুলো জিনিস আছে যা তোমরা পুরুষরা বুঝতে চাও না। আমি জানতাম মৃত সন্তানকে হাসপাতালে ফেলে রেখে এমনি সাপার খেতে আসা একটা ভীষণ বীভৎস ব্যাপার বলে হ্যারি নিশ্চয় মনে করত! সে খুব দুঃখিত হতো বা এমনি কিছু একটা প্রকাশ করত, কিন্তু আমি তা চাইনি! আমি হাসতে চেয়েছিলাম নিরানন্দকে দুর করতে চেয়েছিলাম!

রোজি সিগারেট ধরাল' যেটা নিয়ে সে এতক্ষণ খেলা করছিল।

—তুমি জানো বোধহয়, এমনও হয় অনেক সময় যে, স্ত্রী যখন সন্তানের জন্ম দেয় অনেক স্বামী সেটাকে বরদাস্ত করতে পারে না। সে বেরিয়ে যায় অন্য নারী সহবাস করবার জন্য। তারপর স্ত্রী যখন জানতে পারে প্রায় সব ক্ষেত্রেই দুনিয়া শুদ্ধ সে তখন কী-ই বা না করে তুলে...? সে বলে, যে যখন এমনি

বিপদের মুখে তখন স্বামীর পক্ষে এও সম্ভব হলো, এরপরও আর কিছু থাকতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে স্বামী আর তাকে ভালোবাসে না, বা সে চঞ্চল হয়নি। আসলে তার এ ব্যবহার নিছক অর্থহীন, শুধু একটুখানি চাঞ্চল্য; সে চঞ্চল না হলে এমনি চিন্তাও তার মনে আসত না। এ আমি জানি, কারণ আমিও তখন ঠিক এমনি অনুভব করেছিলাম।

—তারপর আমাদের সাপার শেষ হবার পর হ্যারি বলল 'তোমার তাহলে এতে আপত্তি নেই যদি…?'

—বিসে? আমি প্রশ্ন করলাম।

—সেসব দিনে নাচ টাচের ব্যবস্থা প্রচলন ছিল না, আর এমন কোনো জায়গাও ছিল না যেখানে আমরা যেতে পারি।

—এই, আমার ফ্ল্যাটে গিয়ে আমার ফটো এলবাম দেখে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসতে বোধহয় তোমার আপত্তি হবে না?' হ্যারি বলল।

—আপত্তি আর কি। আমি উত্তর দিলাম।

—চেয়ারিং ক্রশ রোডে ওর ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট ছিল। মাত্র দুখানা ঘর। একখানা স্নানের ঘর, আর ছোট্ট একটা রান্নাঘর। ওখানেই আমরা গেলাম এবং আমি রাত কাটালাম সেখানে।

—পরদিন ভোরে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন টেবিলে প্রাতঃরাশ দেওয়া হয়ে গিয়েছে এবং টেড সবে মাত্র খাওয়া শুরু করেছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিলাম টেড কিছু বললেই তক্ষুনি ফেটে পড়ব। যাই কিছু হোক আমি তখন বেপরোয়া। আগেও আমি নিজের পেট নিজে চালিয়েছি আবার সে পথে যেতে আমি প্রস্তুত ছিলাম। এক কথায় তাকে পরিত্যাগ করে যেতেও তৈরি ছিলাম। কিন্তু আমি ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সে শুধু একবার মাত্র মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে।

—ঠিক সময় মতোই তুমি এসে পড়েছ, সে বলল—তোমার সসেজটা আমি খেয়ে নেব ভাবছিলাম।

—আমি বললাম এবং তার চা ঢেলে দিলাম। সে কাগজ পড়তে লাগল। প্রাতরাশ সেরে আমরা আবার হাসপাতালে গেলাম। আমি কোথায় ছিলাম একটি কথাও সে জিজ্ঞাসা করল না। সে কী ভাবছিল আমি জানতে পারলাম না। আমার উপর ভীষণ সদয় দেখলাম তাকে। জানো, আমি মরে যাচ্ছিলাম। কেন যেন আমার কেবল মনে হচ্ছিল এ আমি সহ্য করতে পারব না, অথচ এমন কিছু ছিল না যা সে করেনি আমার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার জন্য, আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য।

—বইটা পড়ে তোমার কী মনে হয়েছিল? আমার প্রশ্ন।

—সেদিন রাত্রে যা ঘটেছিল তা সে জানে দেখে আমি একটু অবাক হয়েছিলাম। সে যে ঐটা লিখতে পেরেছিল ঐ জন্যই যেন ওর কাছে আমি পরাভূত হয়ে গেলাম। এরকম কথা কখনও সে বইতে লিখবে না, তুমি হয়তো ভাবতে। কিন্তু কি জান, তোমরা এই লেখক জাতটা একরকমের বিচিত্র জীব।

সেই সময় টেলিফোন ঝন ঝন করে উঠল। রোজি রিসিভার তুলে, নিয়ে শুনতে লাগল।

—আরে, মিঃ ভানুর্জি! আপনি আবার এতটা কষ্ট করলেন! আমি কিন্তু বেশ ভাল আছি এখন। হ্যাঁ, খুব সুন্দর এবং খুব ভালো, দুটোই। আমার মতো বয়স যখন হবে এমনি সুখ্যাতি আপনিও কুড়োবেন তখন। এমন কথোপকথন সে শুরু করল যার ঢঙ্ থেকেই আমার মনে হলো বেশ একটু চটুলতা ছিল কথাগুলোতে। আমি বেশি কান দিলাম না। কথাটা অনেকক্ষণ চলবে বুঝতে পেরে লেখকের জীবনের কথা ভাবতে লাগলাম। লেখকের জীবন দুঃখ-কষ্টের একটা অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। রাত্রের হিম শীতল পরশ তাকে সইতে হবে, মানুষের বিরূপতা অবজ্ঞা তাকে পেতে হবে। তারপর কিঞ্চিৎ সাফল্যের কণিকা আসবে যেদিন, সেদিন সব ঝুঁকি আর বিপদকেও মেনে নিতে হবে অম্লান বদনে। জনতার চঞ্চল মতির কাছে সে চিরদাসানুদাস। সে সাংবাদিকের হাতের পুতুল, যারা আসবে তার বাণী নিতে; ফটোগ্রাফারের, যে তার ছবি নেবে; সম্পাদকের, যে তার লেখার জন্য অতিষ্ঠ করে তুলবে; ট্যাক্স কালেকটর, যে আসবে তার আয়কর আদায় করতে; গুণী ব্যক্তির, যাঁরা তাকে মধ্যাহ্ন ভোজে আমন্ত্রণ করবে; কোনো প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের, যে আসবে বক্তৃতা আদায় করবার অনুরোধ নিয়ে; সেইসব স্ত্রীলোকের, যারা তাকে বিয়ে করতে চায়, বা যারা তার কাছে বিবাহ-বিচ্ছেদ চায়; সেই সব যুবকের, যারা আসে অটোগ্রাফের জন্য; অভিনেতার দল, যারা পার্ট চায়; অপরিচিত লোক, যারা ঋণ চায়; উচ্ছলা নারী, যারা বিয়ের ব্যাপারে উপদেশ প্রার্থী, সেইসব তরুন লেখক, যারা উপদেশ নিতে আসে; আরও কত লোক, এজেন্ট প্রকাশক, ম্যানেজার, ভক্ত, সমালোচক আর সর্বোপরি আছে তার নিজের বিবেক। কিন্তু এসবের বিনিময়ে একটি মাত্র ক্ষতিপূরণ আছে তার। যখনই কিছু তার মনে আসে, দুঃসহ ভাবনা, বন্ধুর মৃত্যুতে শোক নিস্ফল প্রত্যাখ্যাত প্রেম, আহত আত্মাভিমান, যার উপকার করেছি তার কাছ থেকে পাওয়া প্রবঞ্চনার ক্রোধ, এক কথায় যেকোনো আবেগ অথবা বিভ্রান্তিকর চিন্তা, যা-ই কিছু হোক না, শুধু কালির আঁচড়ে সেগুলোকে

ধরে রাখা এইটুকু তার কাজ—কখনো বা তার কাহিনীর প্রতিপাদ্য হিসেবে, কখনো বা কোনো প্রবন্ধের অলংকার করে—তারপর বিস্মৃতির গভীরে তাকে ডুবিয়ে দেওয়া। তারপর সবার উপরে সবার সেরা মুক্ত পুরুষ সে।

রোজি রিসিভার নামিয়ে রাখল, ফিরে তাকাল আমার দিকে।

—আমার একজন ভক্ত। আজকে রাত্রে ব্রিজ-খেলার আসর বসবে, তার গাড়িতে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে, তাই বলছিল টেলিফোনে। একটু বাড়াবাড়ি করে সত্যি, তবে বস্তুত ভালো মানুষ। নিউইয়র্কে গ্রোসারি ব্যাবসা ছিল, এখন অবসর নিয়েছে।

—আবার বিয়ে করবার কথা কোনোদিন তোমার মনে আসেনি, রোজি ?

—না, সে একটু হাসল। কোনো প্রস্তাব আসেনি তা নয়। তবে এভাবেই আমি বেশ সুখে আছি। এ ব্যাপারে আমার কথা হলো, কোনো বৃদ্ধকে আমি বিয়ে করতে চাই না। যুবাকে বিয়ে করতে যাওয়াও বিশ্রী। আমার দিন ছিল এক সময়, সেদিনকে উপভোগ করেছি পুরোমাত্রায়, কাজেই ঐটাকে মেনে নিতে আমার একটুও কুণ্ঠা নেই তো।

—জর্জ কেম্পের সঙ্গে তুমি পালিয়ে এসেছিলে কেন ?

—ওকে আমার ভালো লাগত। টেডের সঙ্গে পরিচয় হবার অনেক আগে থেকেই তাকে জানতাম। অবশ্য তার সঙ্গে কোনোদিন আমার বিয়ে হওয় সম্ভব এ আমি ভাবিনি। প্রথম কারণ, এর আগেই সে বিয়ে করে ফেলেছিল তারপর তার সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা ভাববার ছিল। একদিন যখন সে এসে বলল তার সব গেছে, সে রিক্ত, পুলিশ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে তার পেছনে বেরিয়েছে এবং সে আমেরিকা পালিয়ে যাবে ঠিক করেছে এবং আমিও তার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত কিনা, সেদিন, বলতো, এ ছাড়া, এই পালিয়ে আসা ছাড়া, কী আর করবার ছিল আমার ? একা তাকে এই পথে ছাড়তে মন চাইল না, একেবারে কপর্দকহীন, আর সেই লোক যার একদিন অর্থ ছিল, বাড়ি ছিল, নিজের গাড়ি চড়ত। কাজে আমার ভয় ছিল তাও নয়।

—আমি অনেক সময় ভাবি, হয়তো সেই একমাত্র পুরুষ যার প্রতি তোমার সত্যিকারের দরদ ছিল। আমি বললাম।

—হয়তো খানিকটা সত্যি।

—জানিনা কী তুমি দেখেছিলে তার ভেতর !

দেয়ালে একটা ছবির দিকে রোজির দৃষ্টি ঘুরে গেল। কি জানি কেন ঐ ছবিটা আমার নজরে পড়েনি। সোনালী ফ্রেমে বাঁধা জর্জ কেম্পের একখানা এনলার্জ করা ফটো! হয়তো আমেরিকা আসবার পরই ছবিখানা তুলিয়েছিল ; হয়তো তাদের বিয়ের সময়কার ছবি। ছবিখানা প্রায় তিন-কোয়ার্টার

লম্বা। তার গায়ে লম্বা ফ্রক-কোট, বেশ আঁট করে বোতাম আঁটা, একটা লম্বা মতন সিল্কের টুপি ঝুলে পড়েছে মাথার একদিকে। বাটন-হোলে একটা বিরাট গোলাপ ফুল গোঁজা, রূপোয় বাঁধানো একখানা ছড়ি তার এক হাতে এবং ডান হাতে একটা বিরাট চুরুট থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে ধুঁয়ো উড়ছে। বেশ মোটা এক জোড়া গোঁফ ছিল তার, দুই দিকে মোম দিয়ে বেশ করে চুমড়ানো, কেমন সরস সজল দৃষ্টি ছিল তার চোখ দুটিতে, সারাটা চেহারায় কেমন একটা স্পর্দ্ধার ছায়া যেন ফুটে উঠেছে। গলার টাই-তে হিরে দিয়ে তৈরি ঘোড়ার ক্ষুর। ডারবিতে যাবার জন্য প্রস্তুত কোনো এক অভিজাত পুরুষের মতো লাগল তাকে।

—আমি বলছি তোমাকে, রোজি বলল, সে একজন সত্যিকার খাঁটি ভদ্রলোক ছিল।

॥ সমাপ্ত ॥